প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
পূরবী পাব্লিশার্স
১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

মূল্য সাড়ে তিন টাকা
প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩

মুদ্রাকর—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী বনলতা দেবীকে

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ সম্পাদিত ঢাকার "সোনার বাংলায়" এই উপন্যাসখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়। তারপর বহুল পরিবর্তন করিয়া বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

রেফ সংযোগে বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। এখন পর্যন্ত দুই রকম বানানই প্রচলিত থাকায় আমি কোন কোন জায়গায় দ্বিত্ব রক্ষা করিয়াছি। তবে অধিকাংশ স্থলেই দ্বিত্ব ব্যবহার করি নাই। সাধারণতঃ চলন্তিকার বানানই অনুসৃত হইয়াছে।

বহু বিদেশী গ্রন্থের খ্যাতনামা অনুবাদক, সাহিত্য-সেবক সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক আমার স্নেহভাজন সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এই পুস্তকখানি প্রকাশের জন্য নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এই আখ্যান রচিত, পুস্তকে ব্যবহৃত সেই অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে প্রচলিত কতগুলি কথ্য শব্দের অর্থ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল।

২০১, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ভাদ্র সংক্রান্তি, ১৩৫৩

গ্রন্থকার

চাষী-মজুর জেলে-জোলার গ্রাম কুরপালা। এত বড় গ্রাম কিন্তু শ্রীছাঁদ কিছুই নাই। এমন কি লোক চলাচলের একটা পথ পর্যান্ত নয়। বর্ষাকালে এক বাড়ী হইতে আর একবাড়া যাইতে হইলে নৌকা কিংবা ডোঙা লাগে। আশ্বিনের শেষাশেষি তাহাও চলে না।

মাঝখানে রাণীর খাল। এপারে কুরপালা, ওপারে রাণীডাঙা। রাণীডাঙার পূজা পার্ব্বণ উৎসব সমারোহ আছে, আছে বড় বড় বাড়ী; স্কুল লাইব্রেরী ডাকঘর ও তারের আপিস। ফণিমনসা, হরিচট্ট, বলহলী, কুশলা প্রভৃতি গ্রামেও মন্দির মসজিদ, পাঠশালা ও মক্তব আছে। কিন্তু কুরপালার রূপই স্বতন্ত্র। সারা গ্রাম খুঁজিলে একখানা ইট পাওয়া যায় না। নিজের নাম সহি করিতে পারে এমন লোকও পাঁচজন আছে কি না সন্দেহ। যারা আছে তাদের কেহ কাছারির পেয়াদা, কেহ শহরে যাইয়া হেয়ার কাটিং সেলুন খুলিয়াছে। একজন ছিল বেঙ্গল পুলিশের কনষ্টেবল।

অমন যে রূপমতীর গাং যার পারার মতন স্বচ্ছ জলে মুখ দেখা যায়, যে গাঙ দুই তটে শ্রী ও ঋদ্ধি বিলাইয়া মধুমতীতে যাইয়া মিশিয়াছে, সেই রূপমতী দিয়া নৌকা বাহিয়া যাও, কুরপালার পশ্চিমে আসিয়া দেখিবে অভাব ও অভিযোগ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার একটানা করুণ দৃশ্য।

কিন্তু কুরপালারও নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর কলকূজনে গ্রামে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়, ঝোপে ঝাড়ে লাল টুকটুকে তেলাকুচো ফল পাকিয়া থাকে, বসন্তে আমের বৌলে বৌলে গাছ ছাইয়া যায়—বর্ষায় বিলের জলে কচুরীপানার পাতাগুলি সাপের মতন ফণা দুলাইতে থাকে আবার রাত্রে জোনাকির ঝিলিমিলিতে মনে হয় কে যেন দেওয়ালির দীপ জ্বালিয়াছে।

তা ছাড়া আছে চাষীর সরল সহজ জীবন, সুন্দর সমাজ-বন্ধন। লোকের মর্য্যাদা শুধু টিনের ঘর ও হালবলদের মালিকানায় নয়, মর্য্যাদা চরিত্রের উৎকর্ষে। স্বরূপ মাঝির ছেলে নসীরামের হাল মাত্র দু'খানা, বৃদ্ধ জগু সর্দারের তাহাও নাই কিন্তু তারাই নিজ নিজ জাতির মোড়ল বা মাতব্বর।

সর্দাররা জাতিতে জেলে। কয়েক পুরুষ আগে জেলেদের মধ্যে কয়েকজন নাম ডাকের লাঠিয়াল ছিল। সেই হইতে তাহাদের বংশধরদের উপাধি সর্দার, পেশা লাঠিয়ালি। মাছ আর তারা ধরে না, পাইক বরকন্দাজের কাজ করে। জমি দখল করিতে হইলে, প্রজা বিদ্রোহ হইলে, দাঙ্গা বাধিলে জমিদাররা, ধনীরা সর্দারদের লাঠি ভাড়া করে। বিনিময়ে তারা জমি খায়, ভিটা মাটি ভোগ করে। এক সময় এই সর্দারদের লাঠি কুরপালার গর্বের বস্তু ছিল।

গ্রামে জোলাও অনেক। বিলাতী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবস্থা তাদের হীন হইয়া পড়ে। বৃত্তি হয় নৌকার মাঝিগিরি ও চাষবাস।

১৯০৫ সালে আসে স্বদেশী আন্দোলন, বিলাতী বয়কট। সঙ্গে সঙ্গে জোলাদের অবস্থা ফিরিল, অনেকেই টিনের ঘর তুলিল। চাঁদা করিয়া

মসজিদের ঘরও টিন দিয়া ছাইল। চৌকাঠ দিল সেগুনের। লোকের মুখে মুখে তার নাম হইল স্বদেশী মসজিদ।

গ্রামের পুব ও দক্ষিণে রাণীর খাল। দক্ষিণদিকে খাল পার হইতে কুরপালার নাপিত ও জোলাপাড়া পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাইল খানেকের মতন জলাভূমি। এই বিলান জমির খালের দিকটা প্রায় বার মাসই কচুরিপানায় ঢাকা থাকে।

খাল পারে পাশাপাশি দুইটা হিজলী গাছ। হিজল তলা হইতে আরম্ভ করিয়া নাপিতপাড়ার যদু নাপিতের বাড়ীর বেতের ঝোপ পর্য্যন্ত প্রায় একশ' বিঘা উঠতি জমি। নূতন নূতন আরও জমি উঠিতেছে। এই জমির রূপ দেখিলে চোখ জুড়ায়।

চাষীরা জানে এই মাটির সম্ভাবনা অনন্ত। জলের তলায় দীর্ঘদিনের লুকানো প্রাণশক্তি আলোর স্পর্শ পাইয়া অল্প প্রয়াসেই সোনা ঢালিয়া দিবে। লাউ কুমড়া, ফুটি কাঁকুড়ের ফসল ফলিবে প্রচুর। তাই কুরপালার আলিমেদের, যদুবর নাপিত, তুলসী কাহার প্রভৃতি চাষীরা রাণীডাঙার জমিদার রামেন্দ্র রায়ের নিকট হইতে এই বিল বন্দোবস্ত লইল। বিঘাপ্রতি সেলামি দিল একশ' টাকা।

জমি তাদের বাড়ীর গায়ে, অনেকেই উঠানে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে পারিবে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সোনালী ধানের উপর বাতাসের ঢেউ দেখিবে, স্ত্রীকে দেখাইবে। এই কল্পনায় তারা মশগুল হইয়া উঠিল।

আজ লাঙল ফেলার দিন। হিন্দু মুসলমান যে যার দেবতাকে স্মরণ করিল, লাঙলের ফলায় ও বলদের কপালে সিঁদুর পরাইল। বলদের গলায় দিল গাঁদা ফুলের মালা।

তারা বাহির হইবে এই সময় রাণীডাঙার বঙ্কিম কুণ্ডু গোমস্তা

কালীপদ আসিয়া বাড়ী বাড়ী খবর দেয়, বিলের জমির কাছে তোমরা যেও না। ও জমি আমার বাবুর। তিনি জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছেন।

যদু নাপিত হাসিল, আলিমেহের চোখ কপালে তুলিল। নারায়ণ সর্দার বলিল, ঠাট্টার আর জায়গা পাও নাই বুঝি?

কালীপদ উত্তর করে, আমার বাবু লাখো লাখো টাকার মালিক; তিনি ঠাট্টা-বটকেরা করতে আসবেন ছোট লোকের সঙ্গে?

নারায়ণ বলিল, কথায় কথায় জাত তুলিও না, ঠাকুর।

আলবৎ তুলব। তোকে আবার ভদ্দরলোক বলতে হবে নাকি?

নারায়ণের বুকের ছাতি ফুলিয়া ওঠে। সে বলে, কও-ত' ঠাকুর, কও দেখি আর একবার।

সঙ্গে সঙ্গেই কালীপদর স্বর নরম হয়, তোদের দুঃখু কি আর বুঝি না রে ভাই? তবে কিনা হুকুমের দাস হয়ে পড়েছি।

বোঁঝ কচু—বলিয়া নারায়ণ ডান দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া থুঃ করিয়া খানিকটা থুতু ফেলে। কালীপদ চলিয়া গেলে যদু নাপিত বলে এখন উপায়?

নাপিত পাড়ার অশ্বিনী মন্তব্য করে, গাঁইটের কড়ি খরচা করিয়া গোমস্তাবে পান তামাক খাওয়াইলাম, জমিদারের সেরেস্তায় নাম পত্তন করলাম, আর এখন জমি হইল কিনা হারাণ কুণ্ডুর পো বঙ্কিমের!

পরামর্শের জন্য যদুবরের উঠানে বৈঠক বসে। যদু ও ইয়াকুব বলে জমি নেব আমরা লাঠির চোটে।

বৃদ্ধ জগু সর্দার বলে, ও কথা ভুলিয়া যাও ভাই। লাঠির কাল আর নাই। টাকা যার, তালুক মুলুক তারই।

আলিমেহের বলিল, তুমিও এই কথা কও?

জগু উত্তর করে, আমি কই না ভাই। দিন কালে কওয়ায়।

যদুবর বলিল, তা হৈলে কি কুণ্ডুর পোরে জমি ছাড়িয়া দেব নাকি যার বাপ মাথায় করিয়া গুড় ফেরি করত?

জগু বলে, সে কথা এখন ভুলিয়া যাও।

শেষটায় স্থির হইল, যোগেশ তাদের প্রতিনিধিরূপে জমিদার বাড়ী যাইয়া আসল ব্যাপারটা জানিয়া আসিবে। দরকার হইলে আট আনা, এক টাকা ঘুষ দিবে।

যোগেশ বলিল, টাকার অঙ্কটা তোমরা ঠিক করিয়া দেও। শেষটায় যেন মোর স্কন্ধে না পড়ে।

আলিমেহের দু'একজনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলে, সদর নায়েব শ্যাম সজ্জনরে দিও এক টাকা। গোমস্তা যুগীনরে আট আনা আর মুহুরীগো দু'আনা করিয়া।

ইহাতে হয় এক টাকা বারো আনা কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে যোগেশ আড়াই টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিবার ক্ষমতা পায়।

সে বলে, দারোয়ান সর্ব্বদমন সিংও ত' আছে। সে বেটা হৈল বড় ভাগী।

ভজহরি বলে, তারে ত' দেবাই। মোটের উপর ঐ আড়াই টাকার মধ্যে সারিও কিন্তু।

যোগেশ চলিয়া গেলে কলিকার পর কলিকা তামাক পুড়িতে থাকে। যদুর অবস্থা স্বচ্ছল, সে সকলকে শশা ও বাতাসা খাইতে দেয়। চাষীরা তামাক টানে আর গল্প করে, বেশীর ভাগই ভূতের গল্প।

ভজহরি বলিল, শোনছ, রাণীডাঙার প্রসাদ ভুঁইয়ার মাইয়ারে ভূতে পাইছে?

সমস্বরে অনেকেই প্রশ্ন করে, তাই নাকি?

আদম বলে, কি রকম দানারে ভাই ?

উত্তর করে আকালী—সে বড় সেয়ানা ভূত। আমারগো নকু৹ খাইয়া যেই তুকতাক কি করল, ভূত অমনে দে ছুট্‌।

সকলেই মুচকি হাসে।

আদম জোলা বলে কলিকাতার গল্প, —কাপড়ের উপর ছবি দেখলাম এই পেরথম, ছবি দৌড়ায়, কথা কয়, গান গায় আবার যুদ্ধ ও করে সে এক তাজ্জব!

যদু আরম্ভ করে তার জাতীয় ব্যবসায়ের সুখ্যাতি, এর তুল্য কারবার আর নাই। মূলধন কেবল ক্ষুর কাঁইচি আর নরুন আর চাই হস্ত। ত হস্ত ত' ধাতা পুরুষই দিছেন।

এর উপর যদি সিলিন খোলতে পার তো কথাই নাই। আমা৹ নাগিন সিলিন করছে এই তিন বছর। এর মধ্যে টিনের ঘর ওঠল পুষ্করণী কাটলাম, বিলের জমি কেনলাম। নাগিনের সিলিনে কত মহৎ মহৎ লোক আইসে। উকিল, মাজেষ্টর, পুলিস।

আদম বলে, সেই দেমাকেই আমারগো লগে কাজিয়া কর বুঝি ?

যদু নাপিত আলিমেহেরের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি ক'ন বড়মেয়া। ওনারা বাড়ীর উপর আসিয়া চড়াও করলে আমি মালি মামলা, গাইল মন্দ না করিয়াই বা থাকি ক্যামনে ?

অশ্বিনী বলে, ও কথা থাউক। খাসা ছাওয়াল তোমার নাগিন।

জগু সর্দার জিজ্ঞাসা করে, সিলিনের নামটা যেন কি ?

যদু কহিল, ঐ ত' তোমারগো দোষ।

আলিমেহের বলে, ছাওয়ালের দোকানের নাম জানতে চাইছে, তাতে দোষের কি আছে ?

সকলের পীড়াপীড়িতে বহুবর শেষটায় নাম বলিল, তিনকড়ি সিলিন।

তিনকড়িটি কে বটেন? প্রশ্ন করে নসীরাম।

নব বিবাহিতের মতন মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিয়া যত্ন উত্তর করে, উনি নাগিনরে গস্তে ধরছে আর আমার হৈলেন কিনা, রাণীডাঙার ভদ্দরলোকরা যারে কয় পরিপাক।

চাষীদের আশা ছিল যোগেশ হয়ত সুবিধা করিয়া ফিরিবে। ঢাকার নবাবের জমিদারি সেরেস্তার সে বরকন্দাজ, এ সব ব্যাপারের সুলুক সন্ধান ভালই জানে।

কিন্তু সে সকলকে হতাশ করিল। ফিরিয়া সংবাদ দিল যে জমিদার রামেন্দ্রবাবু বাড়ী নাই। শ্যামাচরণ বলিয়াছে, এ সম্বন্ধে কিছুই সে জানে না।

যত্ন বলে, এতক্ষণ বাদে এই খবর নিয়া ফেরলা? জমিদারি কাছারিতে তা হৈলে শুধু ঘাসই কাটছ?

যোগেশ উত্তর করে, তোমারগো বংশেই ত' জন্ম, যত্ন খুড়া।

পরের দিন হাটবার। বিলান জমির নূতন প্রজারা আজ প্রস্তুত হইয়াই মাঠে আসিল। সঙ্গে অনেক লোক, তাদের মামা মেসো, চাচা কুপার দল। প্রত্যেকের মুখেই দৃঢ় সঙ্কল্প, মাটি তারা আজ ছাড়িবে না। তারা কতকগুলি বর্শা, লাঠি, লেজা সড়কিও আনিয়াছিল। সেগুলি লুকানো ছিল একটা আগাছার ঝোপে।

মাটির উপর দিয়া দুই একবার লাঙ্গল টানিতেই জমির মধ্য হইতে কেঁচো বাহির হয়। আলিমেহের বলে, কেচুয়ার মাটি—মাটি না যেন সোনা।

কেহ মাটি তুলিয়া হাতে কচলাইতে কচলাইতে আনন্দ প্রকাশ করে, একেবারে ছ্যানার দলারে ভাই।

বিলের দক্ষিণ পশ্চিমে রূপমতীর কাছে এক ঝাঁক বক বসিয়াছিল। চাষীদের কলরবে সেগুলি উড়িয়া গেল। বসিয়া রহিল শুধু একটা। আকালী দূর হইতে তাকে গুলতি মারিলে পাখীটা কঁ কঁ করিয়া একটু উড়িয়াই দুই পাক ঘুরিয়া জলজ ঘাসের উপর পড়িয়া গেল।

নসীরাম বলিল, এ কী করলা আজকার এই শুভদিনে?

বকটা অদূরে ছটফট করে, মধ্যে মধ্যে শোনা যায় তার আর্ত্তনাদ। শুভকার্য্যের প্রারম্ভে এই প্রাণীহিংসায় শুধু নসীরামই নয়, অনেকেই দুঃখিত হইল। একমাত্র যোগেশ বলিল, যাই কও, বকের মাংস খাইতে খাসা।

একটু পরে দেখা গেল যদু নাপিতের বাড়ীর ঢালু জমি বাহিয়া একটি ঘোড় সওয়ার নামিয়া আসিতেছে। তার পিছনে কয়েকজন লোক।

ঘোড়াসমেত সওয়ারটিকে দেখিতে রাণীডাঙার শীতল চক্রবর্ত্তীর মতন। মানুষটি দীর্ঘকায়, স্ফীতোদর, মাথায় একটি টাক। আর তার বাহন চক্রবর্ত্তীর বাহনেরই মতন যেন দানাপানি পায় না। পাছে মাটিতে ঠেকে এই ভয়ে সওয়ার পা দুটা গুটাইয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি তার টাকের উপর চকচক করিতেছে।

ভজহরি বলিল, চক্কোত্তি মশায় ঘোড়ায় চড়িয়া এদিকে রোগী দেখতে যায় কোথায়?

শীতল এ অঞ্চলের নামী চিকিৎসক। রোজগার যথেষ্ট। ডাক্তারী, কবিরাজি, তুকতাক সুবিধা মতন সবই করেন।

যদু বলিল, বকের ডাক শুনিয়া আইছে বোধ হয়।

দলটি ক্রমেই ভারী হয়। তারা নিকটে আসিলে ভজহরি বলে; এ দেখি থানার বড়বাবু, দারোগা সাহেব।

সংবাদটায় সকলেরই মুখভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কেহ ভুরু কোঁচকায়, কারও কপালে পড়ে চিন্তার রেখা।

দারোগা ঘোড়ার এলাউয়েন্স পান বটে কিন্তু এই চতুষ্পদ জীবটিকে আহার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আত্মনির্ভরশীল হইতে হয়। ফলে, মাঠে নামিয়াই ঘোড়াটি খাদ্যের সন্ধানে তৃণবিরল জমি শুঁকিতে আরম্ভ করে। সামনে যাহা পায় তাহাই মুখ দিয়া টানিয়া তোলে। দারোগার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তিনি ঘোড়ার পেটের তলায় ঠোকর দেন, আর বলেন, হট্ হট্।

মাঠের ঠিক মাঝখানে চাষীদের সামনে আসিয়া দারোগা গর্জ্জন করিলেন, হল্ট।

পিছনে জমাদার, কনষ্টেবল ও চৌকিদারদের সঙ্গে বাকী লোকগুলাও থমকিয়া দাঁড়াইল।

দারোগা বলেন, রাইট টার্ন। এবার পুলিসের লোকেরা ডান দিকে ফেরে।

টেন্‌সন—সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঘাড় সোজা করিয়া নিজ নিজ নাকের ডগার দিকে তাকায়।

নিরস্ত্র মানুষের উপর জঙ্গী জাঁকজমকের প্রভাব যে কতখানি দারোগা তাহা জানিতেন। সামনে অতগুলি লোক, তাদের লুকানো ঢাল, সড়কির খবরও তাঁর জানা ছিল। তাঁর নিজের সঙ্গে একটি জমাদার, দুইজন কনষ্টেবল ও চৌকিদার মাত্র দুইজন। গাদা বন্দুক একটি, আর নিজের কোমরে একটি পিস্তল।

কিন্তু জঙ্গী আদব-কায়দা ও গুরুগম্ভীর আওয়াজেই যথেষ্ট কাজ

হয়। সামনের চাষীর দল ও দর্শকরা স্তম্ভিত হইয়া যায়। কাহাকে উচ্চ বাচ্য করিবার সময় না দিয়া দারোগা বর্ষীয়ান্ নসীরাম, আলিমেহের জগু সর্দার ও যদু নাপিতকে ডাকিয়া বলেন, আমি মনে করি এখানে দাঙ্গা ফ্যাসাদ হতে পারে। তোমরা এক্ষুণি মাঠ থেকে চলে যাও।

জগু সর্দার কি যেন বলিতে যাইতেছিল। দারোগা বাধা দিয়া কহিলেন, নো, নো, কথা শুনবার আমার সময় নেই। চলে যাও তোমরা, মাঠ থেকে বেরিয়ে যাও।

যুবক নারায়ণ সর্দার বুকের ছাতি ফুলাইয়া দারোগার সামনে আসিয়া বলে, কেন যাব আমরা? এ জমি ত' আমারগো।

নারায়ণের আকৃতি ও স্বাস্থ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দারোগা থমকিয়া দাঁড়ান। তার পরই নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলেন, আমার হুকুম।

অন্যায় হুকুম করবা আর তাই আমরা শোনব? —নারায়ণ যেন আরও কি বলিতে যাইতেছিল। এদিকে দারোগার চক্ষুও তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে। জগু সর্দার নারায়ণকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। দারোগা আবার কড়া হুকুম দিলেন, চট্‌পট বেরিয়ে যাও, তোমরা। এ জমি বঙ্কিমবাবুর।

এতগুলি লোকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। এই জমির জন্য অনেকে বাসন-কোসন্ বেচিল। ঘরবাড়ী বন্ধক দিল আর আজ শোনে কি না জমি তাদের নয়, বঙ্কিম কুণ্ডুর।

দারোগার পিছনে হাটুরিয়ারা তাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাদের সামনে বিনা প্রতিবাদে বাহির হইয়া যাওয়ার অর্থ পরাজয় স্বীকার। এই অপমানে যুবার দল বিশেষতঃ নারায়ণ, কোরফান, ইউসুফ মেহের বেশ গরম হইয়া ওঠে।

বয়োবৃদ্ধেরা তাদের শান্ত করে। আলিমেহের বলে, এ সব খোদার কারসাজি।

নারায়ণ বলিল, ও নাম আর করবেন না, মিয়া সাহেব। আপনারগো আল্লা আর মোরগো কেষ্ট বিষ্টু ঐ বঙ্কিমের সেরেস্তায় গিয়া নাম লেখাইছে।

দারোগা আবার ধমক দেন। তার সামনেই ছিল যদু নাপিত। সে থতমত খাইয়া বলে, এই যাইতেছি হুজুর।

নারায়ণ ঝোপের দিকে চায়। যোগেশ বলে, একটু ঠাণ্ডা হ' নাড়ু।

যে পথ দিয়া আসিয়াছিল চাষীরা আবার সেই পথেই ফিরিয়া চলিল। ঝোপের ভিতর হইতে অস্ত্রগুলি বাহির করিতেও আর ভরসা পাইল না।

সারি সারি মানুষ হাল বলদ লইয়া মাথা নীচু করিয়া চলে। বেঁটে ও লম্বা, রোগা ও মোটার সে এক দীর্ঘ মিছিল। মাটির উপর মানুষ ও বলদের, হাল ও লাঙ্গলের নানা আকৃতির ছায়া পড়ে। ছায়া আবার সরিয়া যায়। দেখা যায় কতকগুলি রুক্ষ, শুষ্ক ফাটল। মাটির বুক তাদের দুঃখে যেন চিরিয়া গিয়াছে।

নারায়ণ এদের সঙ্গে গেল না। সে সোজাসুজি হিজল গাছ দুটির দিকে চলিয়া গেল।

দারোগা বলেন, বেটার আস্পর্দ্ধা ত' কম নয়! দাগী বুঝি?

চৌকিদার পটল উত্তর করে, না হুজুর।

এখনও হয়নি তাহলে, আচ্ছা।

কথাটির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পটলের দৃষ্টি এড়ায় না।

কুরপালার ঘরে ঘরে চাষীর মেয়েরা বঙ্কিম কুণ্ডু, রামেন্দ্র রায় ও

দারোগার উদ্দেশে গালি পাড়ে। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজ নিজ স্বামী-পুত্রকে ভর্ৎসনা করে। সারা গ্রামে হাহাকার পড়িয়া যায়।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম জগুর স্ত্রী হাস্তু। জগু বাড়ী ফিরিলে হাস্তু তার হাত মুখ ধোয়ার জল লইয়া আসে। হাসিমুখে বলে, একটু ঠাণ্ডা হইয়া তারপর নাইথে যাও।

জগু বলে, শত জন্মের পুণ্যের ফলে তোর মতন বউ পাইছি, হাস্তু।

পুণ্য তোমার না আমার?

স্নান সারিয়া জগু খাইতে বসে। সামনে পুরানো কাঁসার থালায় একরাশ ভাত, পাশে কতকগুলি উচ্ছে সিদ্ধ, কচুর শাক ও ডাঁটা চচ্চড়ি। জগু বলে, রাঁধছ না যেন অম্রেত।

এই সময় উঠানে মানুষের ছায়া পড়িলে ঘোমটা টানিয়া হাস্তু একটু সরিয়া বসে।

জগু বলে, মানুষটা আইলেন কেডা?

পটল চৌকিদার দরজার সামনে আসিয়া বলিল, থানার বড়বাবু তোমারে বেস্মরণ করছেন। তিনি বড় রায় বাড়ীতে সন্ধ্যা তক আছেন। যাইও একবার।

জগু বলে, আমারে ক্রেপা করলেন যে বড়?

জানি না, তুমি যাইও কিন্তু দাদা, বলিয়া পটল চৌকিদার বিদায় নেয়।

হাস্তু জিজ্ঞাসা করিল, কোন গোলমাল হইছিল নাকি?

না।

তবে তোমারে বেস্মরণ করছেন কেন? যাক্ কথায় আছে বাঘে ছুঁইলে আঠার ঘাঁ। তুমি কয়টা টাকা লইয়া যাইও।

টাকা! পাব কোথায়? তা ছাড়া দারোগা এমন কিছু বাপের ঠাকুর নয় যে বেস্মরণ করলেই পেন্নামি দিতে হবে।

আমার কিন্তু ভয় করে।

তোর সব থাতেই ভয়—মুখে এই কথা বলিলেও জগু চিন্তান্বিত হয়। তার বিশ্বাস ভবিষ্যৎ মঙ্গল অমঙ্গল হাস্তু কেমন যেন বুঝিতে পারে।

হাস্তু টাকা নেওয়ার কথা আর বলে না। সে জানে কোন বিষয়ে 'না' বলিলে তার স্বামীকে দিয়া তাহা আর করানো যায় না।

জগু বাহির হইয়া যাইবার সময় সে যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিল, ঠাকুর আমার সোয়ামীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

দুই

সন্ধ্যার কিছুপরে রাণীডাঙ্গার ছোট তরফের জমিদার বিশ্বনাথ রায় গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে পেসেন্স খেলিতেছিলেন। কোন কাজ না থাকিলে তিনি বসিয়া বসিয়া পেসেন্স খেলেন। দিনের বেলায় চাকর বসন্ত বার বার কলিকা বদলাইয়া দেয়।

রাত প্রায় আটটা। মাথার উপর ডিজের আলো জলে, দেওয়ালে তাঁর ও গড়গড়ার ছায়া পড়ে। তাদের সত্যিকার দূরত্বের চেয়ে ছায়া দুটির দূরত্ব অনেক বেশি। বিশ্বনাথ এক একবার তাস বসান আবার ছায়ার দিকে চাহিয়া ভাবেন—এতটা দূরত্ব সম্ভব হয় কেমন করিয়া?

পর পর দুই বারই মেলে নাই কিন্তু এবার চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বোঝা গেল সিরিজ মিলিয়া যাইবে। বিশ্বনাথ ডাকিলেন, বসন্ত, কলকেটা একটু বদলে দিয়ে যা।

বসন্ত কোন উত্তর করে না।

বিশ্বনাথও জানেন এখন ডাকিলে কোন জবাব মিলিবে না। তবুও ডাকেন। মধ্যে মধ্যে এরূপ ডাকা তাঁর অভ্যাস।

দিনের বেলায় এই কিশোর ভৃত্যটি বেশ পরিশ্রম করে কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই তার একটু ঘুম দেওয়া চাই। সামনের বারান্দারই একপাশে সে গুটিশুটি মারিয়া পড়িয়া থাকে। দশবার ডাকিলেও জবাব দেয় না। কিন্তু একটু বেশী রাত্রে নিজেই উঠিয়া বাবুর মুখ ধোয়ার জল দেওয়া, তাঁর খাওয়ার জায়গা করা, বাসন ধোয়া সব কাজই বেশ উৎসাহের সহিত করে।

তৃতীয় বার চার সারিতে পর পর সাহেব বিবি গোলাম দশ সাজাইয়া বিশ্বনাথ আবার তাস তুলিয়াছেন এমন সময় উঠানে একটা কলরব উঠিল। অনেকগুলি লোক এক জায়গায় জড় হইলে তাদের সম্মিলিত কথাবার্তায় বাতাসে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় গোলমালটা সেইরূপ।

আলিমেহের বাহির হইতে বলিল, কুরপালার আমরা আইছি, ছোট রাজা।

এস—বলিয়া বিশ্বনাথ তাদের ভিতরে ডাকেন।

আলিমেহের, নসীরাম ও ভজহরি প্রথমে বারান্দায় প্রবেশ করে। পিছনে আর সবাই।

বিশ্বনাথ বলিলেন, ওরে বসন্ত, উঠে ওদের শতরঞ্চি পেতে দে।

গোলমালে বসন্তের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শতরঞ্চি বিছাইয়া দিয়া সে সরিয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ বলিলেন, তোরা বিলের হাঙ্গামার জন্ত এসেছিস বুঝি ?

ভজহরি বলে, আজ্ঞা হুজুর।

এত রাত হল যে ?

আলিমেহের বলিল, পাঁচ বাড়ীর পাঁচজন জড় হৈতে দেরি হৈয়া গেল।

কিছু কিছু শুনেছি বটে, ব্যাপারটা সব খুলে বল ত' সাহেব।

মাঠ হইতে চলিয়া আসা পর্য্যন্ত ঘটনার সমস্ত বিবরণ দিয়া আলিমেহের কহিল, ওখানেই সব মেটে নাই ছোট রাজা। দারোগা আবার আমারগো বড় রাজবাড়ী ডাকাইয়া নিলেন। পান খাওয়ার জন্ত তানারে মাথা প্রতি আমরা দুই টাকা করিয়া দিলাম।

আলিমেহের যেন রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। প্রতিকার সামর্থ্যহীন অক্ষমের পুঞ্জীভূত এই উষ্মা বিশ্বনাথ এর আগেও অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁর নিজের জীবনেও এরূপ বহুবার ঘটিয়াছে।

নসীরাম কহিল, এর উপর আবার জগু সর্দারের হাঙ্গামা।

বিশ্বনাথ কহিলেন, জগু ত' ভাল লোক। তার আবার হাঙ্গামা কি?

নসীরাম বলিল, দারোগা সাইব জগুরেও বড় বাড়ীতে ডাকাইয়া নিছিল। দারোগা কইল, অন্যায় করলে ফল ভোগ করতে হয় মোড়ল। পরের জমি আর তোমরা কিনা গেলা অস্তর শস্তর নিয়া তাই দখল করতে!

জগু উত্তর করল, অন্যায় কিছু করি নাই হুজুর। টাকা দিছি আমরা—আর পয়সার জোরে বঙ্কিম কুণ্ডু আপনারগো আনিয়া হকদারগো বেদখল করলী।

দারোগা কইল, চোপরও শুয়ার, আমি কি ঘুষখোর যে টাকা দিয়ে আমাকে আনবে ?

জগু বলল, খামকা গাইল মন্দ করবেন না। তুয়ার কেডা?

আর যায় কোথায়? পান খাওয়ার তঙ্কা দেয় নাই বলিয়া দারোগার এমনিই তার উপর রাগ ছিল। সে এবার উঠিয়া মারল জগুর মুখে এক ঘুষা। সর্দার সামলাইতে না সামলাইতে আবার এক লাথি। বুড়া সর্দার মাটিতে পড়িয়া গেল তাল ব্রেক্ষডার মতন।

বিশ্বনাথের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, বিশ ত্রিশ বৎসর আগের বিখ্যাত লাঠিয়াল জগু সর্দারের বিশাল বলিষ্ঠ মূর্ত্তি। সারা পরগনাটা তখন তাকে ভয় করিত।

তিনি বলিলেন, বুড়ো সর্দারকে অমন করে মারলে, তাও রায় বাড়ীতে বসে!

চোখ দুটা তাঁর মুহূর্ত্তের জন্য যেন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজকে সংযত করিয়া লইলেন। তার পর আপন মনেই যেন বলিতে লাগিলেন, এখন এইটেই বরং স্বাভাবিক।

বাঁকডাঙ্গার রায়েরা বিখ্যাত জমিদার। প্রজা পাইক কর্ম্মচারী এক সময় তাদের মহারাজা বলিয়া ডাকিত। এখনও বলে বড়রাজা, ছোটরাজা।

বিশ্বনাথ ছোট তরফের মালিক, রামেন্দ্র বড় তরফের। ছোট তরফের আয় ছিল কম। বিশ্বনাথের পিতার আমলে তাদের জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু পুনতির দেবোত্তর সম্পত্তি। তার আয়ে বিশ্বনাথের সংসার কোন রকমে চলিয়া যায়।

লোকটি ক্ষুরধার বুদ্ধি, মামলা মকদ্দমা ভাল বোঝেন, তাই বিপদে আপদে লোকে তাঁর কাছে ছুটিয়া আসে। তিনি পরামর্শ দেন, দরকার হইলে নিজে জামিন হইয়া আসামী খালাস করিয়া আনেন।

বিশ্বনাথ প্রশ্ন করিলেন, তাহার অবস্থা এখন কেমন ?

উত্তর করে ভজহরি, তার 'ত' জীয়ের শরশর্য্যা। আমরা আপনার শরণ নিলাম। আমাদের যদি কেউ বাঁচাইতে পারে ত' সে আপনি।

যদুবর বলে, আপনি হৈলা দারোগার দোস্তি।

আদম কহিল, দারেগা ছাইব আর তুমি এক বদনায় পানি খাও আর এক সানকিতে শালুন।

বিশ্বনাথ বলিলেন, এক সানকিতে শালুন খাই না বটে তবে আলাপ আছে। কিন্তু তোমাদের যে টাকা লাগবে ঢের। একে বঙ্কিম বড় মানুষ, তার সঙ্গে মামলা, তার উপর পুলিসও তোমাদের উপর চটে আছে।

পুলিসের চটিবার কারণ চাষীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়।

বিশ্বনাথ কহিলেন, শুনছি দারোগা নাড়ু সর্দারের উপরই বেশী চটেছে। সে নাকি আর সবাইর সঙ্গে না গিয়ে খালের দিকে চলে গিছল।

যদুবর বলিল, এ ত' বড় সুরুক্ষু ব্যাপার।

অশ্বিনী বলে, এসব বুঝতে কাঠখড় লাগে।

যদু বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনারগো মতন কাঠখড় খাওয়ার সুবিধা আর পাইলাম কোথায় ? কি করিয়া বোঝব কন দেখি ?

অনেকক্ষণ যাবৎ মধু কেমন উসখুস করিতেছিল। বিশ্বনাথ বলিলেন, একটু তামাক চাই বুঝি ?

মধু বলিল, আমিও তাই ভাবি যে ছোটরাজার কৈল্কা, হুকা এরা সব গেলেন কোথায় ?

তারা ঐ কেরোসিন কাঠের আলমারিতে আছেন। ওরে বসন্ত—:

মধু বলিল, আমারগো মটার পুত্তুর বলছ ? ওরে আর ডাকতি হবে না। নিজেরা আপনকার ওরঠে একটু আগুন ছোঁয়াতে পারব ভাবিয়া চিত্তে বড় সুখ ঠেকতিছে।

হাতের তালুতে কলিকা নিয়া এক একজন দু'তিনটা করিয়া সুখটান দেয়, কলিকার ডগায় আগুন লকলক করে। খানিকটা ধোঁয়া গিলিয়া খানিকটা বা নাক মুখ হইতে বাহির করিয়া একজন আর একজনের হাতে কলিকা দেয়। বয়সের ও সম্পর্কের গুরুলঘু বিচার করে না।

তামাক সাজে মধু। বিশ্বনাথের কলিকায় আগুনও সে দুইবার বদলাইয়া দেয়।

বিশ্বনাথ কহিলেন, স্বত্বের মামলা দায়ের করতে হবে, দারোগা কি রিপোর্ট দিয়েছেন দেখতে হবে। এ এক রাজসূয় ব্যাপার।

আদম বলে, আপনি ত বলছ রাজখোরা। এদিকে আমারগো যে খোরার চাটাই পর্যন্ত নাই।

বিশ্বনাথ বলেন, বুঝি সবই, কিন্তু এতগুলো জমি ত' আর ছেড়ে দিতে পার না।

যদুনাপিত বলিল, নিশ্চয় নয়, আমার নাগিন আরও মাটি কেনতে বলছিল।

ওঠে মামলার খরচার কথা।

দারোগাকে আবার ঘুষ দিতে হইবে শুনিয়া নলীরাম বলে, দারোগা আবার এর মধ্যেও নাসিকা গলাবেন বুঝি ?

তুলসী কাহার বলে, তা না হৈলে আর দারোগা হৈছে কেন ?

পরামর্শ করিবার জন্য মাতব্বররা বাহিরে চলিয়া যায়। দুই একজন করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকেই যাইয়া তাদের সঙ্গে জড় হয়। খানিকক্ষণ

পরে ভজহরি ও আলিমেহের ফিরিয়া আসিয়া বলে, একশ টাকায় হয় না কর্ত্তা ?

বিশ্বনাথ বলেন, তাতে মামলা রুজু হতে পারে। তবে শেষ পর্য্যন্ত লাগবে ঢের বেশী।

আলিমেহের বলে, তবু কত ?

এখন বলা যায় না তবে পাঁচ সাত শ'র কম নয়।

একটা মাত্র আলোয় অতগুলি লোকের মুখ ভাল দেখা যায় না, তবে বিশ্বনাথ লক্ষ্য করেন যে, টাকার অঙ্ক শুনিয়া অনেকেরই মুখ কেমন যেন মলিন হইয়া গেল।

আবার পরামর্শ চলে। যদুবর বলে, দশের নড়ি একের বোঝা। দশ জন আছি, শেষ পর্য্যন্ত যাবে চলিয়া।

তুলসী কাহার বলে, তোমার আর ভাবনা কি ? ছাওয়ালের সিলিন আছে। কিন্তু আমারগো চাউলের হাঁড়িও যে ঠন্ ঠন।

আলোচনা যে কতক্ষণ চলিত ঠিক নাই। বিশ্বনাথ এই সময় আলিমেহের ও নসীরামকে ডাকিয়া বলিলেন, রাত হয়ে যাচ্ছে তোমরা যা হয় চট্‌পট শেষ করে ফেল।

আবার মিনিট দশ পনের পরামর্শ হইল। আলিমেহের বলিল, এখন শ' খানেক টাকায় চলবে হুজুর ?

মামলা রুজু করা চলবে বৈকি। কিন্তু ভেবে দেখ শেষ পর্য্যন্ত চালাতে পারবে কিনা।

প্রজা ত্রিশ ঘরের উপর। ঘর প্রতি পঁচিশ ত্রিশ টাকা যোগাড় করিতে পারিলেই মামলা চালান যাইবে। দলিল পত্র দেখিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, জয় অনিবার্য্য। শেষকালে মামলা চালানোই স্থির হইল।

নলীরাম অশ্বিনী প্রভৃতি কয়েকজন পরামর্শ করিয়া বলিল, রুজু করার টাকাটা যোগাড় করতে আমাদের দুই একদিন দেরি হবে ছোটরাজা।

বিশ্বনাথ বলিলেন, দেখ যত তাড়াতাড়ি পার।

অশ্বিনী বলিল, বড়রাজা টাকা খাইলেন আমারগো আর জমি দিল কিনা কুণ্ডুর পোরে। ওনার নামে একটা ফরজদারি করিয়া—

বিশ্বনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, সে কথা থাক এখন।

সকলেই বুঝিল যে প্রস্তাবটা তাঁর মনঃপূত নয়। অথচ অশ্বিনী প্রভৃতি অনেকেই আশা করিয়াছিল যে এবার তারা বড় তরফ ও ছোট তরফের চিরন্তন বিরোধের খানিকটা সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

আলিমেহের কহিল, আপনার লগে আমারগো যাইতে হবে না?

যাবে বৈকি দু'একজন। আর সবাই ডেমিতে সই করে দিলেই চলবে।

ডেমি শুনিয়া চাষীরা পরস্পরের মুখের দিকে চায়।

ভয় নেই তোমাদের—বলিয়া বিশ্বনাথ তাদের আশ্বাস দেন।

তাঁর উপর তারা যথেষ্টই নির্ভর করে। তবে একথাও জানে যে, তিনি মামলার ভার নিলে খরচা লাগে বেশী। তিনি সাধারণ যাত্রী নৌকা বা গহনার নৌকায় চড়েন না। জেলা মহকুমায় যাইতে হইলে পৃথক্ নৌকা করিয়া চাকর বামুন লইয়া যান। দু' আনা চার আনার জন্ত নাজির পেশকারের সঙ্গে দরদস্তুর করেন না।

কিন্তু মামলা যেমন ভাল বোঝেন তেমনি মন দিয়া কাজ করেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া আইনের নূতন পয়েন্ট বাহির করেন। ইহা

লইয়া তাঁর গর্ব্বও কম নয়, বলেন, জেলায় গেলে ভূধরবাবু, কামিনীবাবুর মতন উকিলও আমার পরামর্শ নেন।

কথাটা সত্য। তাই টাকা দুটা বেশী লাগিলেও মামলা মকদ্দমার ব্যাপারে সাগরদীঘি থানার শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সবাই তাঁর কাছে ছুটিয়া আসে।

রাত প্রায় দশটার পর চাষীরা বিদায় লয়। রূপমতীর পারে যাদের বাড়ী তারা নৌকায় ফেরে। আর একদল নয়া বাড়ীর পথে কিন্তু বেশীর ভাগই হাটের সামনের সাঁকোর উপর দিয়া।

এরফানের বাড়ীর পরেই মাঠ। চাঁদের আলোয় মাঠের মাঝখানের পথটাকে জরির পাড়ের মতন দেখায়। একটি যুবা গান ধরে। একটি তরুণ তার বন্ধুকে বলে, চাঁদটা খাসা। ছাখতে তোর বউর মতন।

বন্ধুটি উত্তর করে, তুই শালা পরের বউর ওপর বড় নজর দেস, মাইরি।

কে যেন বলে, ছুক্কন্দরি সাদি করছ, দেবে না নজর?

অশ্বিনী বলে, আচ্ছা নাড়ুর খবর কি? সে গেল কোথায়?

যোগেশ বলিল, ছোটরাজার কাছে যাওয়ার আগে তারে ডাকতে যাই। তার মা কইল, মাঠের-থা ফিরিয়া সে দুই গেরাস ভাত মুখে দিয়া সেই-যে বাইর হইয়া গ্যাছে আর বাড়ী ফেরে নাই।

ওঠে বিলান জমির কথা। বঙ্কিম কুণ্ডু, রামেন্দ্র রায় ও দারোগা সকলেরই উদ্দেশে তারা গালি পাড়ে। রাগ বঙ্কিমের উপরই বেশী। লোকটা যেন আস্ত রাক্ষস। সারা দেশটা গিলিয়া ফেলিল। যত গ্রাস করে, লোভ ততই বাড়ে।

একদিন তার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তার বাবা হারাণ বাড়ী

বাড়ী গুড় ফেরি করিয়া বেড়াইত। লোকটি ছিল ভাল মানুষ। খরিদ্দার ঠকাইত না। ফাউ চাইলেই দিত।

এগার বার বছর বয়সে বঙ্কিমও বাপের সঙ্গে ঘুরিতে আরম্ভ করে। দু' তিন দিন পরেই সে বলিল, এরকম করলে ব্যবসা চলবে কেমন করে? ওজন কম দেবে না, অথচ লোকে ফাউ চাইলেই দেবে। এ কী রকম?

হারাণ বলে, কী করব বল্ দেখি?

দাঁড়িপাল্লাটা ঠিক করে নেও।

ঠিকই ত আছে বাবা। কেউ বলতে পারবে না যে হারাণ কুণ্ডু মাল কম দেয়।

বঙ্কিম হাসে। সে দাঁড়িপাল্লা ঠিক করিয়া দিলে হারাণ বলিল, এতে যে খদ্দেরকে প্রবঞ্চনা করা হবে।

এ বঞ্চনা নয়। এর নাম ব্যবসা।

চতুর পুত্রের কাছে পিতা পরাজয় স্বীকার করিল। বঙ্কিম তখন বাপের কাজকর্মে সহায়তা করিত, সঙ্গে সঙ্গে ভবানীচরণের বাড়ীর মাইনর স্কুলে পড়িত।

হারাণের অবস্থার কিছু উন্নতি হইল বটে, কিন্তু লোককে ঠকাইয়া সে মনে মনে অশান্তি ভোগ করিত। ভাবিত, লেখাপড়া শিখিয়া ছেলেটি শেষটায় জুয়াচোর বনিয়া গেল।

তার মৃত্যুর পর ষোল বছর বয়সে বঙ্কিম রাণীডাঙ্গার হাটে দোকান খুলিল। জিনিস সে কমদরে কিনিত, মিষ্টি কথা বলিয়া—চড়াদামে বেচিত। ওজনে ঠকাইত। গরিবরা ধারে জিনিস চাহিলে বলিত, যাও একটা বাসন কোসন কিছু নিয়ে এস। খালি হাতে কি মাল পাওয়া যায়?

কুরপালার গরিবের পিতল কাঁসা তার দোকানে বন্ধক পড়ে। পড়িলে আর খালাস হয় না। ক্রমে ক্রমে রাণীডাঙ্গার বাবুদের সোনা-দানাও তার সিন্দুকে ওঠে।

আজ বঙ্কিম সাগরদীঘি পরগনার শ্রেষ্ঠ ধনী। তার হাজার দু' হাজার মনী চালানি নৌকা গঙ্গা, পদ্মা, মধুমতী, মেঘনার গঞ্জে গঞ্জে মাল কেনাবেচা করিয়া ফেরে।

ভজহরি বলে, রায়দের জমিদারি, বন্ধুর [illegible] দাসেরগো তালুক কেনল, এখন কিনা লোভ পড়ল আমাগো খুদ কণার উপর।

আলিমেহের বলে, লোভে লোভ বাড়ে এ ত' জানা কথা।

দলটা ক্রমে ক্রমে হালকা হইয়া গেল। তখন ছিল সবেমাত্র পাঁচ ছয় জন। বাঁদিকে একটু দূরে রাণীর খাল, ওপারে তারাকান্দরের মাঠ। খালপারে লম্বা একটি বাঁশের উপর কালো ন্যাকড়া জড়ানো। দূর হইতে ভূতের গল্পের সিপাহীর মতন দেখায়। ভোঁদড় তাড়াইবার জন্য জেলেরা সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ডান দিকে মোল্লার ভিটা। বহুদিন এখানে কেহ থাকে না। জায়গাটা শিয়াল সজারুর আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। অনেকে ভূতের ভয় পায়, কেহ বা পেতনী দেখে।

দলটা সবেমাত্র ভিটার সীমানা ছাড়াইয়াছে এমন সময় একটা চীৎকার শোনা গেল, করুণ আর্তনাদ।

ভজহরি আঁৎকাইয়া ওঠে, ওরে বাপ্।

যদুবর বলে, একী পেল্লায় কাণ্ড।

আকস্মিকতার প্রথম ঝোঁক কাটিয়া গেলে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য সকলেই মোল্লার ভিটার দিকে ছুটিয়া যায়।

ল হয়, গ্রামে হাইস্কুল বসে। পূজা পার্বণে রায়েদের উৎসব সমারোহ
ই জেলায় আজও একটা গল্পের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

রামেন্দ্রের অবস্থা শুনিয়া কণীমনসা, হরিচট্ট, কাকডাঙা, বদ্দতলি
ভৃতি আশেপাশের দশবিশখানা গ্রামের লোক তাঁর বাড়ীতে যেন
াঙ্গিয়া পড়ে। সকলেরই মুখে উদ্বিগ্ন ভাব।

কেহ তাঁর পুত্র বীরেনকে প্রশ্ন করে, বড় রাজার সমাচারডা কিঞ্চিৎ
শল ত'?

বামুন কায়েতরাও দুঃখ প্রকাশ করেন, ইস, এখনও জ্ঞান হল না।

নানা লোকে নানা পরামর্শ দেয়, কেহ সদর হইতে ডাক্তার আনাইতে
লে। কেহ বলে, সদর আবার কেন? আমাদের শীতলই ত আছেন।

বীরেন সকলকে জানাইয়া দিল, শীতল জ্যাঠা ভোর থেকেই আছেন।

পাঁচ সাতখানা বাড়ীর পরেই তাঁর বাড়ী। কিন্তু শীতল আসিয়াছেন
াড়ায় চড়িয়া। তাঁর উপস্থিতির চিহ্ন স্বরূপ বাহনটি রায়েদের ফটকের
াশেই বাঁধা আছে।

শীতল রামেন্দ্রকে একটা ইনজেকসন দিয়াই তাঁর মাথায় কবিরাজি
লেপ লাগাইলেন। জিহ্বার উপর আলগোছে রাখিলেন তিনটি
ামিওপ্যাথিক গ্লোবিউল। তারপর আরম্ভ হইল, সূর্য্য স্তব পাঠ।

শীতল বলিলেন, আমার কৌশল জার্মান জেনারেলদের মতন।
সুমতীতে' দেখেছি ত' তাঁরা কেমন আটঘাট বেঁধে কাজ করেন।
াহ হয়ত' মনে করাইয়া দেয়, জার্মানরা সব সময় জেতে না কিন্তু।

শীতল বললেন, কিন্তু তাঁদের প্রতাপ ত' অস্বীকার করা যায় না।

মেন্দ্রের আহত হওয়ার সংবাদ পাইয়া কুয়াশার কেহ কেহ আসিয়াছিল,
ইতে ঘুরিতে বঙ্কুরাও আসিয়া উপস্থিত। সে জিজ্ঞাসা করে, বড়
াজারে নিয়া আইলেন কখন?

গোমস্তা যোগীন বলে, উষা হয় হয়, এমন সময় ।

উষা ? ঘটনাডা ত'—বহু নাপিত মাঝখানে থামিয়া গেল বটে কিন্তু তার বলার ভঙ্গী সকলেরই কেমন অস্বাভাবিক ঠেকিল । শুধু যোগীন নয়, আরও দুচারজন তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

দুপুরের দিকে থানার দারোগা আসিয়া বৈঠকখানায় জাঁকাইয়া বসিলেন । ঘরখানা প্রকাণ্ড, প্রায় সমস্তটা জুড়িয়া তক্তাপোশ পাতা, উপরে বড় শতরঞ্চি । তার একটা দিক্ গালিচায় ঢাকা ।

পিতলের বৈঠকে রূপা বাঁধানো হুকা, তার মধ্যে একটার গলায় কড়ি ঝুলিতেছে । দেওয়ালে পূর্ব্বপুরুষদের তৈলচিত্র, মহিষ ও হরিণের শিং, বাঘের মুণ্ড । শিলিংএর মাঝখানে কাচের তিনটা ঝাড়, আভিজাত্যের সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান । কিন্তু সবই মলিন । নথিপত্রের আলমারির কাচ ভাঙ্গা, তাদের ফাঁকে ফাঁকে মাকড়সার জাল, শতরঞ্চি ও গালিচার রং চটা । কিন্তু এর মধ্যেও দরজার মাথায় পিতলের গণেশমূর্ত্তিই সবচেয়ে করুণ । তার শুঁড় ভাঙ্গিয়াছে আজ তিন বৎসর কিন্তু এখনও বদলানো হয় নাই ।

রামেন্দ্র বলেন, বহুদিনের মূর্ত্তি, অনেক ফুল চন্দন খেয়েছেন । উনি যেদিন আসেন সেদিন নিলামে তারাইল কেনা হয় ।

সেই তারাইল আজ রায়েদের নাই কিন্তু রামেন্দ্র ঐ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আবার সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন ।

দারোগার আগমন সংবাদ শুনিয়া গ্রামের মাতব্বররা অনেকেই উপস্থিত হইলেন । তাকে ঘিরিয়া ব্যাপারটার বীভৎসতা সম্পর্কে আলোচনা চলিতে লাগিল ।

প্রসঙ্গক্রমে উঠিল দেশের সাম্প্রতিক চুরি ডাকাতির কথা । কিছুদিন আগে বিনয়গুপ্ত ভট্টের বাগান দিয়া আসিতেছিল । দুর্ব্বৃত্তেরা তার

নাক কাটিয়া দিল। মাসখানেক আগে রায়পাশায় ডাকাতি হইল। তারপর আবার কুশলায়।

শীতল চক্রবর্ত্তী কহিলেন, দিন দিন উৎপাত যেরূপ বাড়ছে তাতে শান্তশিষ্ট লোকের পক্ষে দেশে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

ধীরাজ দাস টিপ্পনী করে, ঘোর অরাজক, এসব কলির কারসাজি। নইলে ভদ্দর লোকের ছেলে ডাকাত হয়? কোথায় লেখাপড়া শিখবি, চাকরি করবি, সে সব গেল চুলোয়। আরম্ভ করলি কিনা Dacoity, নরহত্যা। তা আবার বন্দেমাতরং ব'লে? ছিঃ, ছিঃ, এ যে দেশমাতৃকার অপমান।

দারোগা বলিলেন, এসব কুশিক্ষার ফল। হিন্দুর ছেলে, ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম পালন করে ইহকাল পরকালের কাজ গোছাবে, তা নয় গেল বন্দুক ছুঁড়তে! আরে, ইংরেজের রাজত্ব, এ যে Pre-destined এ কথা তোদের বঙ্কিমও বলে গেছেন। তোর আমার মতন মানুষ তা' খণ্ডাবে কি করে?

ধীরাজ দাসের দল হেঃ হেঃ করিয়া হাসিয়া দারোগাকে সমর্থন করিল।

মৃতপ্রায় পিতাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও বীরেন দারোগার খাতিরের ত্রুটি করে না। পুলিস ও হাকিমকে আপ্যায়িত করা এ বাড়ীর সনাতন রীতি। চলিয়া আসিয়াছে রাঘেন্দ্রের পিতামহের আমল হইতে। তখন জমিদারির আয় ছিল প্রচুর, যতটা ছিল আয়, বাজে আদায় তার চেয়েও বেশী। আজ বিষয়ের আয়ে ঋণের সুদ পোষায় না কিন্তু রাজ কর্ম্মচারীর খাতির প্রায় আগেরই মতন বজায় আছে।

লুচির থালার সামনে দাঁড়াইয়া দারোগা বলিলেন, এ সবের কি দরকার ছিল বীরেন বাবু? আপনার এই বিপদ।

বীরেন বলিল, তা হ'ক। আপনি আমার অতিথি।

দারোগা স্মিতমুখে বলেন, একেই বলে বনেদী পরিবার।

শীতল চক্রবর্ত্তী, ধীরাজ দাস, উপেন কালী প্রভৃতি সমাগত ভদ্র-লোকেরাও লুচি এবং বেগুনভাজা পাইলেন। ধীরাজের ভাই হরকান্ত লুচি চিবাইতে চিবাইতে কহিল, কথায় বলে, অন্নারং শত বোতেন—এ পরিবারের অতিথি সৎকার।

ধীরাজ অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, সে ভাইকে ধমক দিল, বাজে বকিস্ না হরু।

বৈকালে রাঘেন্দ্রের জ্ঞান হইলে গ্রামের লোকের সামনে দারোগা তাঁর জবানবন্দি লইতে আরম্ভ করেন।

বিশ্বনাথও সামনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দারোগার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। দারোগা অনেক বিষয়ে তাঁর মতামত নেন। বিশ্বনাথ বলিলেন, ওঁর শরীরের যে অবস্থা তাতে এটা স্থগিত থাকলে হত না?

একটু বিজ্ঞের মতন মুচকি হাসিয়া দারোগা বলিলেন, তা বটে, কিন্তু It may be too late. আপনি কি বলেন বীরেন বাবু?— বলিয়াই তিনি বীরেনের দিকে চান। বীরেন চায় দারোয়ান সর্ব্বদমন চোবের দিকে।

চোবে দরজার পাশে একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া হাতের তালুর উপর তামাক পাতা ও চুন টিপিতেছিল, সে দারোগার উদ্দেশে বলিল, আপনি জরুর এত্তেলা লিবেন।

বিশ্বনাথের মুখের উপর যেন একখানা কালো মেঘ নামিয়া আসিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। চোবে তাঁকে সেলাম করিল বটে কিন্তু তিনি অদৃশ্য হইলেই টিপ্পনী করিল, জ্ঞাত শত্তুর আছে। হেইজি।

কথাটা সকলের কানে গেল। এই চোবেটি ষোল বছর বয়সে তার বাবা রিপুদমনের সঙ্গে এই বাড়ীতে আসে। এখন তার বয়স

পঁয়তাল্লিশ। এই উনত্রিশ বৎসরে রায় বংশের দ্রুত পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদমন মাসিক দুই আনা তিন আনা সুদে টাকা খাটাইয়া বিশ ত্রিশ হাজার টাকার মালিক হইয়াছে। বর্ত্তমানে রামেন্দ্রকেও তার কাছে হাত পাতিতে হয়। ঋণের অঙ্ক এক একবার স্ফীত হয় আর রামেন্দ্র বঙ্কিম কুণ্ডুর নিকট খানিকটা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সর্ব্বদমনের দেনা পরিশোধ করেন।

রায় পরিবারে সর্ব্বদমনের প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কিন্তু রাণীডাঙা কুরপালার লোকে তাকে বলে, হাঁড়ি মুখো চোবে।

চর্ম্মরোগে তার সমস্ত শরীরই কালো হইয়াছে। বিশেষত মুখখানা একেবারে পোড়া হাঁড়ির মতন।

দারোগা প্রশ্ন করেন, রামেন্দ্র ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেন। একসঙ্গে দু' তিনটা কথা বলাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। তিনি সংক্ষেপে শুধু হুঁ হাঁ করেন মাত্র।

তাঁর সব কথা স্পষ্ট শোনা যায় না। কিন্তু দারোগার কলম দ্রুতই চলে। কল্পনা ও অনুমানে তিনি অনেক কিছু লিখিয়া নেন। তিনি প্রশ্ন করেন, মোল্লার ভিটায় আপনি কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ে?

রামেন্দ্র একটু ভাবিয়া জবাব দেন, হ্যাঁ যদু নাপিত। হাতে লাঠি।

দারোগা লিখিলেন, যদু নাপিত হাতের লাঠি দিয়া জোরে আঘাত করিল।

তারপর প্রশ্ন, আর কে কে ছিল?

রামেন্দ্র একে একে আদম মিয়া, যোগেশ, মধু ও ভজহরির নাম করিলেন।

দারোগা উপস্থিত ভদ্রলোকদের শুনাইয়া কহিলেন, এরাই নাপিত পাড়ার নীচের বিল দখল করতে গিয়েছিল।

আবার প্রশ্ন, আচ্ছা আর কারও কথা মনে পড়ে, যেমন আলিমেদ্দের, জগু সর্দার, নারাণ সর্দার ?

উত্তরে রামেন্দ্র একটু মাথা নাড়িলেন, হাঁ কি না কি যে বলিলেন বোঝা গেল না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা কিছু বললে, যেমন ধরুন আয় বেটাকে সাবাড় করে দি। অথবা কোন গালমন্দ ?

রামেন্দ্র মাথা নাড়াইয়া জানাইলেন, না।

যদুর হাতে ত' লাঠি ছিল। আর কারও হাতে কোন অস্ত্র ? লাঠি, রামদা, তরোয়াল ?

দেখি নি—রামেন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেন। দারোগা বলিলেন, তা দেখবেন কি করে ? যাক্, আপনি কিছু বল্লেন ?

হাঁ।

কি বললেন ?

আর মারিস নে। তোদের জমি আমি ফিরিয়ে দেব।

তারা কি বললে ?

কোন উত্তর না দিয়া রামেন্দ্র আবার চোখ বোজেন।

যাক্ আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। ব্যাপারটা যাকে বলে, Agrarian Disturbance—বলিয়াই দারোগা বিজ্ঞের মতন হাসেন। তাঁর মুখে ফুটিয়া ওঠে নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের প্রফুল্লতা।

জবানবন্দির কাগজে রামেন্দ্রের টিপ সই নেওয়া হইল। প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ ইন্দুপ্রকাশ, দোল্লাই কাছারির নায়েব মথুরবাবু, ধীরাজ দাস প্রভৃতি নাম স্বাক্ষর করিলেন।

ধরপাকড় শুরু হয়। ভজহরি, বদুনাপিত আদম প্রভৃতি ধরা পড়ে অনেকে। দারোগা রিপোর্টে কি লিখিয়াছেন তিনিই জানেন

তবে রাখেন্দ্র যাদের নাম করেন নাই এমন কয়েকজনও গ্রেপ্তার হইল।

আরম্ভ হইল প্রশ্ন। দারোগা প্রথমে আদমকে জিজ্ঞাসা করেন, বড়বাবুকে মারবার সময় তোমরা কে কে ছিলে?

আমরা ত মারিনি হুজুর।

দারোগা হাসেন। আদম সেই হাসি দেখিয়া ভয় পাইয়া যায়। বলে, ধর্ম্মাবতার, কাণ্ডরানি শুনিয়া—

দারোগা ভজহরিকে নরম সুরে বলিলেন, তুমি বুড়ো মানুষ, জাতের মোড়ল। তোমাকে আমি অপমান করতে চাই না। মেরেছ যে তোমরা, এ তো জলের মতন পরিষ্কার।

ভজহরি বলে, আমরা—?

জমির জন্য তোমাদের রাগ হতে পারে সত্যি। কিন্তু কে কে ছিলে বল দেখি। আমি অবশ্য দেখব যাতে তুমি অন্তত খালাস পাও।

ভজহরি মৃত পিতামাতা ও গ্রামের জাগ্রত ঠাকুর দেবতাদের দোহাই দিয়া বলিল, আমরা নিরপরাধী। চীৎকার শুনিয়া—

দারোগা গর্জন করিয়া উঠিলেন, 'আবার সেই চীৎকার শুনিয়া— তোমরা দেখছি সব এক সুরে বাঁধা। রামবিরিজ, হাতকড়া।

কনষ্টেবল রামবিরিজ আদম ও ভজহরির হাতে হাতকড়া পরাইল। আদম বলিল, আল্লা, তোমার মনে এত ছিল!

এবার যদুনাপিতকে ডাকা হইল। তার কাঁধে ছিল জোলার তৈরি লাল গামছা। দারোগা গামছাখানা তার গলায় পেঁচাইয়া এক চড় মারিয়া বলিলেন, তুই বেটা পালের গোদা।' তোর হাতে লাঠি ছিল। সকালে উঠে এসেছিলি খোঁজ করতে। বল্, বল্ বেটা কে কে ছিলি তোরা?

বদ্ মাশিত বস্ত চেঁচায় আর বলে, আমি ছেলে মানুষ কিছুই জানি না —প্রহার ততই জোরে চলিতে থাকে।

রামেন্দ্রের স্ত্রী জাহ্নবী ও ইন্দুপ্রকাশ আপত্তি না করিলে কতক্ষণ যে চলিত বলা যায় না। প্রহার বন্ধ হইলে সর্ব্বদমন চোখে বলিল, কাইজি আপনি মারতে মানা কোরলেন কেন?

জাহ্নবী কহিলেন, বেচারী আমার দরজায় মারা যেত যে।

বেচারী নেই, শয়তান আছে। উকো বিল্লিকো কলিজা।

বীরেন বলিল, জানো মা, ও বেটা কি বলেছে?

জাহ্নবী পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন।

বীরেন বলিল, বলেছে বাবার নাকি বেড়ালের কলজে।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জাহ্নবী বলিলেন, সে যাক্, দেখো দারোগা যেন ওকে আর না মারেন।

আসামীদের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া, হাতে হাতকড়া পরাইয়া দারোগা তাদের লইয়া সমস্ত রাণীডাঙ্গা ও কুরপালা ঘুরিলেন। সঙ্গে ছিল ধীরাজ দাস প্রভৃতি কয়েকজন। দারোগা তাদের নিকট বলিলেন, It is a punitive measure.

রামেন্দ্র গুপ্ত ও নারায়ণ সর্দারের নাম করেন নাই কিন্তু পুলিশ তাদের উভয়ের বাড়ীতেও চড়াও হইল।

গুপ্তর খুব জ্বর, চোখ দু'টা লাল। মধ্যে মধ্যে ভুল বকে। শিয়রে বসিয়া হাত বাতাস করে, স্বামীর কপালে হাত বুলায়।

গুপ্ত কি যেন বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বেড়ায় হাতের এবং নড়ন্ত পাখার ছায়া দেখিয়াও ভয় পায়। বলে, দারোগা, ঐ, ঐ।

হাস্তের চোখ জলে ভরিয়া যায়। তার মনে পড়ে অনেক কথা। যখন তার বিবাহ হয় তখন শ্বশুর বয়স পঞ্চাশের উপর। কিন্তু সে যেমন ছিল জোয়ান, তেমনই কর্মঠ। তালগাছের মতন ঋজু, দীর্ঘকায়, খাপাসিধা, সরল মানুষ। পরগনার একজন শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল কিন্তু তার লাঠি কখনও অন্যায়ের সমর্থন করে নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের এই প্রৌঢ় পাত্রকে কন্যাদানের সময় হাস্তের বাবা গদাধর মালো জামাইকে বলে, তোমারে মাইয়া দিতেছি কেন জান? যুবারগো আমি বিশ্বাস্ করি না।- তারা যেন পেয়ারার ডাল, একটুতেই ভাইঙ্গা পড়ে। আর তুমি হৈলা কাঁঠাল গাছের মতন পোক্ত।

পর পর কয়েক বছর ফসল ভাল হয় নাই। কাটিয়াছে অভাবের মধ্যে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সময় সে খুব আশা করিয়া অন্য জায়গার জমি বন্ধক দিয়া বিলের জমি কিনিল। হাস্তকে বলিল, দেখবি সোনা ফলবে।

সোনাই ফলিল বটে। গরিবের ভাগ্যে এমন করিয়াই ফলে। তার উপর দারোগা যে অবস্থা করিয়াছে তাতে এখন প্রাণে বাঁচিলে হয়। আঘাত ও অপমান দু'-টাই তার বুকে বাজিল। অপমানটাই বেশী, সে একজন মানী লোক, ষাট বছরের সুদীর্ঘ জীবনে কারও কাছে একটা কড়া কথা শোনে নাই। কেহ নিন্দা করিতে পারে এমন কোনও কাজের ধারেও সে যাইত না, এতই ছিল তার মর্য্যাদা বোধ। দারোগা সেই মানুষটাকে খামকা অপমান করিল, নির্দয় ভাবে প্রহার করিল।

পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা অঙ্গ অবশ হইয়া যায়। বাড়ীতে আসিয়া হয় জ্বর, সঙ্গে কম্প। শেষরাত্রি হইতে ভুল বকিতে আরম্ভ করে।

হাস্ত স্বামীর মুখের দিকে চায় আর তার মনে পড়ে অনেক কথা।

এই মানুষটা তাকে কত যত্ন করিয়াছে, দিয়াছে কত মর্য্যাদা। তাদের ঘরে মেয়েরা এরূপ মর্য্যাদা পায়না, এমন কি তার অর্থও বোঝে না।

স্বামীর কাতর মলিন মুখ দেখিয়া হাস্ত ভাবে, মানুষ এমন নিষ্ঠুর হয় কেমন করিয়া? শুধু শুধু মার ধর করা! এ অত্যাচারের কি শেষ নাই?

এই সময় বাহিরে শোনা যায় অনেকগুলি পদশব্দ। কে যেন ডাকে, অশু।

সঙ্গে সঙ্গেই দরজার উপর ঘা পড়ে। দরোয়াজা খোল অশু—

জমিদারের পেয়াদার মতনই রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠস্বর। কিন্তু এ গলা ত' তার নয়। ভয়মিশ্রিত ব্যস্ততার সহিত দরজার কাছে আসিয়া হাস্ত পিছাইয়া যায়।

অশু—অশু কোথায়—বলিয়া দরজা ঠেলিয়া দারোগা ঘরে ঢোকেন। পিছনে কনষ্টেবল রামবিরিজ ও চৌকিদার পটল পল্লে। আর সকলে বাহিরে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকে।

দারোগা শয্যাগত অশুকে ডাকেন, ওঠ্, ওঠ্—

অশু বলে, আজ আর মাছ ধরতে যাব না, অজু।

ওসব চালাকি চলবে না। ওঠ্, ওঠ্—বলিয়া দারোগা আগাইয়া যাইতেই হাস্ত তাঁর ও স্বামীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, ভাখেন না যে অর অসুখ। শেষ রাত্তিরের থা ভুল কইতেছে।

চাষীর বউর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় দারোগা অবাক হইয়া যান। পল্লীগ্রামের মেয়ের এ রকম ভঙ্গী তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাঁর সুর নরম হয়। বলেন, একটু দরকার ছিল যে।

হাস্ত বলে, কাল আপনি ডাকলেন, ভাল মানুষটা গেল, ফেরল আধ মরা হৈয়া। সারিয়া উঠুক, পরে আপনার দরকার সারবেন।

আচ্ছা, আচ্ছা বলিয়া দারোগা অপ্রতিভ ভাবেই বাহির হইয়া যান।

তাঁর সঙ্গে গ্রামের যারা আসিয়াছিল তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউয়ি করে। আড়ালে যাইয়া হাস্তের বাহবা দেয়। বলে, জবর দস্ত যাইয়া বটেক। বেটারে বেশ জব্দ করছে।

চার

রাণীডাঙ্গায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। সকলেরই মুখে ঐ এক কথা—কুরপালার এত বড় আস্পর্ধা যে রাণীডাঙ্গার গায়ে হাত তোলে, তাও যার তার নয়, একেবারে রামেন্দ্রবাবুর গায়ে।

এমনি কোন বিষয়েই তাদের ঐক্য নাই। রায়েরা গরিব হওয়ার পর হইতে সামাজিক শৃঙ্খলা টুকুও লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু আজ আবার তারা এক কাট্টা হইল। যে ভাবে হোক কুরপালাকে জব্দ করিতে হইবে। চাষা-ভুষাদের সমঝাইয়া দিতে হইবে যে রাণীডাঙ্গা এখনও মরে নাই।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রায়েদের লুপ্ত আভিজাত্যের প্রতি তাদের আবার মমত্ববোধ জন্মে। বয়স্কদের মনে পড়ে পুরানো দিনের অনেক কথা।

বঙ্কিম কুণ্ডু দেশে ছিল না। দারোগা যেদিন চাষীদের বিল হইতে তুলিয়া দেন সেই দিনই দুপুরে জরুরী কাজে সে কলিকাতায় চলিয়া যায়। সেইখানে বসিয়া গ্রামের সব খবর পায়। বীরেনকে লেখে, তোমার বাবার সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। যত টাকা লাগে

তাঁর ভাল চিকিৎসা করাবে। অন্ত সব বিষয়ে আমি ফিরে ব্যবস্থা করব। আমার যেতে দেরি হবে না।

গ্রামের বারোয়ারি পূজার যাত্রা থিয়েটার হয় তার টাকায়। লোকে আপদে বিপদে তার কাছেই ছুটিয়া আসে। বঙ্কিম কুণ্ডুও ভাবে যে রায়েরা নয়, বর্তমানে সেই দেশের প্রকৃত নেতা, গ্রামের মান প্রতিপত্তি রক্ষার দায়িত্ব তার।

কুরপালার জমিদার রামেন্দ্র রায়, জমিদারি বঙ্কিম কুণ্ডুর কাছে বন্ধক। সে দেশে ফিরিয়া বীরেনকে দিয়া কুরপালার মাতব্বর প্রজাদের নামে বাকি খাজনার নালিশ করাইল। চাষীরা আশে-পাশের গ্রামে অন্য যে সব ভূস্বামীর জমি খায়, বঙ্কিমের প্ররোচনায় তাদের ও কেহ কেহ নালিশ করিল।

কুরপালার লোকে তার দোকানে বাকিতে মাল পায় না। অন্য দোকানে গেলে দোকানিরা বলে, কুণ্ডুবাবু বাকিতে মাল দিতে নিষেধ করছে। আমরা দেই কি করিয়া?

দেওয়ার তাদের উপায়ও নাই। বঙ্কিমের নিকট হইতে মাল লইয়া তারা কারবার করে। ছোট দোকানদারদের পক্ষে তাকে অখুশি করিয়া কারবার চালান অসম্ভব।

কুরপালার লোকের অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হইয়া ওঠে। অনেকেরই ঘরে খাবার নাই, দোকানে বাকি পাওয়া যায় না। এতগুলি জমি হাতছাড়া হইয়া গেল, তার পরই আসিতে লাগিল ক্রোকী পরোয়ানা। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুর্দৈব এই যে ফৌজদারী মামলার আসামীরা এখনও জামিনে খালাস হয় নাই। জামিনের দরখাস্ত পড়িলেই কোর্ট ইনস্পেক্টর ও সরকারী উকিল আপত্তি করেন, আসামীরা সব সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক, এদের জামিন দিলে ভয়ে আর কেউ সাক্ষী দিতে আসবে না।

পুলিসের হাত-ধরা বলিয়া এই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটটি অল্প বয়সেই মহকুমার ভার পাইয়াছেন, তিনি জামিন দেন না। জেলা জজের কাছে দরখাস্ত করা হয়। এই সময় বহু নাপিত এক হাকিমের সামনে স্বীকারোক্তি করে—

আমরা মাঠ হইতে চলিয়া আসার পর বেলা তিন পহর উদানে মেহের সাইবের বাড়ীতে এক বৈঠক বসল। পাঠানপাড়ার মাতব্বর আলিমেহের সাইবের কথা কইতেছি। ছিলাম আমরা সবাই, তুলসী কাহার ভজহরি নসীরাম আদম মিয়া—মোটের উপর যারা জমি নিছিল, অগু বাদে তাদের প্রত্যেকে। সলা-পরামর্শ করিয়া সাব্যস্ত হইল বড় রাজারে আর হারাণ মুদির পো বঙ্কিম মুদিরে সাবাড় করিয়া দিতে হবে।

সন্ধ্যায় গেলাম ছোট রাজা বিশ্বনাথবাবুর বাড়ী মালি-মামলার ব্যবস্থা করতে। ফেরার পথে মোল্লার ভিটার ধারে আসিয়া আকালী কইল, রোজই রামেন্দির শালা এই পথ দিয়া ফেরে। আয় আমরা লুকাইয়া থাকি, বেটা আইলে একেবারে শেষ করিয়া দেব।

হাকিম প্রশ্ন করিলেন, সে জানল কি করে যে রামেন্দ্র বাবু তখন ঐ পথ দিয়ে ফিরবেন?

বহু নাপিত বলিল, কথাটা গোপন নাই ধর্ম্মাবতার, জানে সবাই। উনি রোজ এই সময় বিনি গয়লানীর বাড়ী হইতে ফেরে কিনা।

গয়লানীর নাম লিখিয়া হাকিম তার নীচে একটা দাগ কাটিলেন, তারপর প্রশ্ন করিলেন, আকালী ছাড়া কে কে রামেন্দ্র বাবুকে মারতে চেয়েছিল?

এই অধম ছাড়া আর প্রত্যেকে। আমি কইলাম, একটু বিবেচনা

করিয়া যা হয় কর। রাম বাবু আমারগো রাজা। হিন্দুরগো কাছে রাজ-হত্যা গো হত্যার সমান।

আদম কারিগর বলিল, রাখো তোমার গোহত্যা। ব্যাটারে আমি নিজ হাতে জবাই করব ! রাজা না হাতী—টাকা খাইলেন আমার গো, আর জমি দিলেন কিনা কুত্তুর পোরে।

সকলেই তার কথায় সায় দিল। অগত্যা আমিও কইলাম, বেশ কর যা তোমার গো খুশি, নাবালকের বাকি্য যখন শোনলাই না।

একটু পরে শুনি রামেন্দির রাজার কণ্ঠ। পরানে ঘুবোর মত ফুর্ত্তি তানার কত। তিনি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে আসতেছেন। তেঁতুল ব্রেক্ষডার তলায়ও যেই আইছেন অমনে আদম যাইয়া মাথায় মারল এক লাঠির বাড়ি। বড় রাজা চীৎকার করিয়া ওঠল। এবার মারল আমারগো আকালী শীল—যারে বলে ওস্তাদের মার। রামেন্দির ধরাশায়ী হইলেন, একেবারে দুগগা পূজার মোষের মতন। আমি ভাবলাম ধড়ে আর পরান থাকবে না। তাই পরের দিন বাঁচিয়া আছে শুনিয়া কইলাম, একেবারে বিড়ালের কৈলজা।

এই স্বীকারোক্তির ফলে আর একদল ধরা পড়ে। বিনি গয়লানীকে সরকার পক্ষের সাক্ষী মান্য করা হয়। খবরটা জাহ্নবীর কানেও উঠে।

এই মহিলা দুঃখ দারিদ্র্যে কোনদিন মুষড়িয়া পড়েন নাই, দুর্দৈব আসিয়াছে, তিনি হাসিমুখে মাথা পাতিয়া সহ্য করিয়াছেন। আঘাতের ফলে রামেন্দ্রের অবস্থা যখন খুব খারাপ হয় তখনও একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই। কিন্তু বিনি গয়লানী সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইবে শুনিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

সে যাইয়া বলিবে, আমি রায় বাবুর রক্ষিতা। সমস্ত কাছারির লোক তাহা শুনিবে, জেলার লোক জানিতে পারিবে। জাহ্নবীর মনে

হইল, প্রকাশ্য আদালতে স্বামীর এই অপমান হওয়ার আগে তাঁর নিজের মৃত্যু হইল না কেন ?

বঙ্কিম কুণ্ডু হয় ত' টাকার জোরে সাক্ষীর তালিকা হইতে বিনির নাম কাটাইয়া দিতে পারে কিন্তু তার সামনে একথা তুলিতেও লজ্জা করে। সে হয় ত' জানে সব, কিন্তু রায় বাড়ীর বড় রাজার স্ত্রী হইয়া জাহ্নবী নিজ হইতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারেন না।

নারায়ণের নামে আগেই ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল, পুলিস তার মাকে দুই একবার ধমকাইয়াও গিয়াছে, ছেলেকে যদি ধরিয়ে না দিস্ তো দেখবি মজা। বল, কোথায় আছে ? না হলে ঘর-বাড়ী ভেঙে জ্বালিয়ে দেব।

পুলিস যত ভয় দেখায়, নারায়ণের মা ক্ষান্ত ততই কাঁদে। বলে, আমি কিছু জানি না হুজুর। সেই-যে দু'গ্রাস খাইয়া—

কনষ্টেবল রামবিরিজ বলে, চোপ রও দো গেরস।

এরপর হুলিয়া বাহির হয়। অন্যবার রামবিরিজ একা আসে, এবার আসে দুইজন। একজন রামবিরিজ, অপরটি তার উপরওয়ালা। অন্ততঃ তার হাবভাব দেখিয়া বুড়ার সেইরূপ মনে হয়। নতুন পুলিসটি বলে, ছেলিয়ার নামে এবার হুলিয়া হল, বুঝলি বুড়ি ?

হুলিয়া যে কি বস্তু ক্ষান্ত তাহা বোঝে না। সে হাঁ করিয়া পুলিসটির দিকে চাহিয়া থাকে।

পুলিসটি বলে, ও সব নেকামি হচ্ছে, হামরা সব সমঝাতে পারি। দে বেটি, খরচা উরচা।

ক্ষান্ত বলে, আমি পাব কোথায়, গরিব মানুষ। নৈরপরাধী আমার ছেলেরে ধরছ, আবার মায়রে কও খরচা দিতে ?

পুলিস আরও জোরে হুমকি দেয়। বৃদ্ধা বলে, মা হৈয়া আমি কইতে পারি যে আমার ছাওয়াল গঙ্গাজলের মত পরিশুদ্ধ।

পুলিস চলিয়া যায়। বৈকালে কান্ত দেখে বেড়ায় করমচার কাঁটা দিয়া আটকানো একখানা কাগজ। এই কাগজের সঙ্গে তার পুত্রের কল্যাণ অকল্যাণ জড়িত মনে করিয়া সে সারারাত কাগজখানাকে পাহারা দেয়। পাছে কেহ ওখানা ছিঁড়িয়া ফেলে এই ভয়ে একবারও চোখ বোজে না, নিজেও কাগজখানা ছোঁয় না—কে জানে ওর মধ্যে কি আছে। কিসে কি হয়।

পাঁচ

পদ্ম বোষ্টম ও অঞ্জু বৈরাগী কুরপালার লোক নয়, তবে এখানে আছে দশবৎসরের উপর। একবার রাণীডাঙ্গার মেলায় তারা আসে। তাদের গান শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হয়। তারাও কুরপালায় নীড় বাঁধে।

সেইবারই হাস্তের বিবাহ। বিবাহের পর তার বাবা গদাধর মালো মেয়েকে বলে, নবদ্বীপ ঘুরিয়া আসার পরই গ্রামে একটা বৈষ্টবের আখড়া করতে ইচ্ছা হইছে।

হাস্ত বলে, বেশ ত'।

গদাধর বলে, আখড়া করার লোকও পাওয়া গেছে। পদ্ম মাইয়াটি ভাল। আমার ইচ্ছা অরে আমার ভিটাটা দি। তুই তাতে রাগ করবি না'ত?

হাস্ত হাসিয়া বলে, রাগ করব কেন?

গদাধর তারপর নেয় জামাইর সম্মতি। দু'জনকেই সে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করে।

একদিন অষ্ট প্রহর নামকীর্তন দিয়া, আশেপাশের কয়েক গ্রামের

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদের খিচুড়ি ও মালপোয়া ভোগ খাওয়াইয়া তাদের সামনেই গদাধর পদ্মকে তার ভিটা দান করে।

অজু বলে, কাগজের উপর দুইটা ছত্তর লেইখ্যা দেও প্রভু।

এতগুলা লোকের সামনে দিলাম, লিখনের আর দরকার কি?

অজু কহিল, তবু কালির একটা আঁচড় আমার নামে—

গদাধর অজুকে ভিটা দানের প্রস্তাব মোটে কানেই তুলিল না। পরেরদিন রিক্ত হস্তে বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

অজু ক্ষুণ্ণ হইল, গজর গজর করিল। গাঁজা টানার সঙ্গী ভগবান ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিল, পদ্মর মুখ দেইখ্যা বুড়িয়া ভুলিয়া গেছে।

পদ্মরা সেই হইতে হাস্তুর ভিটায়ই আছে। হাস্তুর সঙ্গে তার খুব ভাব। তাকে সে ছোট বোনের মতন ভালবাসে। বলে, জানই ত, মাইয়ারগো নীড় বাঁধার শখ কত। আমার সেই নীড় হৈছে তোমার জন্য। না হৈলে খড় কুটার মতন ভাসিয়া যাইতাম।

হাস্তু বলে, আমার জন্য কিরকম? ও তো বাবা দিয়া গেছে।

তোমার অমতে কি দিতে পারত?

কুরপালা ও রাণীডাঙ্গায় নাম শুনাইয়া এই বৈষ্ণব দম্পতির দিন চলিয়া যায়। তারা দুই বিঘা জমিও কিনিয়াছে, আর একটি সাদা গাই, নাম ধবলী।

শ্বশুর অসুখের বাড়াবাড়ির পর হইতে পদ্ম প্রায় প্রত্যহই আসে, তার জন্য ধবলীর দুধ দিয়া যায়, মধ্যে মধ্যে ফল পাকুড়ও আনে। হাস্তুকে বলে, আমি যে এত ঘন ঘন আসি তা যেন তোমাদের বৈষ্ণব টের না পায়।

তুমি আমারে ভালবাস বলিয়া বৈষ্ণবের হিংসা হয় বুঝি?

হিংসা! তা হইলেত' বাঁচতাম। সঙ্গে সঙ্গেই পদ্ম জিভ কাটিয়া বলে, বৈষ্ণবের ওসব কথা মুখে আনতে নাই।

অগু পদ্মের গান শুনিতে ভালবাসে। অসুখের মধ্যে ঐটাই তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

পদ্ম তাকে পদাবলি শোনায়। অগু গানের তালে তালে আঙুল নাড়ে, বলে, কীর্তন শোনলে মনটা যেন কোথায় চলিয়া যায়। মাঠের ওপারে, ঐ গাছপালা ছাড়াইয়া।

হাস্থ বলিল, তুমি ঠাকুরের বড় ভক্ত।

ভক্ত না। দিন যত ঘনাইয়া আসে, ততই ভয় করে। ভাবি, করলাম কি। ওপারে কি নিয়া যাইয়া দাঁড়াব?

হাস্থ তার হাত ধরিয়া বলে, না, তোমার কোন ভয় নাই।

অগুর মুখখানা তখনকার মতন প্রফুল্ল হয় বটে কিন্তু পরক্ষণেই শূন্যে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকে, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

তরুণী হাস্থ এই আকুতির গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

আদালতের নাজির ও পেয়াদা মালক্রোক লইয়া আসে। পিছনে অনেক লোক।

বঙ্কিম কুণ্ডু নিজের পাওনার জন্য এবং অন্য পাওনাদারের পক্ষ হইতে কুরপালার বহু লোকের নামে মামলা রুজু করে। শমন গোপন করিয়া মালক্রোক আনে। ডিক্রিদারের পক্ষে মাল সনাক্ত করিবার জন্য ধীরাজ আসিয়াছে। তার কোলে একটি ছেলে, হাতে আর একটি। আর সবাই আসিয়াছে মজা দেখিতে।

তাদেরই বা দোষ কি? পরের বিপদে খুশি হওয়ার প্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত। তাই প্রতিবেশীর কোন লাঞ্ছনা বা অপমান হইলে শিক্ষিত লোকেও জানালার পাখি ফাঁক করিয়া লাঞ্ছনার পরিমাণ কতখানি দেখিয়া লয়। কম হইলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়।

ঘরখানা ভাঙ্গা, বেড়া নাই বলিলেই চলে। জগুর অবস্থা নাজির পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিলেন শয্যাশায়ী রোগী, তার পাশে একটি নারী বসিয়া। অপ্রীতিকর কাজের কি ভাবে মুখবন্ধ করা যায় সেই সম্পর্কে তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন, এই সময় ধীরাজ চীৎকার করিয়া বলিল, তোমার নামে মাল ক্রোক এসেছে, জগু।

অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া জগু সবে তখন একটু চোখ বুজিয়াছে। অগত্যা হাস্তই দরজার পাশ হইতে নাজিরের দিকে চাহিয়া বলিল, চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। একবার দ্যাখেন কি অবস্থা।

নাজির ভিতরে উঁকি মারিয়া শয্যালগ্ন অস্থিচর্মসার জগুকে দেখিয়া বলিলেন, থাক্, তোমাদের আমি সময় দিচ্ছি।

হাস্ত কোন কথা বলিল না। কাপড়ের আঁচল গলায় পেঁচাইয়া ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া নাজিরের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

নাজির ননীবাবু এই গ্রামে আরও অনেকবার আসিয়াছেন। ধীরাজ তাকে চিনিত। সে বলিল, সময় দিচ্ছেন কেন ননীবাবু? ওই কাঁসার জাম বাটিটা রয়েছে, তা ছাড় লাঙ্গল, বেতের মোড়া একটা।

চাষার লাঙ্গল নিলেম হয় না ধীরাজবাবু। বাটি মাত্র ঐ একটা দেখছি, রোগী ওতে জল খায়।

হরকান্ত বলিল, আর সব মাল আগেই লুকিয়েছে। একটু সন্ধান করুন। ডিক্রিদারের স্বার্থও ত' আপনাকে দেখতে হবে।

নাজির বলিলেন, আমার কাজ আমি ভালই জানি। আপনাদের বলে দিতে হবে না।

তা ঠিক, তবে কিনা ঐ বেতের মোড়াটা ত ওদের—

নাজির হরকান্তের দিকে একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

হরকান্ত বেতের ঘোড়ার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই হাস্ত সেটাকে এক হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল।

এই ঘোড়ার ইতিহাস আছে। জিনিসটা পুরাতন কিন্তু সম্প্রতি চামড়া দিয়া ছাওয়া হইয়াছে। রাণীডাঙ্গার শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে ভেড়া কাটিয়া জগু ছালখানা চাহিয়া নেয়।

শশধর জিজ্ঞাসা করেন, কি করবে এই ছাল দিয়ে?

একটা পুরানো ঘোড়া আছে। সেইটা ছাইয়া নেব।

নরম লোম সমেত ভেড়ার চামড়ায় ঘোড়াটি ছাইয়া জগু স্ত্রীকে বলে, তুই একটু বয় হাস্ত। আমি দেখি।

হাস্ত বলে, আমার লজ্জা করে। কিন্তু জগু তাকে না বসাইয়া ছাড়ে না।

নাজিরের কৃপায় জগুর সামান্য তৈজসপত্র রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু কুরপালার বহু লোকের অস্থাবর নিলামে চড়িল। নিলামে ডাকার জন্য কাছারির পাইক পেয়াদা ও বঙ্কিম কুণ্ডুর লোকেরা হাটে আনিয়া মাল জড় করিতে লাগিল। আনিল আকালী শীলের মাছধরার জাল, অশ্বিনীর পিতামহের আমলের বড় একটা কাঠের বাক্স, এরফানের বাজনা, তুলসীর শতরঞ্চি ও পিতলের তৈয়ারী হুকার বৈঠক, এই রকম অনেকের অনেক কিছু।

খানিকক্ষণ পরে তন্দ্রার ভাব কাটিয়া গেলে জগু বলিল, আমারে যেন ডাকতেছিল কেডা?

এই অবস্থায় মাল ক্রোকের কথা জানানো চলে না তাই হাস্ত বলিল, মা ডাকে নাই তো কেউ।

জগু বলে, আমি শোনলাম কেডা যেন কইতেছে—তোমার ডাক

আইছে জগু, ডাক আইছে। তার পর একটু থামিয়া আবার বলে, কার ডাক কইতে পার হাগু?

না না ও কিছু নয়। তুমি স্বপ্ন দেখছ।

হবে, দুর্ব্বল শরীলে ও রকম নাকি হয়, বলিয়া জগু পাশ ফিরিয়া শুইল।

ছয়

নারায়ণ উধাও হওয়ার সময়, তার মায়ের হাতে সামান্য কিছু ছিল। উহা খরচ হইয়া গেলে আরম্ভ হইল অনশন, অর্দ্ধাশন। কচুর শাক, কাঁটানটে খাইয়া দিন আর যখন চলে না তখন সে সর্ব্বদমনের শরণ লইল।

সর্ব্বদমন বন্ধকের ধার ধারে না। যার কাছে যেরূপ পারে দুই আনা চার আনা সুদে টাকা ধার দেয়। দেনদারদের দরজায় যাইয়া লাঠি ঠুকিয়া বলে, হামারা রূপেয়া লে আও। লোকে তাকে ভয় করে, যে ভাবে হোক তার দেনা শোধ করিয়া দেয়।

সে চার আনা সুদে ক্ষান্তকে একটি টাকা দিল। কাগজে লিখিল দুই টাকা। ক্ষান্তের দুই হাতের বুড়া আঙুলের ছাপ লইয়া কালী পূজার জন্য দুই আনা কাটিয়া রাখিল। এই ব্যাপারে তার হাতেখড়ি হয় রাণীডাঙ্গার রাজুবাবুর নিকট। এই বাবুটি কলিকাতায় দোকান করিতেন। সমাজ সেবা, দেশ সেবার বহু বুলি আওড়াইতেন। হঠাৎ একদিন গণেশ উল্‌টাইয়া দেশে আসিয়া হাজির হইলেন। আরম্ভ করিলেন লগ্নি কারবার।

সর্ব্বদমন প্রথম দু' তিন মাস রাজুবাবুর কাজ করিত। তিনি এক

বৎসর পরেই মারা যান, কিন্তু সে তার কারবারের পদ্ধতিটা আজও বজায় রাখিয়াছে।

কান্ত ষষ্ঠী মুদির দোকানে চৌদ্দ আনার পয়সা দিয়া বলিল, আমাকে চাল আর নুন দাও।

ষষ্ঠী ভুঁড়ি দুলাইতে দুলাইতে পয়সাগুলি বাক্সে রাখিয়া বলিল, আর চার আনা?

সে পরে দেব বাবা।

ষষ্ঠী বলিল, আগের পাওনা শোধ না করলে মাল দিতে পারব না।

বৃদ্ধা কাকুতি মিনতি করে। বলে, দে বাবা, দুদিন না খাইয়া আছি। মনে কর্‌ যে দুঃখিনীরে দিলি।

ষষ্ঠী বলে, দাতা কর্ণ সাজার জন্য আমি দোকান খুলি নাই।

এই দোকানের তারা পুরাতন খরিদ্দার। পাওনা কাটিয়া রাখিয়া ষষ্ঠী যে তাকে এইভাবে ফিরাইয়া দিবে কান্ত ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। দুই দিন উপবাসের পর এক মাইল পথ হাঁটিয়া আসিল। আবার অতটা ফিরিতে হইবে। সে এবার কাঁদিয়া ফেলিল, তোমার ঘরেও ত বুড়া মা আছে।

ষষ্ঠী চীৎকার করিয়া ওঠে, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। আমার মায়ের সঙ্গে তুলনা করিস। ভাগ, মাগী ভাগ।

কান্তও রাগিয়া গেল, বলিল, তুলনা করছে কেডা? আর করবই বা কেন? তোর মায়ের গুণের কথা সগলটিই জানে।

তবে রে হারাম—বলিয়া ষষ্ঠী উঠানে লাফাইয়া পড়ে।

পিছন হইতে ইন্দুপ্রকাশ ডাকিয়া বলেন, ছিঃ ষষ্ঠী।

তাঁকে দেখিয়া ষষ্ঠী সংযত হয়। বলে, দেখুন তো, ও কিনা আমার

মায়ের কুচ্ছা করে। আপনি হাকিমে হাকিম, বাওনে বাওন। আপনি নিজ কর্ণেই ত শ্রবণ করলেন।

শুনেছি সবই। এ তোমার অন্যায় নাড়ুর মা।

ক্ষান্ত বলে, ওই আমারে আগে মাগী কইছে দেবতা।

ইন্দুপ্রকাশ উভয়কেই শান্ত করেন। ক্ষান্তর দরুন বাকী পয়সা কয় আনা চুকাইয়া দিয়া ষষ্ঠীকে আর একটি টাকা দিয়া বলেন, ওকে এক টাকার চাল, ডাল যা চায় দিয়ে দাও।

ক্ষান্ত বলে, ডাইলের আমার দরকার নাই। নাড়ু আসুক তখন আবার ডাইল খাব। আমারে চাউল আর লবণ দেও ষষ্ঠী। আর একটু তৈল, কটু তৈল।

জিনিস মাপিতে মাপিতে ষষ্ঠী বলিল, কি করি দা'ঠাকুর? বঙ্কু বাবুর মানা, না হইলে আমরা কি খরিদদার ফিরাই, আমারগো পুঁটি মাছের পরান।

ক্ষান্ত বলে, আপনি হৈলা দেবতা, দা'ঠাকুর, সারে কয় দেবাংশ। কওতো ছাওয়ালটার আমার হইল কি? আজ দুই মাস নিখোঁজ পরশু পুলিস আসিয়া বেড়ায় কাগজ আঁটিয়া দিয়া গেল। আর ...ল গালাজের ত কথাই নাই। ঐগুলা হৈল ফাউ।

একটু থামিয়া বৃদ্ধা আবার বলে, মায়ের এত লাঞ্ছনা কিন্তু নাড়ুর ফেরবার নাম নাই।

ভেব না কিছু। মা তোমার মঙ্গল করবেন। মা, তারা ব্রহ্মময়ী— বলিয়া ইন্দুপ্রকাশ চলিয়া যাইতেছিলেন, ক্ষান্ত বলিল, একটু দাঁড়াও দা'ঠাকুর। পায়ের ধুলা দাও।

ছলিয়া সম্বন্ধে ক্ষান্ত কাহাকেও কোন প্রশ্ন করে নাই, করিতে ভরসা পায় নাই। ইন্দুপ্রকাশ ভাল মানুষ, তার উপর প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ।

কান্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, হুলিয়া কয় কিসেরে? আমার নাড়ুর নামে নাকি সেই হুলিয়া হইছে।

ইন্দ্রপ্রকাশ বলিলেন, ওটা আদালতে হাজির হওয়ার হুকুমনামা। হাজির না হলে যে কেউ ধরিয়ে দিতে পারে।

আমার ছাওয়াল কিছু করে নাই। আমি ত' তারে চিনি। মা হৈয়া কইতে পারি নাড়ু আমার গঙ্গার জলের মতন পরিশুদ্ধ। তুমি একটু লেইখা দাও। তুমি ত সব জান।

ইন্দুপ্রকাশ কোন উত্তর করিলেন না। লোকে ইন্দুপ্রকাশকে এত শ্রদ্ধা করে যে ব্যাপারটা তাঁকে জানাইয়াই কান্ত খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া যায়।

রান্না করিতে বেলা পড়িয়া যায়। প্রায় সন্ধ্যার সময় কান্ত খাইয়া ওঠে। অনেক দিন পরে পেট ভরিয়া খাওয়ার ফলে তার পরই ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে নারায়ণ যেন ছোটটি হইয়া গিয়াছে। মায়ের কোলে শুইয়া যেমনটি তার বুকের দুধ চুষিত ঠিক তেমন।

ছোট্ট নাড়ু একদল লোকের সঙ্গে লড়াই করে। লোকগুলি যেন চেনা চেনা। হ্যাঁ ঠিকই। একজন জমিদার রামেন্দ্র আর একজন বঙ্কিম কুণ্ডু। বঙ্কিমের শরীরের নীচের দিকটা সাপের লেজের মতন লিকলিকে। একটি বটগাছে লেজ জড়াইয়া সে মুখ দিয়া নাড়ুকে বার বার ছোবল মারে। বৃদ্ধার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে চীৎকার করিয়া ওঠে, সর্, নাড়ু সর্।

কিন্তু পরক্ষণেই দেখে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। কাগজখানা ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য সে বাহির হইয়া আসে।

বাহিরে সে কী আলো! আকাশ ছাওয়া দুধের চন্দ্রাতপ। প্রাণবন্ত এই জ্যোৎস্না যেন ফিস ফিস করিয়া কথা কয়। তার প্রতিটি নিঃশ্বাস

কান্তের কানে বাজে। ভাঙনধরা পারে নদীর ঢেউয়ের মত বাতাস আসিয়া জীর্ণ কুটীরে আছাড় খায়—ভাঙিয়া পড়ে কান্তের শীর্ণ শুষ্ক পাঁজরের উপুর।

বৃদ্ধার মনে পড়ে অনেক কথা—পুত্রকে, স্বামীকে, জমিদার রামেন্দ্রকে। রামেন্দ্রের স্মৃতি মনটাকে বিষাইয়া তোলে। পরক্ষণেই ভাবে স্বামীর কথা। তার সেই চওড়া বুক, দৃঢ় বাহু বন্ধন। এই বয়সেও সেই স্মৃতি কী দোলাই না দেয়। তার স্বামী ও নাড়ুর গড়ন একই রকম। মুখের আদলে কোন তফাৎ নাই। নারায়নকে দেখিলে মনে হয় তরুণ প্যারীই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

বিবাহের পর বহুদিন তার সন্তান না হওয়ায় লোকে মনে করিল, কান্ত বন্ধ্যা হইবে! প্যারীর মাসী পিসী, জেঠী খুড়ীর দল বলিল, আর একটা বিয়া কর পেয়ারি। না হৈলে বংশে বাতি দিবে কেডা?

প্যারী হাসিয়া বলিত, বাতি ত দেবে আমি মরার পর। এখন দুই বউরে খাওয়াই কি?

কান্তও মধ্যে মধ্যে অনুরোধ করিত। উত্তরে প্যারী বলিত, যে-বউরা সোয়ামীরে ভালবাসে না, তারাই সতীন আনার কথা কইতে পারে।

কান্ত বলিত, আমিও ত সেই জন্যই কই।

এই সময় সাগর বৌয়ের পোড়ো ভিটায় এক সাধু আসিয়া আস্তানা গাড়িল। তার কাছে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—কেহ ব্যাধি সারাইতে, কেহ বন্ধ্যাত্ব দূর করিতে।

কারও আমগাছের কলমের চারায় ফল ধরে নাই। সে বলিল, বা হয় এর একটা ব্যবস্থা কর ফকির সাইব।

সামনেই একটা ডোবা ছিল। ফকির প্রত্যেক প্রার্থীকে বলে, যাও ঐ ডোবায় ডুব দিয়া, আল্লা হরি তোমার যিনি দেবতা তাঁর নাম করিয়া আরজি জানাও। ফল মেলবে।

প্রার্থী বলে, তুমিও একটু কইয়া দিও সাইব।

ডোবার মালিক খোদা। তিনি আরজি মঞ্জুর করবেন।

সাধুর আশীর্বাণী লইয়া ডোবায় স্নান করিবার পর পরিণত বয়সে ক্ষান্তের সন্তান সম্ভাবনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্যারীর আদর বাড়ে, সে তাকে কাঁচা আম, চালিতা, নারিকেলের নাড়ু এই সব খাওয়ায়। নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে কাপড়ের খুঁটে জিলিপি বাঁধিয়া আনিয়া গোপনে তার মুখে পুরিয়া দেয়।

কিন্তু ক্ষান্তের বরাতে এতটা সুখ সহ্য হয় না। তিন দিনের জ্বরে ভুগিয়া প্যারী মারা যায়। নারায়ণ ভূমিষ্ঠ হয় পিতার মৃত্যুর পর।

এই হতভাগ্যের জন্ম মুহূর্তে কেহ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে না, কেহ শাঁখ বাজায় না। নারায়ণ জগতে আসে আগাছারই মতন অবাঞ্ছিত বস্তু রূপে। ক্ষান্তের ভয় হয়, এই রক্তমাংসের দলাকে সে বাঁচাইয়া রাখিবে কেমন করিয়া?

সেই ছেলে বড় হয়, পাঠশালায় যায়, কলাপাতার শ্রেণীতে ওঠে। তাদের পাঠশালায় প্রথমে তালপাতায় লেখা শুরু হয়। তার উপরের শ্রেণী কলাপাতার। নারায়ণ কলাপাতায় লিখিতে আরম্ভ করিলে মায়ের আশা হয় লেখাপড়া শিখিয়া নাড়ু মানুষ হইবে। রাণীডাঙ্গার বাবুদের মতন অবশ্য নয়, তবে সেও বিদ্বান্ হইয়া ছোটখাটো চাকরি পাইবে—কাছারির পেয়াদা কিংবা আপিসে আরদালীর কাজ।

কিন্তু তেরয় পা দিতে না দিতেই উদরান্নের জন্য তাকে মাঠে নামিতে হয়। প্রথমে নামে রাখাল হইয়া। আরম্ভ হয় পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত জীবন।

এর পরেই তার নামে অভিযোগ আসিতে আরম্ভ করে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগের সংখ্যাও বাড়ে। কেহ আসিয়া ক্ষান্তকে বলে, তোমার ছাওয়াল আমার কাঁঠাল খাইছে। গাছের ফল, খাঁচার হাঁসের ডিম, অরগো জন্য থাকবে না আর কিছু।

ক্ষান্ত বলে, ডিম ত' সে খায় নাই আজ এক মাসের উপর।

ডিম কাঁচা খায়। বারুই বাড়ীর কিরণ আর তোমার নাড়ু অরা আমার ডিম খাইছে।

ক্ষান্ত বলে, কাঁচা ডিম খায়? ওমা কী ঘেন্না! আসুক বাড়ীতে, দেখাব ডিম খাওয়া কারে কয়।

নারায়ণ আর একটু বড় হইলে প্রতিবেশীরা ক্ষান্তকে শাসায়, ধরলে তোমার ছাওয়ালরে আর আস্তা রাখব না।

কেন, সে করছে কি?

আমার ফুরফুরির মাথা ফাটাইছে।

নারায়ণ বাড়ী ফিরিলে ক্ষান্ত তাকে বেদম প্রহার করে। বলে, মনে থাকে না যে তুই আবাগীর ছাওয়াল? তুই আবার দুষ্টামি কর কোন্ সাহসে?

নারায়ণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মার খায়। ক্ষান্তের শেষটায় দুঃখ করিতে থাকে। রাত্রে ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া বলে, এত মার খাস্, লজ্জা করে না?

তোমার কাছে আবার লজ্জা কিসের? মারুক না আর কেউ। দেখবে মজা। সেদিন আইছিল ফুটু, দিছি হারামজাদারে আছাড় মারিয়া।

ঝুণ্টু চাষার বয়সে নারায়ণের চেয়ে বড়, দেখিতেও ষণ্ডামার্ক। সে নারায়ণের সঙ্গে পারে না। ক্ষান্ত মনে মনে ইহাতে খুশি হয়। তার মুখের দিকে চাহিয়া নারায়ণ একটু একটু হাসে। মায়ের বুকে সেই হাসি অক্ষয় হইয়া থাকে।

আজ লোকে নারায়ণকে খুনে বলে, কিন্তু ক্ষান্ত বিশ্বাস করে না। সে একটু জেদী, একটু বেশী রাগী হইতে পারে, কিন্তু কোন অন্যায় কাজ করার মানুষ ত' সে নয়।

এই সময় দরজার পাশে 'খুট' করিয়া শব্দ হয়। নারায়ণের 'চিলা' কুকুরটা ঘেউ, ঘেউ করিয়া ওঠে।

কিরে চিলা? চেঁচাস্ কেন?—বলিয়া ক্ষান্তও এদিক ওদিক চায়।

সামনে আসিয়া দাঁড়ায় নারায়ণ, ক্ষান্ত চমকিয়া ওঠে। বলে, নাড়ু, তুই! ছিলি কোথায় রে এতদিন?

চুপ, আস্তে কথা কও।

ক্ষান্ত ছেলের কাছে আসিয়া তার গায়ে হাত বুলায়। বলে, এঁ্যা, পাঁজরের হাড় বাইর হইয়া গেছে দেখি।

নারায়ণ হাসিয়া বলে, লোকে কয় আমি মোটা হইছি। আর তুমি কও হাড় বাইর হৈছে।

যারা কয় তারা চক্ষুর মাথা খাইছে। যাক্, তুই খাইতে পাস্ ত রোজ? আইজ খাইছস?

হ, পাই রোজই। আজ খাইছি ডাইল, মাছের বেগুন, লাউশাক। শোনলাম তুমি রোজ খাইতে পাও না?

ক্ষান্ত কহিল, ও সকল মিছা কথা।

তুমি কাহিল হৈয়া গেছ।

সে হইছি বয়সের জন্ম। আর—

নারায়ণ বলিল, আর আমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া? তাই না?

ক্ষান্ত বলিল, কন্ কি, ভাবব না?

একটু পরে নারায়ণ প্রশ্ন করে মা, আমি কি পুলিসের কাছে ধরা দেব?

কেন রে—? ক্ষান্ত এক রূপ চীৎকার করিয়াই উঠে।

অতগুলা নির্দোষ মানুষ আমার জন্ম হাজতে পচতেছে। রামবাবুরে মারছি আমি।

তুই! না, না—তুই ভুল কও, তুই নয় রে।

উভয়েই একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। তারপর বৃদ্ধা হঠাৎ বলিয়া ওঠে, বেশ করেছিস। তুই অরে মারবি না ত' মারবে কেডা?

ক্ষান্তের চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠে। উহা লক্ষ্য না করিয়াই নারায়ণ বলে, না মারিয়া উপায় ছিল না। নামেই রায় বাড়ীর রাজা। কাজে চাষারও অধম।

ক্ষান্ত বলে, তুই ধরা দিলেও অরগো ছাড়বে না। মিছা তোর হাড় গুঁড়াইয়া দেবে। রায় বাড়ীতে যদু নাপিতের কী দশাটাই না করল। সে যত কয় আমি নির্দোষ, ততই প্রহার করে। শুনছি ফাটকে নাকি পা উঁচা করিয়া ঝুলাইয়া রাখত।

শুনছি আমিও। পুলিস তারে দিয়া আগাগোড়া মিছা কওয়াইছে। থাক তুমি বাড়ী ছাড়িয়া মাসীমার ওখানে চলিয়া যাও।

শেষটায় শ্বশুরের ভিটা ছাড়ব?

তা নয় ত' অপমানি হবা নাকি?

আর তুই?

আমার ভাবনা নাই। আমি যেখানে হয় চলিয়া যাব। বৈদ্যপুরে

আর থাকব না। পুলিস বোধ হয় টের পাইছে—বলিয়াই নারায়ণ কাপড়ের খুঁট খুলিয়া মায়ের হাতে কিছু টাকা দিল।

ক্ষান্ত কহিল, এত টাকা! এ যে দু'কুড়ি তিনকুড়ি হবে। এত পাইলি কোথায়?

টাকা অত না। পাইছি কাঠের কাজ করিয়া। ওখানকার লোকে আমার কাজ পছন্দ করে।

তা আর করবে না?—বলিয়া ক্ষান্ত গর্বভরে পুত্রের মুখের দিকে চায়। আবার বলে, রাণীডাঙ্গার বাবুরাই কত সুখ্যাতি করে, বৈন্তপুরের অরা আর করবে না!

কে করছে মা?

ভুবন মজুন্দার, গোপাল, পিসিডেন দা'ঠাকুর। ভাল কথা। তিনি পাঁচ সিকার পয়সা পায়। আর হাঁড়িমুখা পায় দুইডা টাকা।

তার কাছে দু'টাকা নিছ বুঝি?

দিছে চৌদ্দ আনা, লেখাইয়া নিছে দুই টাকা।

ও আমি দেব না। এই ভোরেই নিজে তারে চৌদ্দ আনা দিয়া যাব।

যাবি তার ধারে? যাইয়া শেষটায় কাজিয়া করবি?

নারায়ণ মার হাতে আরও দুইটা টাকা দিয়া বলিল, দা'ঠাকুরকে এই টাকার থা পাঁচসিকা দিও।

দারওয়ানের টাকা দুইটা?

তা হয় না মা। চৌদ্দ আনা দিয়া দুইটাকা নেওয়া অর আমি বন্ধ করব। তুমি মাসীমার বাড়ী যাও, দুগগা দারে কইও আমি মাস মাস টাকা দেব। তোমার জন্ম তারগো কোন খরচা লাগবে না।

নারায়ণ বিদায় লইবে এমন সময় 'তুই একটু দাঁড়া' বলিয়া ক্ষান্ত ঘরের পিছনে চলিয়া যায়। ফেরে কচি কচি তিনটি শশা লইয়া। মাচায়

এই তিনটিই অবশিষ্ট ছিল। অনাহারে অনেক কষ্ট গিয়াছে কিন্তু নাড়ু, শশা ভালবাসে বলিয়া কান্ত উহা আর খায় নাই। যত্ন করিয়া বাদুর, বাঁদরের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

নারায়ণ একটা শশা ভাঙ্গিয়া চিবাইতে আরম্ভ করিলে কান্ত বলিল, বেশ ভাল, না?

হ মা। তুই-ও একটা খা। শশা ত' তুইও ভালবাসিস।

পুত্রের অনুরোধে কান্ত একটু খানি শশা লইয়া ধীরে ধীরে চিবাইতে লাগিল, যাতে শব্দ না হয়। খাওয়ায় বরাবরই তার লজ্জা। এমন কি ছেলের সামনেও:

নারায়ণ বলিল, আর না মা। ফরসা হইয়া আইল।

সে চলিয়া গেলে কান্ত একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া চোখ জ্বালা করিয়া ওঠে। মনে হয় তাকে ও তার পুত্রকে লইয়া জগৎটা যেন জ্যোছনার পঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছে

পরের দিন দুপুরে হাস্ত আসিয়া কান্তকে বলিয়া গেল, কি ছাওয়ালই পেটে ধরছ মা। যেন সোনার টুকরা। কথাটা বলিয়াই তার কেমন লজ্জা করিতে থাকে।

কান্ত হাসিয়া বলে, কেন, করছে কি সে?

এই ভোর সকালে আমারে দশটা টাকা দিয়া গেল। বলল, এই দিয়া দাদার অসুধ পথ্য দিও। টাকাডা পাইয়া খুব আসান হইল।

কান্ত তার দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া বলিল, তোমরাও ত পর নও। এক বংশ, সর্দারের ঝাড়। ভাসুরপো আছে কেমন? কয়দিন খবর নিতে পারি নাই। ভয়ে বাইর হই না।

হাস্ত বলে, হাত পা ফোলছে। কিছু মনে থাকে না, সগল সময় মনিষ্যি চেনতে পারে না।

ক্ষান্ত একদিন জগু সর্দারকে দেখিতে আসিল। সর্দার প্রথম তাকে চিনিতেই পারে না। খানিকক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া অর্ধস্পষ্টস্বরে প্রশ্ন করে, নতুন খুড়ী না? হাস্ত বলে, হ।

জগু দুইহাত তুলিয়া নমস্কার জানায়। বয়সে কিছু ছোট হইলেও সম্পর্কে ক্ষান্তই বড়। সে আশীর্বাদ করে, মহা পিরভুর দয়ায় তুমিসারিয়া ওঠবা ভাসুরপো।

জগু একটু হাসে।

সাত

কুরপালার লোকের বিশ্বাস রামেন্দ্র রায়কে প্রহারের অভিযোগে যারা জেল-হাজতে পচিতেছে তারা সকলেই নিরপরাধ। আলিমেহের, ভজহরি ও নসীরামের মতন লোকেরা দল বাঁধিয়া গ্রামের জমিদারকে হত্যা করিতে যাইবে এ কথা একান্তই অবিশ্বাস্য। তবুও তারা যে দুর্ভোগ ভুগিতেছে তার প্রধান কারণ বঙ্কিম কুণ্ডুর টাকা আর নিজেদের ভাগ্য।

প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ ইন্দুপ্রকাশ ও আসামীদের নির্দোষ মনে করেন। দারোগা প্রথম যেদিন তাদের চালান দেন সেই দিনই ইন্দুপ্রকাশ বলেন, এরা কি সত্যিকার দোষী বলে আপনার মনে হয়?

দারোগা চোখ কপালে তুলিয়া বলেন, টু এণ্ড টু যে ফোর এ কথা আপনি মানেন ত'?

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, তা মানি বই কি।

দারোগা বলেন, না মেনে উপায় কি? That's mathematical truth. এরা যে অপরাধী সেটাও ঐ রকমই সত্য বলে আমি মনে করি।

এতদিন কুরপালার আক্রোশ ছিল রামেন্দ্র ও বঙ্কিমের উপর। রামেন্দ্র এক সময় সারা কুরপালাকে জ্বালাইয়াছে, এখন লোকে দুর্ভোগ ভুগিতেছে বঙ্কিমের জন্য।

যদুবরের জবানবন্দির পর সমস্ত গ্রাম তার উপর খেপিয়া গেল। লোকটা কী মিথ্যাবাদী! শুধু শুধু এতগুলি মানুষকে ধরাইয়া দিল। কেহ কেহ বলে, হারামজাদা যে এরকম করবে সে ত জানা কথা। শয়তানের বেহদ্দ অথচ ভান করে যেন ভাল মানুষটি।

কিন্তু সে জেলের পাঁচিলের আড়ালে, তার বড় ছেলে নগেন থাকে কলিকাতায়। তাদের পাওয়া যায় না। লোকে তাই তার ছোট ছেলে গজেনের উপর ঝাল ঝাড়ে। পাঠশালায় তার সামনেই একে অপরকে প্রশ্ন করে, রাবণের ছোট ভাইর নাম কি রে?

একজন জবাব দেয়, বিভীষণ।

প্রশ্ন হয়—বিভীষণের বেটা যেন কে?

একদিন আলি মেহেরের মেজো ছেলে হারুণ মেহের হাটের মধ্যে তার কান মলিয়া দিয়া বলিল, এটা পাওনা ছিল তোর বাবার। সে নাই, তাই তোরেই শোধ করিয়া দিলাম।

বালক গজেন মার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তার মা তিনকড়ি বলিল, তোরা হৈলি বোকার ঝাড়। ঐ বাপেরই ত ছাওয়াল। তোরা মার খাবি না ত খাবে কেডা? আসুক দেখি আমার কাছে, বাপের নাম ভুলাইয়া দেব না?

কথাটা সত্য। তার গালাগালির চোটে এমনিই কেহ এইদিকে ঘেঁষে না। এই ব্যাপারের পর তিনকড়ি আর তার ছেলের যেন নির্জন বাসের অবস্থা হয়। কিন্তু তিনকড়ির ভ্রূক্ষেপ নাই।

বেলা আন্দাজ নটা। আকাশভরা সোনালী রোদ। কী উজ্জ্বল তার রূপ। সূর্য্যের অফুরন্ত প্রাণশক্তি ধরিত্রীর গায়ে লুটাপুটি খায়। চির কিশোর প্রণয়ী যেন প্রণয়িণীর গায়ের উপর গড়াইয়া পড়ে। রাণীর খালে, জলজ ঘাসের ডগায় ডগায়, রূপমতীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবিরশ্মির কী অপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য।

বিলান জমি কাশের ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে, প্রকৃতির শুভ্রস্নেহ ঢেউ খেলিতেছে ঐ মাঠের উপর। কে বলিবে যে এই জমির পিছনে কুরপালার পুঞ্জীভূত দুঃখ দুর্দশা লুকাইয়া আছে?

পশ্চিমের জলাভূমিতে জীবনের স্পন্দন আরও বেশী। নানা বয়সের ত্রিশ চল্লিশজন মানুষ হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া, মাথায় গামছা বাঁধিয়া জল কাদার মধ্যে ছুটাছুটি করে। কোথায়ও হাঁটু সমান জল, কোথায়ও কোমর পর্য্যন্ত। প্রত্যেকের হাতে বাঁশের তৈরী মাছ ধরার পলো। বাঁ হাতে বাহুমূলে একটা করিয়া বেতের খালই ঝুলান।

কুরপালার লোকেরা মাছ কেনে না, কিনিতে পারে না, ধরিয়া খায়। রাণীর খাল পার দিয়া যাও, দেখিবে গাছের আড়ালে ঝোপে ঝাড়ে এক একটি লোক বঁড়শি পাতিয়া বসিয়া আছে। কারও সঙ্গে তারা কথা বলে না, একটা কাসি পর্য্যন্ত দেয় না। নিরালায় শিকারের সাধনা করে।

ভাঁটার সময় দলে দলে জাল লইয়া বাহির হয়। পারের ধারে কাদায় দাঁড়াইয়া, কেহ বা মাঝ নদীতে নৌকায় করিয়া জাল বায়।

আজ তারাই দল বাঁধিয়া পলো বাহিতে আসিয়াছে, জলের তলায় কিছু নড়িতে দেখিলেই পলো চাপা দেয়। পলোর উপর হইতে গর্তের মধ্যে হাত গলাইয়া মাছ কাঁকড়া যাহা পায় টানিয়া তোলে। কখনও মাছের বদলে ব্যাঙ ওঠে, কখনও ঢোঁড়াসাপ।

এই শিকারের লাভ শুধু মাছ আর কাঁকড়ায় নয়; তার চেয়ে বেশী লাভ আনন্দে, পরস্পরের সাহচর্য্যে। এখানে হিন্দু মুসলমানে, যুবা বৃদ্ধে, চাষী জোলায় আনন্দ ভাগ করিয়া নেয়, যেমন নেয় যাত্রা, কথকতার আসরে, কীর্তন ও মহরমের মিছিলে, বাইচখেলায়। মাঝে মাঝে এই শিকারীর দল একবার চীৎকার করিয়া ওঠে, মনে হয় যেন পরশ-পাথর পাইল।

কেহ কোঁচড় হইতে তেল মাখা মুড়ি লঙ্কা তুলিয়া খায়, কেহ শশার কুচি চিবায়। একে অপরকে নারিকেল ও পাটালির টুকরা ছুঁড়িয়া দিয়া বলে, নে ধর্।

জল এক একবার কাদা হইয়া যায়, মাছ পালায় পাঁকের মধ্যে।

অন্য সময় অদূরে রূপমতী ও রাণীর খালের মোহনার ধারে বকের মেলা বসে। আজ তাদের দেখা নাই। খুব সাহসী দুই একটা হয় ত' উড়িয়া আসিয়া বসে, জলের মধ্য হইতে একটা মাছ তুলিয়া আবার পলাইয়া যায়। ঐ বকের মতন সাদা সাদা পাল মেলিয়া রূপমতীর গাং দিয়া কত নৌকা চলে।

ভজহরির ছেলে রাখহরির পলোয় কি যেন একটা পড়িল। পাশেই ছিল আদমের ভাই কদম। রাখহরি তাকে বলিল, একটু জোরে চাপিয়া ধর ত' ভাই।

দুই বন্ধুতে টানাটানি করিয়া তোলে বড় শোল মাছ। চারদিকে হৈ হৈ পড়িয়া যায়। কদম বলে, খাসা সালুন হবে।

মধুর মামা অনন্ত বলিল, মূলা দিয়া রাঁধলে মাংসও এর ধারে লাগে না।

মূলার সময় এখন নয় বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করে। রাখহরি বলে, খাওয়ার আনন্দ আর কোথায়? বাবা রইল ফাটকে।

অনন্ত বলিল, ভজ যেমন ভাল-অভাল খাইতে জানত, তেমন পারত খাওয়াইতে। আমারে না দিয়া কিছু খাইত না।

রাখহরি পিতৃবন্ধুকে বলিল, আমিও পাঠাইয়া দেব, নন্ত খুড়া।

অনন্ত বলে, সে আসুক। তখন একত্র আহ্লাদ করিয়া খাব।

যারা হাজতে আছে ওঠে তাদের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই সব বেসুরো হইয়া যায়। এই কয়টি মানুষ যেন গ্রামের মর্মস্থল দখল করিয়াছিল। সমাজের তারা নেতা, মাতব্বর। ভাল গৃহস্থ, ভাল রোজগেরে। এই লোকগুলি হাজতে না থাকিলে কুরপালার এবার সুদিনই বলা চলিত। ধান মন্দ হয় নাই, পূজার আগে পাট বেচিয়া কেহ কেহ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছে, কলেরা কিংবা গরুর মড়কও লাগে নাই। এই সময় কিনা জমিদার ও ব্যবসায়ী মিলিয়া কুরপালার চাষীর সুখে বাদ সাধিল।

অনন্ত বলে, কারও সাধ্য নাই যে মানুষরে কেলেশ দেয়। লোকে কেলেশ পায় কর্মের ফলে।

আদম বলে, কুণ্ডুর পোই বা এমন ভাল কর্মডা কি করছে? তার ত' পোয়াবারো। ধরে ক্যাদা মাটি, হয় সোনার তাল।

রাখহরি বলিল, নিশ্চয়ই গেল-জন্মে ও বাওন গরুর অনেক সেবা করছে।

কদম বলে, তোমার বাজানও ত' গরু-বাওনের হেকমত কম করে নাই।

কোরফান বলিল, আচ্ছা, আমাগো নাড়ু ভাইর খবর কি? সে নাকি এর মধ্যে একদিন আইছিল।

বামাচরণ বলে, শুনছি ত সেই রকমই। সে যেদিন আইছিল তার পর আর চোবে শালা বাইরে শোয় নাই।

সকলেই সাগ্রহে বামাচরণের দিকে চায়। দুতিনজন সমস্বরে প্রশ্ন করে, বেত্তান্তটা কি কও দেখি।

বামাচরণের বলে, শুনছি ধীরেনবাবুর নিকট। তানারগো বাড়ী ত' চোবের বাসার পাশে। একদিন শেষ রাত্তিরে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুনিয়া তানারগো ঘুম ভাঙ্গল। একেবারে পেল্লয় কাণ্ড। যারে কয় কুরুক্ষে... চোবে যত চেঁচায় 'চৌদ আনা হাম্ নেই দেগা', আর একটা লোক ত... বলে, তুই দিবি না, দেবে তোর বাবা। কণ্ঠডা নারায়... মতন।

পরের দিন চোবের মুখের উপর কতগুলি ক্ষত দেইখ্যা সগ... শুধাইছিল, ব্যাপার কি?

সর্ব্বদমন কইল, একঠো ব্রহ্মদত্যিকা সাথ লড়াই ভৈলো।

লড়াইটা যে বাঙ্গালী এক তরুণের সাথে একথাটা সে স্বীকার করিতে চায় না। লজ্জা বোধ করে।

সর্ব্বদমন বরাবরই বাহিরে ফাঁকায় শোয়। দুই একজন তাকে বলিয়াছে, বাইরে শুয়ো না, চোবে। তোমার ত শত্তুর অনেক।

চোবে বলিয়াছে, দুশমন। বাঙ্গাল দেশমে হামার দুশমন আইবে কাঁহাসে? হামি ভোজপুরী আছি। বলিয়াই সে হাতের গুলি ফুলায়— আর মৃদু মৃদু হাসে।

আজ সর্ব্বদমনের সংবাদে তাই সকলেই খুশি হয়।

কোরফান বলে, নাড়ু ভাইর মা সেদিন স্বাশ ছাড়িয়া গেছে।

আমারে কইছে চালাখান আর গাছ-গাছালি ছাখতে। নাড়ুর কথা কিন্তু তিনি কিছু কয় নাই।

যদুবরের ছেলে গজেন বাড়ীর দক্ষিণে ঢালু জায়গায় দাঁড়াইয়া পলো বাওয়া দেখিতেছিল। মাছ খায় না তারা বহুদিন। হাটে যাওয়া বন্ধ। যারা বাড়ী বাড়ী মাছ কেরি করে তারাও কুরপালায় আসে না। খানিকক্ষণ দেখিয়া গজেন শেষটায় মায়ের অজ্ঞাতে চুপিসারে মাঠে নামিয়া যায়।

মানুষের অবজ্ঞা এই ছেলেটির গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ দেখিল তার এক নূতন রূপ। কেহ উপহাস করে না, তাকে দেখিয়া রাবণের ছোট ভাইর নাম জানিতে চায় না। সবাই পলো বায়, মাছ ধরে। করে হৈ হুল্লোড়। কিন্তু যেই গজেন কাছে যাইয়া পড়ে অমনি তারা সরিয়া যায়, কথা বন্ধ করে। গজেন অগ্রাহ্যের ভাব দেখায়। মাথা নীচু করিয়া যেন জলের মধ্যে মাছ খোঁজে। কিন্তু মন তার বসে না। পলোটাও ভারী বোধ হয়।

একটা ছোট নালা রাণীর খাল হইতে বাহির হইয়া বিলের মধ্য দিয়া যদু নাপিতের বাড়ীর পশ্চিম উত্তর ঘুরিয়া মাঠের মধ্যে শেষ হইয়াছে। লোকে বলে, সোতা খাল। সোতার উত্তরে ভজহরির বাড়ী। সোতায় যদুবর ও ভজহরির বাড়ী পর্য্যন্ত বছরে পাঁচ ছয় মাস নৌকা চলে।

মৎস্য শিকারীর দল সোতাখালে পলো বাহিতে বাহিতে রাণীর খালের মুখ পর্য্যন্ত যায়। গজেনের মনে হয় তাকে এড়াইবার জন্যই তারা ঐখানে গিয়াছে।

রাণীর খালের ধারে এরফানের পলোয় বড় একটা মাছ পড়ে। গজেন সেইদিকে চাহিলে এরফান মাছটা লুকাইয়া ফেলে। ওঠে হাসির রোল।

এবার আর গজেনের সহ্য হয় না। তার পায়ে নখের নীচে একবার ছুঁচ বিঁধিয়াছিল। আজকার বেদনাটা সেই ছুঁচ ফোটার বেদনারই

মতন তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তার বুক ফাটিয়া কান্না পায়। ভাবে, মা নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন এখানে আসিল? এখন যে ফেরাও মুশকিল।

তিনকড়ি গরুর দড়ি ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গরুটা দুষ্টু। যাকে-দেখে তাকেই গুঁতাইতে যায়। যদু বলে, অর আর কালী গাইটার স্বভাবের মিল খুব। তাই তিনু গরুটার এত যত্ন করে।

গরুটা যত দুষ্টামি করে তিনকড়ি ততই খেপিয়া যায়। এই সময় গজেন ফিরিয়া আসিলে তিনকড়ি বলে, কাঁদিস্ কেন রে? কেউ মারছে বুঝি?

গজেন নিরুত্তর।

কইতে পার না হারামজাদা।

মায়ের কথার উত্তরে গজেন হেঁচকি দিতে শুরু করে।

হাবার বেটা হাবা, পরের মার খাইতে পার আর মায়ের কথার জবাব দিতে পার না?—বলিয়াই তিনকড়ি গরুর দড়ি দিয়া ছেলের পিঠে সপাং করিয়া এক ঘা মারে।

সঙ্গে সঙ্গে পিঠে কালশিটে পড়িয়া যায়। ওরে বাবা—বলিয়া গজেন লাফাইয়া ওঠে।

তিনকড়ি আবার মারে। গজেন সোজা খালের দিকে ছুটিয়া যায়। এবার তিনকড়ির রাগ যাইয়া পড়ে কালী-গাইর উপর। মূক প্রাণীটাকে মারিয়া মারিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষটায় ছাড়িয়া দেয়।

তার পর নিজে নিজে বলিতে থাকে, বিশ জোয়ানে মিলিয়া আমার

দুধের বাছারে মারছে। ভাল হবে না অরগো। মা শীতলা, মা কালী তুমি দেইখ্যো।

অভিশাপ দিতে দিতে মাঠ হইতে বাড়ীতে উঠিবার ঢালু জায়গায় গাছের ডাল পুঁতিতে আরম্ভ করে। কাফুলা গাছের এক একটি ডাল মাটিতে রাখিয়া তার উপর মুগুর ঠোকে আর বলে, এইটা কদমার মাথায়, এইটা এরফানের কপালে—আর এইটা ঐ বাড়ীর অজর ছাওয়াল রাউথার বুকে। কেমন লাগে, এঁ্যা?

ভাসুরের নাম নিতে নাই তাই প্রতিবেশী ভজহরিকে সে বলে, অজ। মেজাজ ভাল থাকিলে, অজু ভাসুর।

যদু নাপিতের উঠানের উপর দিয়াই মাঠ ও বিলে যাওয়ার পথ এরফান রাখহরি অনন্ত প্রভৃতি অনেকেরই এছাড়া আর পথ নাই।

দুপুর রোদে ক্লান্ত হইয়া যদুর বাড়ীর নীচে আসিয়া তারা দেখে রাস্তা বন্ধ। প্রথমে গজেনের নাম ধরিয়া ডাকে, ও গজেন, গোজো, গজা।

তার সাড়া না পাইয়া শেষটায় ডাকে তার মাকে, যার সঙ্গে যার সম্পর্ক, কেহ বোঠান, কেহ খুড়ীমা।

উত্তর না পাইয়া তারা বিরক্ত হয়। অনন্ত বলে, আইস বেড়াটারে টানিয়া ফেলাইয়া দি।

সে একটা ডাল ধরিয়া টানাটানি শুরু করিতেই গজেনের মা আসিয়া বেড়ার পাশে দাঁড়ায়। দু'তিনজন সমস্বরে বলে, আমারগো পথ বন্ধ করলা কেন, নাগিনের মা?

তিনকড়ি উত্তর করে, পথ কি তোরগো বাপের কেনা? আমার বাড়ীর উপর দিয়া আমি কাউরে যাইতে দেব না।

তিনকড়ি সম্পর্কে উমেশের মাসী। এদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও

খুব। সে বলিল, তুমি পাগল হৈছ রাঙ্গা মাসী। পথ আটকাইয়া আবার গালমন্দ শুরু করছ?

তিনকড়ি বলে, লজ্জা করে না, অতগুলা জোয়ানে মিলিয়া আমার দুধের বাছারে মারছ?

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চায়। উমেশ বলে, তুমি স্বপ্নে কথা কও নাকি মাসী? আমরা মারছি এ কথা কইলো কেডা?

আর কেডা, যারে মারছ সেই কইছে।

বেশ গজা ত' পেছনেই আছে। ও আমারগো সামনে কউক।

চেঁচামেচি শুনিয়া গজেন আসিয়া মায়ের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। তিনকড়ি মুখ ফিরাইয়া তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে, কিরে, চুপ ক'রয়া রইলি যে? বল্ না।

গজেন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মারে নাই তোরে অরা?

গজেন ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

তা ত' কবিই এখন, হাবার বেটা হাবা—বলিয়া তিনকড়ি র করিয়া ছেলের গালে এক চড় বসাইয়া দেয়।

এরফান বলে, শুধু শুধু তুমি কুরুক্ষেত্তর বাঁধাবা?

তর্ক ক্রমে ক্রমে গালাগালির কোঠায় পৌছিলে কোরফান একটা ডাল টানিয়া তোলে। তার দেখাদেখি সকলে মিলিয়া মিনিট দু'একের মধ্যে বেড়াটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যদু নাপিতের উঠানের উপর দিয়া চলিয়া যায়।

এতগুলি লোকের দৃঢ় সঙ্কল্পের সামনে তিনকড়ি কেমন যেন থতমত খাইয়া গেল। তারা চলিয়া গেলে সে প্রাণের সুখে গালাগালি শুরু করিয়া দিল। গজেন ততক্ষণে মায়ের ভয়ে বাড়ীর পিছনে যাইয়া লুকাইয়াছে।

সারা দুপুর ও বিকালটা তিনকড়ি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আপন মনে কি যেন বিড় বিড় করে। নিজে খায় না, ছেলেকেও খাইতে ডাকে না। গজেন অগত্যা গাছে উঠিয়া পেয়ারা খাইতে শুরু করিয়া দেয়।

বৈকালে ভজহরির বাড়ীতে একটা কলরব ওঠে। তিনকড়ি কান খাড়া করিয়া শোনে।

খানিকক্ষণ পরে আলিমেহের, নসীরাম, অশ্বিনী প্রভৃতি কয়েকজন তার উঠানের উপর দিয়া চলিয়া যায়। তার ঘরের দিকে ফিরিয়াও চায় না। নসীরামের সঙ্গে চোখাচোখি হইলে সে মুখ ফিরাইয়া নেয়। অথচ এই নসীরাম আগে তার উঠানের উপর দিয়া যাতায়াত করিবার সময় কারণে-অকারণে তিনকড়িকে ডাকিত। আর কিছু বলিবার না থাকিলে —কি রসুই করলা বোঠান, সাদা হাঁসটা আজ ডিম পাড়ছে কয়টা? এই ধরনের প্রশ্ন করিত। সে ছিল যদুবরের বাল্যবন্ধু।

তিনকড়ি আশা করিল তার স্বামীও আজ ফিরিবে। কাছারিতে পুলিসের পক্ষে সাক্ষী দিয়াছে বলিয়া লজ্জায় একসঙ্গে ফেরে নাই।

সময় কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার বাড়ীখানাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তিনকড়ির আর তুলসী তলায় পিদিম দেওয়া হয় না। দাওয়ায় বসিয়া বিড় বিড় করে, মুখপোড়া পুলিসের বুদ্ধি দেখ। দলের লোকরে আটকাইয়া রাখল, আর ছাড় পাইল কিনা শত্তুররা। দেয় মুখে নুড়া জ্বালিয়া।

রাত অন্ততঃ একপ্রহর। পাড়াটা নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দু'একটা শিয়াল বা কুকুরের ডাক শোনা যায়, আর শোনা যায় ভজহরির বাড়ীর কথাবার্তা। অনেকদিন পরে তাকে পাইয়া বাড়ীর লোকেরা গল্প করিতেছে। হয়ত দু'একটা তরকারিও বেশী রাঁধিয়াছে। বন্ধুর মুক্তি সংবাদ পাইয়া সর্বাগ্রে আসিয়াছে অনন্ত।

গজেন দরজার পাশেই ঘুমাইয়া ছিল, আলো জ্বালিয়া তিনকড়ি তাকে ডাকিয়া তুলিল। সে ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে চাহিল।

তিনকড়ি বলিল, খাবি আয়। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নাই।

গজেন দুপুরের রান্না ভাত ও শুখনা শাক চচ্চড়ি পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাইতে লাগিল। বলিল, মা তুমিও চারডিখানি খাও।

তিনকড়ি বলিল, সেই সুখেই তোরা আমারে রাখছ। একজন সেই যে হাজত গেছে—গেছেই। ফেরার নাম নাই। আর একজন শহরে যাইয়া বউ লইয়া রং-তামাশা দেখে। তার উপর তুই আইজ আমারে অতগুলা লোকের সামনে অপমানী করলি।

গজেন কোনও উত্তর করে না। তিনকড়ি বলে, বুঝছি তখনই।

একটু পরে সে আপন মনে বলিতে থাকে, মেহের আইল, আইল অজ, নসীরাম, বাকী রইল শুধু একজন।

ভজহরির ফেরার কথা গজেন জানিত। মায়ের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া সে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

আট

কুরপালার আসামীরা জামিনে খালাস হওয়ায় সারা রাণীডাঙ্গা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এ যেন রাণীডাঙ্গার প্রতিটি লোকের ব্যক্তিগত পরাজয়। পরাজয় রাণীডাঙ্গার মর্যাদা ও ঐতিহ্যের।

কুরপালার চাষীরা আসিয়া দরজায় ধন্না দিল না। পাঁচবার বলিল না, আপনারাই আমারগো মা-বাপ, জীয়নকাঠি, মরণকাঠি আপনারগো হাতে। আমারগো বাঁচান;

এমনিই ত আগের মতন মানে না, অনেক সময় মুখে মুখে জবাব দেয়। রাণীডাঙ্গার আশঙ্কা হইল, এই মামলায় শাস্তি না হইলে কুরপালার চাষীমজুররা আর গ্রাহ্যই করিবে না। সামনে দিয়া বুক উঁচু করিয়া চলিবে। ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা অসহ্য।

শুধু জমিদার ও বাবুরা নয়, রাণীডাঙ্গার প্রায় প্রত্যেকেই শাসন ব্যবস্থার নিন্দা করিল। অভিশাপ দিল যুগধর্মের। বলিল, প্রজা-জমিদার, বামুন শুদ্দুরে আর তফাৎ থাকবে না। এ কী অরাজকতা!

একদল বিশ্বনাথের উপর রাগিল। রামেন্দ্র রায়কে যারা মারিল, জ্ঞাতি হইয়া বিশ্বনাথ তাদের খালাস করিয়া আনিলেন। একেই বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ।

সর্ব্বদমন মন্তব্য করিল, ছোট রাজা বড় বেইমান আছে।

দুঃখ করিল ধীরাজের ভাই হরকান্ত, আগে হলে এই নিয়ে দু' শরিকে মামলা বাধত। এখন আর শাঁস নেই।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হইল বঙ্কিম কুণ্ডু। লোকগুলাকে জব্দ করিবার জন্য সে জলের মতন টাকা খরচ করিল, থানা আদালতে ঘুষ দিল। তার আশা ছিল ফৌজদারিতে জেরবার হইয়া গেলে চাষীরা আর দেওয়ানী মামলা করিতে ভরসা করিবে না। জমি এখনিই ছাড়িয়া দিবে।

বঙ্কিম ভাগ্যবান পুরুষ, তার রথ বরাবর মসৃণ পথেই চলিয়া আসিয়াছে। কোনদিন বাধা পায় নাই। ব্যর্থতা এই শ্রেণীর মানুষকে পীড়া দেয়। বঙ্কিমকেও দিল। কিন্তু সে চালে ভুল করিল না। কোন উত্তেজনা দেখাইল না। শুধু রামেন্দ্রকে কহিল, ছোটবাবুর কাণ্ড দেখলেন? কুরপালার আলিমেহের ভজহরি—ওদের তিনি জামিনে খালাস করে এনেছেন।

রামেন্দ্র বলিলেন, বাঃ, বেশ সুখের কথা। শুনে খুশি হলাম।

বঙ্কিম যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, এ কী বলছেন, আপনি খুশি হলেন!

রামেন্দ্র কহিলেন, হব না? এতগুলো লোক খালাস হয়েছে।

বঙ্কিম হতাশভাবে বাহির হইয়া গেল। রামেন্দ্রের স্ত্রী জাহ্নবী বারান্দা হইতে সব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ভিতরে আসিলে রামেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, যারা খালাস হয়েছে তারা আমার প্রজা না?

জাহ্নবী বলিলেন, হ্যাঁ।

কি করেছিল তারা?

জাহ্নবী জানিতেন এই ব্যাপারে তাঁর স্বামীর স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। মোল্লার ভিটার ঘটনা লইয়া সারা দেশ তোলপাড় হইয়া গেল কিন্তু রামেন্দ্রের সে সম্পর্কে কিছু মনে নাই। আছে আগের ও পরের সবই।

স্বামীর এই স্মৃতিভ্রংশে তাঁর চোখ ছল ছল করিয়া ওঠে। তিনি আনন্দ পান। এমন একটা গ্লানিকর স্মৃতিচিহ্ন মুছিয়া যাওয়া যে আশীর্বাদ।

এই অসুস্থতার মধ্যে রামেন্দ্রের সর্ব বিষয়েই পরিবর্তন ঘটিল। দীর্ঘ আয়ত দেহ ন্যুব্জ হইয়া পড়িল। হাড়গুলি এক এক করিয়া গনা যায়। মাথায় সাদা চুল, ললাটে বলির রেখা। তাঁকে দেখিলে মনে পড়ে জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের কথা—যুগ-যুগান্তের গৌরবময় এক সাক্ষী যেন ধ্বংসের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

কিন্তু দেহের তুলনায় তাঁর মনের পরিবর্তন আরও বিস্ময়কর। দয়া দাক্ষিণ্য রামেন্দ্রের অজানা ছিল, প্রজাশাসনে তিনি ছিলেন রুদ্র কঠোর। মিথ্যার আশ্রয় লইতে কখনও দ্বিধাবোধ কারতেন না। বলিতেন, জমিদারি শাসন আর রাজ্য শাসন একই কথা। দুটোতেই মিথ্যা বলে কিছু নেই। দেখ না সরকারকে ?

কিন্তু সেই মানুষ আজ কোন মিথ্যা প্রস্তাব শুনিলে ভ্রূকুঞ্চিত করেন। তাঁর উদারতার জন্য বীরেন প্রজাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে দেয় না। প্রজারাও চেষ্টা করে বীরেনকে এড়াইয়া বড় রাজার সঙ্গে দেখা করিবার। তাতেই তাদের সুবিধা।

বীরেন ভাবে প্রজার প্রতি পিতার এই দয়া দুর্বলতারই নামান্তর। সে ইহা পছন্দ করে না।

আর অপছন্দ করে বঙ্কিম কুণ্ডু। জমিদারি তার কাছে মর্গেজ। দুদিন পরে তারই হইবে। সে চায় না যে প্রজারা নূতন কোন সুবিধা সুযোগ পায়। রামেন্দ্র আহত হওয়ার পর হইতে বীরেনকে মধ্যবর্তী রাখিয়া সেই জমিদারি শাসন করে। সেলামি নেওয়া, নতন ব্যবস্থা করা—সবই হয় তার ইঙ্গিতে।

বীরেন মায়ের নিকট প্রায়ই অভিযোগ করে। একদিন বলিল, এই ত' বাবা যজ্ঞ নাপিতের মা'কে দুটো টাকা ছেড়ে দিলেন, অথচ বুড়ী পুরো পাঁচ টাকা নিয়েই এসেছিল।

জাহ্নবী বলিলেন, যজ্ঞের অসুখ, ওষুধ পথ্যি পাচ্ছে না। ও দু'টাকা ছেড়ে উনি ভালই করেছেন।

বীরেন বলিল, দুঃখ ত দুনিয়া শুদ্ধ লোকের। তা মেটাতে গেলে আমার চলবে কেন?

জাহ্নবী বলিলেন, দয়া করে লোকের কখনও ক্ষতি হয় নি, বাবা। ওতে ভালই হয়।

বীরেন বিদ্রূপের হাসি হাসে। পুত্রের এই হাসি জাহ্নবীকে পীড়া দেয়, আগে যেমন দিত তাঁর স্বামীর কঠোর ব্যবহার।

সে কথা বলিতেও বীরেন ছাড়ে না। বলে, বাবা উদার হয়েছেন আমার ওপর সংসার চাপিয়ে। কই, আগে ত কাউকে কানাকড়ি ছেড়েছেন বলে শুনিনি।

জাহ্নবী কখনও চুপ করিয়া থাকেন। কখনও বলেন, তুই-ই না হয় মানুষের একটু আশীর্বাদ কুড়ুলি।

তিনি জানেন এই পরিবারে আশীর্বাদের প্রয়োজন কতখানি। দরিদ্রের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বাষ্প রায়েদের ভাগ্যগগন ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহা দূর করিতে হইলে চাই মানুষের শুভেচ্ছা, তার আশীর্বাদ। পুত্রের জন্ত তাঁর স্বামী সেই আশিষ কুড়াইতেছেন, ইহাতেই জাহ্নবীর আনন্দ।

আর রামেন্দ্র?

সামনেটা তাঁর একেবারে ফাঁকা। না আছে আলো, না আছে আশা। একটু দূরে কালো একটা যবনিকা। তারপর—পঞ্চেন্দ্রিয় ত' দূরের কথা, মনও আর অগ্রসর হয় না। এই ত ভবিষ্যৎ!

পিছনের দিকে চাহিলে চোখের উপর জল্ জল্ করে কুরপালার অগ্নিকাণ্ড, নারায়ণের মা ক্ষান্তর করুণ চাহনি। কানে আসে বেত্রাহত প্রজার আর্তনাদ।

কুরপালার প্রজারা একবার কিষাণ বন্ধ করে, তারপর করে খাজনা বন্ধ। রামেন্দ্র তখন যুবক, আয় লাখো টাকার উপর। বন্দুকধারী দারওয়ান লইয়া তিনি নিজে যাইয়া কুরপালার ঘরে ঘরে আগুন লাগান। সর্ব্বদমন প্রভুর হাতে মশাল আগাইয়া দেয়।

প্রজারা ভয়ত্রস্ত বন-হরিণের মতন ছুটাছুটি করিতে থাকে। তার উপর চলে লাঠি। ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকির সঙ্গে ওঠে গগনভেদী হাহাকার। আকাশ যেন চিরিয়া যায়।

এবার ধমনির্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রজারা আসিয়া ছেলেমেয়ে লইয়া তাঁর পায়ে লুটাইয়া পড়ে। বলে, রক্ষা কর, তুমি আমারগো মা-বাপ।

রামেন্দ্র রেহাই দেওয়ার পরও সর্ব্বদমনের গুণ্ডামি চলিতে থাকে। শেষটায় তিনি নিজে সর্ব্বদমনের মাথার উপর বন্দুক ধরিয়া বলেন, থাম চোবে, নইলে মাথাটা উড়িয়ে দেব।

তখন শাসন-যন্ত্রের রূপ ছিল অন্যরকম, আদর্শ ছিল ভিন্ন। ম্যাজিষ্ট্রেটরা রামেন্দ্রের বাড়ী প্রায়ই খানা খাইতেন, শাল দোশালা উপহার পাইতেন। তাদের মেয়েরা পাইতেন হীরা জহরত।

থানার অফিসাররা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিলেন না। লোকে বলিত, থানার দারোগা ত' জমিদারের নায়েবের সামিল। গভর্ণমেন্টের মতন রায় বাড়ীরও ওরা মাইনে পায়। রায় বাড়ীরই পায় বেশী।

এত্তেলা না দিয়া দারোগারা দেবেন রায়ের সঙ্গে দেখাও করিতে পারিত না।

রামেন্দ্র বসিয়া বসিয়া ভাবেন সেই অতীত যুগের কথা। মনে পড়ে কান্তকে। ছিপছিপে গড়ন, লতার মত ছিল তার দেহের লীলায়ীত ভঙ্গী। চোখ দুটিতে কি যেন যাদু ছিল। প্যারীর জীবদ্দশায়ই কান্তের উপর রামেন্দ্রের নজর পড়ে।

কান্ত বিধবা হইলে তিনি অনেক প্রলোভন দেখান। খাজনা লাগিবে না, জমি দিবেন, নূতন ঘর করিয়া দিবেন, পাকা ভিতের উপর রঙিন টালির চালা। উপরন্তু মাস মাস টাকাও পাইবে।

কুটনীরা যাতায়াত করে, বলে, এ সুযোগ হেলায় হারাইস না, কুরপালার তুই রাণী হইয়া থাকবি।

কান্ত হাসিয়া বলে, মেথঁরানি!

অর্থের শক্তি ও নারী চরিত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রের ধারণা ছিল অন্যরকম। তাঁরও জিদ চাপিয়া গেল। সর্ব্বদমনকে বলিলেন, কুছপরোয়া নেই, চোবে। যত টাকা লাগে সর্দারণীকে আমার চাই-ই।

এই সুযোগে সর্ব্বদমন কিছু রোজগার করিয়া লয়।

কান্ত কিছুতেই টলে না।

এবার আসে পাইক বরকন্দাজ, দিনে চলে খাজনার তাগাদা, কিষাণের জন্য ধমক। গোমস্তার গালাগালি। রাত্রে বেড়ার উপর শব্দ হয়। ঘরের আনাচে কানাচে লোক ঘুরিয়া বেড়ায়।

কান্ত শেষটায় গ্রাম ছাড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যায়। ফেরে কয়েক বৎসর পরে।

টুকরা টুকরা এইসব কাহিনী লইয়াই রামেন্দ্রের জীবন। ছায়ার মতন এদের স্মৃতি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে।

জাহ্নবী ইহা বোঝেন, তিনি সহানুভূতি দেখান। পরস্পরের এই অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁদের সম্পর্কও বেশ মধুর হইয়াছে, তবে

বড় দেরিতে, জীবনের শেষপ্রান্তে। ভাবিয়া মল্লিকার মধ্যে মধ্যে ক্ষোভ হয়।

এক একবার রামেন্দ্র প্রশ্ন করেন, আমি শুয়ে আছি কেন? কি হয়েছিল আমার?

জাহ্নবী বলেন, অসুখ।

কি অসুখ? মাঝে মাঝে মাথা ব্যথা করে। ঘাড়ের শিরাগুলি টন-টন করে ওঠে।

জাহ্নবী উত্তর খুঁজিয়া পান না। নিজেও তিনি ভুলিতে চান যে বিনি গয়লানীর বাড়ী হইতে ফেরার পথে তাঁর স্বামীর এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ফৌজদারী মামলার প্রধান সাক্ষী রামেন্দ্র। একমাত্র সাক্ষী বলিলেও চলে। তাঁর অসুস্থতার জন্য বার বার তারিখ পড়িতেছিল। বঙ্কিমের ভরসা ছিল রামেন্দ্রকে দিয়া সে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইতে পারিবে। পুলিসকেও সেইরূপই আশা দিয়াছিল। কিন্তু তাঁর পরিবর্তন দেখিয়া সে ভয় পাইয়া গেল।

রামেন্দ্রের জবানবন্দির উপর দারোগা যে কাহিনী খাড়া করিয়াছে তার অনেকখানিই মনগড়া। বঙ্কিম তাহা জানিত। সে দেখিল, রামেন্দ্র সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইলে সেই কাহিনী ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

তাই পুলিসও পেশকারকে ঘুষ দিয়া, বহুব্যয়ে সরকারী ডাক্তারের সার্টিফিকেট আদায় করিয়া আদালতে দরখাস্ত করাইল, আঘাতের ফলে রামেন্দ্র উন্মাদ হইয়াছেন। তাঁর জবানবন্দির সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রই সব কথা শুনিয়াছেন। অতএব হুজুরে আরজি এই যে তাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হউক। তাহা হইলে মামলার বিচারে সুবিধা হইবে।

বঙ্কিম বীরেনের সম্মতি লইয়াই পুলিসকে দিয়া এই দরখাস্ত করাইয়াছিল। গ্রামের লোকে বলাবলি করিল, রামেন রায়ের ছেলে শেষে বঙ্কিমের সঙ্গে যোগসাজসে বাপকে পাগল বানাতে চায়!

খবরটা জানিল সবাই—কুরপালা রাণীডাঙ্গা ভুবনডাঙ্গা আশেপাশে দশ, বিশ গ্রামের লোক। জানিলেন না শুধু একমাত্র জাহ্নবী।

নয়

সংসারে হাস্ত একা। সাহায্য করিবার দ্বিতীয় প্রাণীটি নাই। স্বামীর বংশে নিকট একটি জ্ঞাতি পর্য্যন্ত নয়। আর বাপের বাড়ীর দিক ত' একেবারেই পরিষ্কার।

একমাত্র পদ্ম বোষ্টম খোঁজ খবর করে, দু'টা মিষ্টি কথা কয়। হাস্তর মন যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন বলে, ভয় কি ভাই? সংসার ত লড়াই করবারই জায়গা।

হাস্ত বলে, তুমি বোষ্টম মানুষ। বৈরাগীরে লইয়া সুখে আছ। লড়াইর জান কি?

পদ্ম হাসে।

সে প্রায়ই জগুকে গান শুনাইয়া যাইত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান। এই গান জগুর বড় পছন্দ, শুনিতে শুনিতে এক একবার সে হাস্তর দিকে চায়। বৈষ্ণবী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে।

জগুর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়, গানের কলি ধরিতে পারে না, মানুষ চেনে না। পদ্মকে দেখিয়া হয় ত বলে, কেডা ও ?

সেদিন জগুর অবস্থা একটু ভাল। বাহিরে বৈকালী সূর্যের আলো দেখিয়া সে যুক্ত করে সেই আলোর উদ্দেশে প্রণাম করিল। হাস্তকে বলিল, ঝাঁপ খুলিয়া দেও, আকাশটা একবার দেখি।

ঝাঁপ খুলিলে দেখা যায় বাহিরে একটা অদ্ভুত রং। আকাশের গায়ে পাতলা পাতলা মেঘের উপর, গাছের পাতায় পাতায় হলুদের ছড়াছড়ি। এই অবেলায় প্রকৃতির যেন গায়ে-হলুদ হইয়াছে।

এই সময় পদ্ম আসে। জগু খুব নীচু গলায় বলে, একটা গান শোনাও।

পদ্ম গান ধরে,

বাঁশী হাতে মোহন সাজে—
এস নন্দ-দুলাল।

জগু ধীরে ধীরে হাতে তালি দেয়, তার ঠোঁট একটু একটু নড়ে। চোখ জলে ভরিয়া যায়। সেও ধরে, বাঁশী হাতে মোহন সাজে—

তার আজকের অবস্থা দেখিয়া হাস্তের আনন্দ হয়। হয় ত একটু আশাও পোষণ করে।

ঠিক সন্ধ্যার সময় পদ্ম হাস্তর হাতে একটু মিছরি দিয়া চলিয়া গেল। বলিল, তোমারগো বোষ্টমের জ্বর। ছোট রায় বাড়ীর গিন্নী এই মিছরিটুকু দিছে, তার বার্লি খাওয়ার জন্ম।

হাস্ত জিজ্ঞাসা করে, কবে জ্বর হইছে ?

পরশু রাত্তিরে।

তার জন্য একটু মিছরি আছে ত?

সে ভুল হয় না বোন, বলিয়া পদ্ম হাসে।

হাস্ত স্বামীর জন্য দুধ জ্বাল দিতে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে বুকের উপর হাত দু'খানি রাখিয়া সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। হয়ত ঘুমাইতেছে, হয়ত বা নন্দ-দুলালের কথা ভাবিতেছে মনে করিয়া হাস্ত তাকে ডাকে না। দুধের বাটি ও মিছরিটুকু তার মাথার কাছে রাখিয়া সন্ধ্যাদীপ জ্বালে, ঘরে ধুনা দেয়, লক্ষ্মীর আসনে দেয় কয়টি তাজা সন্ধ্যামণি ফুল।

ঠাকুরপ্রণাম সারিয়া স্বামীর মাথায় আসনের ফুল দিতে যাইয়া হাস্তের চোখ পড়ে তার বুকের উপর। বুক একটু কাঁপে না, উঁচু-নীচু হয় না।

ধুকধুকানি শুনিবার জন্য হাস্ত বুকের উপর কান রাখে। শব্দ পায় না, পায় শুধু হিমস্পর্শ।

এ কী! এরই নাম মরণ?

মাসের পর মাস এই মরণের মুখোমুখি হইয়া সে বসিয়াছিল কিন্তু মৃত্যু দেখিল এই প্রথম।

মড়া মানুষ গাছের তলার ঝরা ফুলেরই মতন। ঝরা ফুলের বীজ হইতে গাছ হয়, সেই গাছে ফুল ফোটে। সেই ফুল হাসে। মানুষের কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায়। সে আর হাসে না। থাকে তার সবই। শ্বশুর আদরের বেতের মোড়া, তার দুধ খাওয়ার বাটি, জাল বোনার কাঠি সবই আছে। নাই শুধু মানুষটা।

কতই না সে ভালবাসিত, আদর করিয়া হাস্তকে মোড়ায় বসাইত। হাস্ত ভাবে, কোথায় গেল সে?

নিকটে কোন বাড়ী নাই। চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইলেও কেহ

শুনিবে না। মৃতদেহ ফেলিয়া যাওয়াও অসম্ভব। হাস্ত সারারাত মড়া ছুঁইয়া বসিয়া থাকে। বাহিরের দিকে চায় না। ভয় করে। মনে হয়, যম কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া তার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হাস্ত আঙ্গুল দিয়া প্রদীপের সলিতা বাড়ায়, একটু একটু তেল দেয়। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলে, গেলা, গেলা তুমি আমারে ফেলাইয়া?

কালরাত্রি এইভাবে কাটে।

ভোরে ভিক্ষায় বাহির হইয়া পদ্ম আসিয়া দেখে, স্বামীর বুকের উপর হাত রাখিয়া হাস্ত বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

পদ্ম ডাকে, হাস্ত।

এঁ্যা—বলিয়া হাস্ত পদ্মের দিকে চায়, তারপর চায় স্বামীর দিকে। তার চাহনিই সব জানাইয়া দেয়।

বাটির দুধটুকু বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। মিছরির টুকরার উপর কতকগুলি পিপড়া। দীপশিখা পলিতার শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া নিবিয়াছে।

খবর পাইয়া আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিবন্ধু প্রায় প্রত্যেক বাড়ী হইতেই দু'একজন আসে। আসে সর্দারদের কুলপুরোহিত ভগবান চক্রবর্তী।

গোলমাল বাধে শব সৎকার লইয়া। ভগবান বলে, তিন তিনটা পুস্করা পাইছে। পেরাচিত্তির না করিয়া ত চিতায় চড়ানো যায় না।

পুস্করা যে পায় তার পক্ষে ভাল, অমঙ্গল হয় আত্মীয়স্বজন ও শ্মশান বন্ধুদের। তার জন্য পুস্করা শান্তির বিধান আছে। সেই শান্তি শ্রাদ্ধের সময় এমন কি তার পরে করিলেও চলে। কিন্তু ভগবান পুরোহিত আশু প্রাপ্তির এই সুযোগ ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। সে বলে, এখন শান্তি না করলে যারা পোড়াইতে যাবে তারগো অকৈল্যাণ হবে।

শুশুর জ্ঞাতি বন্ধুরা ভয় পায়। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এর একটা ফয়শালা না হইলে মড়া ছুঁই ক্যামনে?

হাস্থ সবই শোনে। ত্রিপুষ্করার প্রায়শ্চিত্ত তার মতন গরিবের পক্ষে ছোটখাটো একটা দুর্গোৎসব বিশেষ। গরিবের আর পাঁচটা ব্যাপারের মতন ইহারও কোন সহজ মীমাংসা হয় না। চলে জটলা।

বেশ একটু বেলা হইলে পদ্ম বলিল, বোষ্টমরে একটু পথ্য দিয়া আসি, ভাই।

হাস্থ জিজ্ঞাসা করে, আজ সে আছে কেমন?

একই রকম।

ছোট রায় বাড়ীতে কাউরে দিয়া খবর পাঠাইতে পার? রায় গিন্নীর কাছে আমার কয়টা টাকা ছিল।

পদ্ম বলিল, খবর আমি নিজেই দিয়া যাব।

বেশী অসুখের সময় জগু বিশ্বনাথের নিকট ভিটা বন্ধক দেয়। হাস্থ তখনকার প্রয়োজনীয় খরচা বাবদ কতক টাকা আনিয়া বাকী তাঁর স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রাখে। এতদিন ঐ টাকায়ই ঔষধ পথ্যের খরচা চলিয়াছে।

পদ্মের নিকট খবর পাইয়াই বিশ্বনাথের স্ত্রী সরোজ দেবী ছেলে শঙ্করকে দিয়া টাকা পাঠাইয়া দেন। শঙ্কর আসিলে ভগবান প্রশ্ন করিল, আপনি শুনছি বিস্তার জাহাজ। আপনি ত' জানেন পুষ্করা পাচিত্তেরের খরচা কত।

শঙ্কর পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

ভগবান বলে, ওঃ, পুষ্করা কারে কয় জানেন না বুঝি? তা জানবেনই বা কি করিয়া? আপনি ফিরিঙ্গী বিস্তার জাহাজ আর এটা হৈল মুনি ঋষির শাস্তর সমুদ্দুর! এ সমুদ্দুরে ও জাহাজ অচল, হেঃ হেঃ—

শঙ্কর বলিল, আমি না জানায় কিছু আসে যায় না। আপনাদের যা রীতি সেই রকম কাজ করুন।

ভগবান খুশি হইয়া বলিল, এরেইত কয় জ্ঞানবান। শাস্ত্রে কি কইছে বিদ্যা দধিতে বিনয়ং। বিদ্যার যে বিনয় সে হইল দইর মতন শাদা। শোনেন তবে পুস্করা কারে কয়। খারাপ দিন যেমন শনি মঙ্গল, পাপ তিথি এবং পাপ নক্ষত্রে মরলে লোকে পুস্করা পায়।

শঙ্কর প্রশ্ন করে, কি হয়েছিল সর্দারের ?

বুড়া বয়সে যা হয়—উত্তর করে নসীরাম। তার বলার ভঙ্গীতে মনে হয় মৃত্যুর কারণ সে গোপন করিতেছে।

এই সময় বেড়ার ফাঁক দিয়া শঙ্করের চোখে পড়ে অচঞ্চল একটি নারী মূর্তি, ফরসা রং, সুন্দর গড়ন। চোখে অদ্ভুত প্রশান্তি। তরুণী শব ছুঁইয়া বসিয়া আছে।

শঙ্কর শুনিল এই-ই জগু সর্দারের স্ত্রী। সারারাত সে ঐ ভাবে বসিয়া আছে। একবারও ওঠে নাই। তাতে নাকি মৃতের অমঙ্গল।

শঙ্কর ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার মোট কত লাগবে ?

তিনটা পুস্করায় অন্ততঃ তিন দুগুণে ছয়খানি বস্ত্রং।

শঙ্কর বলে, গরিব বিধবা। অত কাপড় পাবে কোথায় ?

আলিমেহের জগু ও ভগবান উভয়েরই বন্ধু। জগুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সেই হইতেই এখানে উপস্থিত আছে। সে বলিল, ফর্দ আর বাড়াইও না ঠাকুর। দোস্তের কাজ। কম করিয়া ধর।

ভগবান বলিল, ও তুমি বোঝবা না মেয়াভাই। যজমান আমার। অর যাতে ভাল-অভাল হয় তা আমারই দেখতে হবে। তবে কাপড় অন্ততঃ একখানা চাই।

শঙ্কর ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া হাস্তের উদ্দেশে বলিল, খরচা বাবদ এই পঁচিশটে টাকা নাও। মা পাঠিয়ে দিলেন।

হাস্ত শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিল।

নবাব্জের এই অবস্থা শঙ্করের মনকে পীড়িত করিল। একী কুসংস্কার, কী নীচতা! দেশের কিছু খবর রাখে না বলিয়া তার লজ্জা হইল। ছেলেবেলা হইতেই সে মাতামহীর কাছে মানুষ। তার জন্মদিনের দিন সরোজ দেবীর মরণাপন্ন অসুখ হয়। সেই হইতে তার মা দৌহিত্রকে পালন করেন। তার কাছে থাকিয়া শঙ্কর খুলনায় স্কুলে পড়ে। ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম হয়। তারপর হইতে কলিকাতায় পড়িতেছে। বি, এতেও প্রথম হইয়াছে। এবার এম, এ দিবে।

কত দেশ বিদেশের খবর সে জানে, কত রাজবংশের উত্থান পতনের ইতিহাস। বিজ্ঞানের রহস্য। জানে রাজনীতি অর্থনীতি। কিন্তু চেনে না পাশের গ্রাম কুরপালাকে। নিজের রাণীডাঙ্গাকে। তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের খবর সে রাখে না।

বাড়ী ফিরিয়া সে মাকে বলিল, প্রায় আঠের ঘন্টার উপর শব পড়ে রয়েছে। কেউ ছোঁয়নি। জটলা করছে পুস্করার প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে।

সরোজ বলিলেন, তা করবে না? নইলে যে জগুর আত্মার অমঙ্গল হবে।

শঙ্কর বলিল, তার অমঙ্গল! ইহকালে যে পরের লাথি খেয়ে মরে তার আবার পরকালের ভাবনা কিসের?

তা আছে বৈ কি। ও ত নদীর দুটো পার। এপারে ভাল হল না, ওপারে ত হতে পারে।

কুরপালার জমির গোলমালের খবর শঙ্কর জানিত না। তার মা সব বলিলেন। জগুর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া রাগে শঙ্করের শরীর যেন কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, এর শাস্তি কি জান মা? ফাঁসি নয়, আরও—আরও কঠোর।

পর মুহূর্তেই তার মনে হইল, পরনির্ভর জাতির ইহাই বোধ হয় বিধিলিপি।

দশ

বিলের জমি লইয়া দেওয়ানী মামলাও চলিতেছে। খরচা বিস্তর। ঘন ঘন তারিখ পড়ে, তারিখ পিছু উকিলের ফি, যাতায়াত ও সাক্ষীর খরচা, পেয়াদা পেশকারের ঘুষ—ব্যয় নানারকম। তারিখের দু'দিন আগে কোন সাক্ষী হয়ত বলিয়া বসে, ছাতা নাই, চটি জোতা নাই, যাব কি করিয়া?

জীবনে কখনও সে চটি জুতা পায় দেয় নাই, তাকে যদি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায়, অমনি সে উত্তর করে, একজোড়া চটিও যদি না পাই ত' সদরে সাক্ষী দিতে যাব কোন্ গরজে?

একবার কাহার পাড়ার বরদা একটা খাসি চাহিল। বলিল, মা-মরা ছাওয়াল বায়না ধরছে এট্টু মাংসু খাবে। তারে খুশি না করিয়া যাই কেমনে?

ভজহরির একটা খাসি ছিল। রাখহরি সেটার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বরদার বাড়ী পৌছাইয়া দিল। তার কানে গেল বরদার দ্বিতীয় স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। সে বলিতেছে, মাংসু খাবা, তার মসলা কোথায়?

রাখহরির ভয় হয় বরদা হয়ত ঘি তেল মসলাও চাহিয়া বসিবে। এই সময় বরদাই তাকে নিশ্চিন্ত করে। স্ত্রীকে বলে, এর উপর ঘি তেল আবার চাব কেমন করিয়া? আমি ছাওয়ালডা কার তা মনে নাই?

এদিকে ধীরাজ দাস বঙ্কিম কুণ্ডুর পক্ষ হইয়া মামলা মিটাইবার জন্য ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে।

খালি পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া ছেলে কোলে করিয়া সে বাড়ী বাড়ী যায়। সকলকেই এক কথা বলে, কাছারি আদালত হল টাকার

খেল। ফলাফলের বিশ্বাস নেই। ফৌজদারিতে জেল জরিমানা দুই-ই হতে পারে। আর দেওয়ানীতে যদি বা জেতো তা হলেও শেষ পর্যন্ত তোমাদেরই হার হবে। হার মানে লোকসান। নামে না হলেও বঙ্কিম কুণ্ডু দেশের রাজা। তার সঙ্গে পেরে উঠবে কি করে? তারচেয়ে বরং মিটিয়ে ফেল।

আলিমেহের জিজ্ঞাসা করিল, আমারগো কি করতে হবে কও দেখি?

তোমরা বিলের জমি ছেড়ে দাও গিয়ে। বঙ্কিম ফৌজদারিটা তা হলে মিটিয়ে দেবে। পুলিস তার হাত ধরা, আর রায়েরাও তার কথা ফেলতে পারবে না।

আলিমেহের বলে, তা হয় না কর্তা। আমারগোও ত মান আছে।

মান ধোয়া জলে পেট ভরে না, বড়মিয়া।

মান খোয়াইয়াও পেট ভরে না দাস মশায়; শুধু শুধু মানটাই যায়। এই ধরেন—

আলিমেহের বলিতেছিল, এই ধরেন আপনার কথা। কিন্তু মা পথে থামিয়া গেল।

ধীরাজ বলিল, বেশ তোমাদের জাতের যারা মাথা তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, যেমন কুশলার দারোগা সাহেব—

আলিমেহের বাধা দিয়া বলিল, ওখানে হিঁদু মোছলমানে, বামুন শুদ্দুরে কোন ফারাক নাই। বড় মানুষেরা, জমিদার মহাজনরা হৈল এক জাত। আমরা গরিবরা আর এক। দারোগা সাইব আর কুণ্ডুরপো সেদিন একত্র হইয়া সাতলায় জমিদারি কেনছে। তিনি ত' মিটাইতে কবেই।

কিন্তু হিসেব করে দেখ শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে।

আপনারগো মতন হিসাব নিকাশের ধার আমরা ধারি না। ধারতে জানি না। আর সেই জন্তই ছোট হইয়া আছি।

ধীরাজ একে একে আকালী, আদম, ননীরাম প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই দেখা করে। সুবিধা হয় না কোথায়ও। শেষটায় একদিন ভগবান পুরোহিতকে লইয়া হাস্তের বাড়ী যায়।

অতিকষ্টে হাস্তের দিন চলে। ঋণে মাথা ডুবু ডুবু। শ্বশুর অসুখের সময় ভিটাবাড়ী বন্ধক পড়ে। তার কিছু টাকা শঙ্করের মার কাছে গচ্ছিত ছিল। শব সৎকার করিতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। জ্ঞাতি বন্ধুরা ধরিল, অমন একটা মানুষ মরছে। সর্দারগো মাথা। শ্রাদ্ধে কিছু খরচা না করলে চলবে কেন?

বেণী জিদ করিল প্রতিবেশী কানাই সর্দার।

জ্ঞাতি বন্ধুদের খুশি করিতে যাইয়া হাস্ত গাং ধারের জমি বন্ধক দিল।

ধীরাজের ভরসা ছিল এই দরিদ্র বিধবা তাকে ফিরাইয়া দিবে না। সে ভগবানকে বলিল, শুনেছি সর্দারনির ধর্মে ভারী বিশ্বাস। তুমি বজরং ঘজরং করে দুটো শাস্তর আউড়ে দিলেই কাজ ফতে।

ভগবান উত্তর করিল, ঐ জমির উপর কুণ্ডুরপোর অত ঝোঁক কেন কও দেখি?

ওর ইচ্ছে ওখানে বাপের নামে কারখানা করে। খালের একপারে কারখানা, আর একপারে কারখানার শহর।

ভাগ্যমন্ত পুরুষ বটেক। রাণীডাঙ্গারে ধন্য করছে।

ধীরাজ বলিল, বিলের এক বিঘে জমিও যদি বঙ্কিমকে কিনিয়ে দিতে পারতুম আখেরে আমার অনেক সুবিধা হত।

কিন্তু হান্তুও তাদের নিরাশ করিল। সে বলিল, ঐ জমির জন্ম একজন জান দিছে। ও আমি ছাড়ব না।

ভগবান বলিল, জগু ছিল পুণ্যবন্ত মানুষ। তুমি তার বৈকুণ্ঠের পথ আগলাইও না।

হান্তু বলে, কি কন আপনে?

চরকের নাম জান? মহামুনি। তিনি কইছেন, ঋণে স্বর্গ সিড়িং—

হান্তু বলে, মাফ করবেন। জানার দরকার নাই আমার। কিন্তু আপনার যজমানের সেই চাহনি আজও আমি ভোলতে পারি নাই। সুস্থ মানুষটা রায় বাড়ী গেল, ফেরল ধোঁকতে ধোঁকতে; তখনকার সেই চাহনি। সেই যে বিছানা নিল আর ওঠল না।

অন্য দিনের মতন আজও ধীরাজ ছেলে কোলে করিয়া বাহির হইয়াছে। ছেলেটির নাক দিয়া কফ গড়াইয়া পড়ে, কফ ও ধুলায় থুতনি ক্লেদাক্ত। হান্তু পিতার কোল হইতে তাকে নিয়া তার নাক ও মুখ ধোয়াইয়া মুছাইয়া দেয়। হাতে দেয় খানিকটা তালের পাটালি।

অতখানি খেলে ওর অসুখ করবে, খাসনে পিন্টু,—বলিয়া ধীরাজ শিশুপুত্রের হাত হইতে পাটালিখানি কাড়িয়া নেয়। ভাঙ্গিয়া বড় টুকরা নিজের মুখে ফেলিয়া দিয়া চকচক শব্দে চুষিতে থাকে।

হান্তু পুরোহিতের পায়ের ধুলা লইয়া ভিতরে চলিয়া যায়।

সেও জমি দিতে সম্মত হয় নাই শুনিয়া বঙ্কিম বলে, আচ্ছা।

কুরপালার ফৌজদারী মামলায় হাকিম আজ রায় দিবেন। কোর্টে ভিড় খুব। শহরের উকিল মোক্তারদের ধারণা আসামীরা নিরপরাধ। এদিকে গুজব এই যে তাদের শাস্তি হইবে। তাই অনেকেই রায় শুনিবার জন্ম আসিয়াছেন। বড়বাবুর ছেলে নগেন, আলিমেহেরের

ছেলে ইউসুফ মেহের, রামেন্দ্রের কর্মচারী শ্যামাচরণ প্রভৃতি রাণীডাঙ্গার কুরপালার অনেকেই আছে। আছেন বিশ্বনাথ।

রায়টা দীর্ঘ। হাকিম রায় পড়েন। আসামীরা একদৃষ্টে তাঁর দিকে চাহিয়া থাকে। বোঝে না কিছুই, শোনে কিনা তাও সন্দেহ। তাদের লক্ষ্য শুধু একটি শব্দের দিকে—'খালাস'। হাকিম কখন বলিবেন, আসামীদের খালাস দিলাম।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় যদুনাপিত করজোড়ে দাঁড়াইয়া। পাশে বন্দুকধারী পুলিশ। আসামীরা এক এক বার কটমট করিয়া তার দিকে তাকায়। কী ঘৃণা তাদের চোখে!

অন্য লোক হইলে মাথা নীচু করিয়া থাকিত কিন্তু যদু নির্বিকার। এক একবার সে আসামীদের দিকে চায় আবার চায় হাকিমের দিকে। বেশ একটা প্রসন্ন ভাব, আসামীদের চেয়ে সে যেন অনেক বড়—সে ঐ হাকিমের লোক কিনা।

আকালী বলিল, দেখছ যদুয়াটা কি বেহায়া।

এই সময় ভিড় ঠেলিয়া একটি লোক সাক্ষীর কাঠগড়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে বন্দুকধারী সান্ত্রী তাকে তাড়া করিল। লোকটি হাকিমের উদ্দেশে বলিল, হুজুর আমার একটা আরজি আছে।

সকলের চোখ পড়িল তার উপর। মাথা কামানো, বলিষ্ঠ লম্বা গড়ন, শ্যামবর্ণ এক যুবা। বুকের ছাতিটা যেন চল্লিশ ইঞ্চি চওড়া, বাহুর মাংসপেশীগুলা দড়ির মতন পাকানো। হাকিম তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, কি আরজি?

এই সময় সাগরদীঘির দারোগা পটল চৌকিদারের কানে কানে কি যেন জিজ্ঞাসা করিয়া কোর্টকে বলিলেন, এই লোকটি মামলার Proclaimed offender নারায়ণ সর্দার, হুজুর অনার।

হাকিম বলিলেন, তোমার নাম নারায়ণ ?

নারায়ণ সম্মতি সূচক মাথা নাড়িল।

ফেরার ছিলে কেন এতদিন ?—হাকিম প্রশ্ন করিলেন।

আমি ধরা পড়লে আমার বুড়া মা সেই শোকেই [illegible] পড়ত। সেইজন্ত ধরা দি নাই। তিনি সে দিন স্বর্গে চলিয়া গে[illegible]। শ্রাদ্ধ সারিয়া আমিও আসিয়া হাজির হইছি। মিছা মিছা এতগুলা লোক আমার জন্ত কেলেশ পাইতেছে।

হাকিম বলিলেন, তোমার জন্ত ক্লেশ পাচ্ছে কি রকম ?

আজ্ঞা হুজুর। রায় বাবুরে মারছি আমি একলা। অরা সগলটি নৈরপরাধ।

জান, আদালতে মিথ্যা বলার কি শাস্তি ?

মিছা কব কেন ?

কোর্ট ইন্স্পেক্টার বলিলেন, অন্য সবাইকে বাঁচাবার জন্য টাকা [illegible] ও এই রকম বলছে।

না ধর্মাবতার, সে রকম মা-বাপের ছাওয়াল আমি না। [illegible] করেন ঐ ছোট রাজারে—আজও যিনি সাগরদীঘির মাথা, বলিয়া নারায়ণ বিশ্বনাথের দিকে চাহিল।

তারপর সে ঘটনার বিস্তারিত এক বিবরণ দিল। রোজই বেশী রাত্রে রামেন্দ্র মোল্লার ভিটা দিয়া ফেরেন। তাকে মারিবার জন্য সে ভিটায় লুকাইয়া ছিল।

ঘটনার দিন রাত্রে তাঁকে দেখিয়াই ছুটিয়া গিয়া সে এক ঘা লাঠি মারে। নারায়ণের মুখ ঢাকা ছিল বলিয়া রামেন্দ্র তাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি চীৎকার করিলে সে আর এক ঘা বসাইয়া দেয়। ওরে বাবারে—বলিয়া রামেন্দ্র পড়িয়া যান। এই সময় ভজহরি,

যদুনাপিত, আকালী, আদম এরা সব ছুটিয়া আসে। তাঁর নাকে মুখে জল ছিটায়।

হাকিম প্রশ্ন করেন, রামেন্দ্রবাবু গ্রামের জমিদার। তুমি তাঁকে মারলে কেন?

উনি যখন সন্ধ্যার সময় কুরপালায় যাইতেছিলেন আমি তখন শুধাইলাম, এটা করলেন কেন, বড় রাজা? টাকা খাইলেন আমারগো আর ভুঁই দিলেন কুণ্ডুর পোরে? বাবু তখন আমারে মা-বাপ তুলিয়া গালাগালি করল। তাই প্রতিশোধ নিছি।

তুমি মারবার পর আর কে কে মারল?

কাক প্রাণীডাও না।

এল কে কে?

ভজুকাকা, যদুদাদা, আকালী আর মধু ভাগনা আর হুজুর, আদম ভাই।

আলিমেহের, যোগেশ, নসীরাম এরা ছিল না?

না।

আসামীদের উকিল কহিলেন, এদের ধরা হয়েছে ১নং আসামী যদুবরের স্বীকারোক্তির পর।

হাকিম একবার কোর্ট ইনস্পেক্টর ও সাগরদীঘির দারোগার দিকে চাহিলেন, তার পর চাহিলেন যদুনাপিতের দিকে।

যদুবর বলিয়া উঠিল, আমি দারোগা পুলিসের পায়ের তলায়ই আছি, হুজুর। ওনারা যা কওয়ান তাই কই।

কোর্টের সকলে এমন কি হাকিম পর্য্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন।

দারোগার মুখ এতটুকু হইয়া গেল।

মামলার তারিখ পড়ে। উকিল মণীন্দ্র সেন নারায়ণের জন্য

জামিনের দরখাস্ত করিলে হাকিম বলিলেন, আগে এন্‌কোয়ারি (enquiry) হ'ক।

জামিন-প্রাপ্ত আসামীরা একে একে কাঠগড়া হইতে নামিয়া যায়। যদুবরের মনে হয় ব্যাপারটা তার পক্ষে সুবিধা জনক নয়। সে বলে, ধর্মের অবতার।

হাকিম ধমক দিলেন, ষ্টপ্ (stop)।

কিছুদিন পরে নারায়ণ ভিন্ন অন্য সব আসামী বেকসুর খালাস হইলে গ্রামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই নারায়ণের সুখ্যাতি। তাকে আশীর্বাদ করে সবাই। নসীরাম কহিল, ভাল অর হবেই, অমন মার ছাওয়াল। প্যারীর বৌ ইচ্ছা করলে রাজরাণী হইতে পারত। হেলায় প্পায়ে ঠেলছে।

শুধু কুরপালা নয় রাণীডাঙ্গাও নারায়ণের প্রশংসা করে। পদ্ম বলে, শোনছ হাস্ত, বড় রাজারে মারার জন্য যারা রাইগ্যা গেছিল তারাও নাড়ুর সুখ্যাৎ করে।

কেডা?

রাণীডাঙ্গার সবাই। শঙ্করবাবুর মুখে ত প্রশংসা লাইগাই আছে।

কি কইছেন তিনি?

এইবার ঠেকাইছ আমারে। সে সগল ভারী ভারী কথা। অত কি মনে থাকে?

হাস্তের বড় আনন্দ হয়। খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও নারায়ণই শ্বশুর নিকটতম জ্ঞাতি। বিবাহের পর হাস্তের সঙ্গে সমবয়সী এই দেবরের বেশ ভাব হয়। তের চৌদ্দ বছরের এই দুইটি ছেলে মেয়ে একত্র হইয়া

বাগানে বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইত। নারায়ণ ঢিল ছুঁড়িয়া কাঁচা-মিঠা আম পাড়িত। দু'জনে মাখিয়া খাইত। হাস্ত পাকা গাব ভালবাসে বলিয়া নারায়ণ বড় বড় গাছে উঠিয়া গাব পাড়িয়া দিত।

হাস্ত প্রশ্ন করিত, ভয় করে না তোমার, নাড় ঠাকুরপো?

ভয় আমার নাই হাস্ত বউ। দেখ না বড়গো লগে কেমন কাজিয়া করি।

তার মায়ের দেখাদেখি নারায়ণ তখন ডাকিত, হাস্ত বৌ। এখন বলে, হাস্ত বৌঠান।

একদিন দুপুর রোদে মাচার তলার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া তারা দুটিতে পরম নিশ্চিন্তে কাঁচা শশা খাইতেছিল। গাছ হইতে ভাঙ্গে আর খায়। এই সময় মাঠ হইতে অগু বাড়ী ফেরে। সে ডাকে, বৌ, ও বৌ কোথায় গেলা?

দু'টিতে তখন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। এর পরই ধরা পড়িয়া গেল। অগু নারায়ণের কান ধরিয়া টানিয়া আনিল। হাস্ত গেল পলাইয়া।

কিশোর নারায়ণের সেদিন সে কী রাগ! বুড়া আমার কান মলতে পার আর বউর লগে পার না—বলিয়া সে চেঁচাইতে থাকে।

আজ নারায়ণের জেলের খবরে তার দুঃখ কি আনন্দ কোন্‌টা যে বেশী হইল হাস্ত নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না।

এগার

ফৌজদারী মামলার আসামীরা খালাস হওয়ার কিছুদিন পরে বঙ্কিম রাণীডাঙ্গার হাটের উত্তরে মেলা বসাইল। কুরপালার লোকে বলিল, মামলায় সুবিস্তা হয় নাই তাই লাজ-লজ্জা ঢাকার জন্য টাকার খেলা দেখাইতে লাগছে।

খালের উপর তোরণ ওঠে, নাম ডেলামিয়ার গেট। ছোট ছোট টিন ও খড়ের চালায় মাঠ ছাইয়া যায়। ডে-লাইটের আলোর কাছে জ্যোৎস্না হার মানে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডেলামিয়ার মেলার উদ্বোধন করেন। শীতল ডাক্তার যৌবনে পদ্য লিখিতেন। ম্যাজিস্ট্রেটের আগমন উপলক্ষে বহুদিন পরে এক ইংরেজী পদ্য বাঁধিলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সাহেবের সামনে সুর করিয়া আবৃত্তি করিল :—

থ্রি চিয়ার, থ্রি চিয়ার
লং লিভ ডেলামিয়ার
রামস্ রেলম্ নো ফিয়ার
ডেলামিয়ার, ডেলামিয়ার

শীতল রামরাজ্যের সঙ্গে ডেলামিয়ারের শাসনের তুলনা করেন। তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনার সঙ্গে সঙ্গে লোককে অভয়বাণী শোনান। শীতলের পৌত্রী সাহেবের গলায় মালা পরায়।

রামেন্দ্রেরও নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি জাহ্নবীকে বলিলেন, আমার যাওয়া ত' অসম্ভব। বীরেনকে পাঠিয়ে দাও। ও যেন দরবারী পোশাকে যায়। পাগড়ি তলোয়ার আর সনদ নিয়ে।

এই জিনিসগুলি রায়েদের গর্বের বস্তু। প্রায় জমিদারির সমান পুরাতন। বীরেন চাপকান পরিয়া, পাগড়ি চড়াইয়া, কোমরে তরবারি ঝুলাইয়া রওনা হয়। রামেন্দ্র তাকে ডাকিয়া বলেন, সাহেবকে স্যালুট করে সনদ দেখিয়ে বলবে, Sanad given by Nawab Mirzafor of hallowed memory to my ancestor Late Rai Rayan Amir Chand, your honour Sir, (পূতস্মৃতি মীরজাফর আমার পূর্বপুরুষ রায়-রায়ান আমীরচাঁদকে এই সনদ দিয়াছিলেন।)

And this Sword and Pugree given as reward for loyal service to my ancestor Opin Chand by Mr. Holwell of hallowed memory.

(পূতস্মৃতি হলওয়েল সাহেব রাজকার্যের পুরস্কারস্বরূপ আমার পূর্ব-পুরুষ উপিনচাঁদ বা উপেন্দ্র চন্দ্রকে এই পাগড়ি ও সনদ উপহার দেন।)

বাঁধি গৎ। বর্ণ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রায় বংশের ছেলেরা এই গৎ শেখে।

সেদিন বীরেন প্রথম এই পোশাক পরে। পুরান চোগা চাপকানে যেমন তাকে মানায় নাই, তেমন মানায় নাই পাগড়িতে। তার দেহের তুলনায় সবই সুবৃহৎ। বীরেন বেঁটে মানুষ, তলোয়ারখানি লম্বা। সেখানা হাতে তুলিয়া চলিতে হয়। উহা জাহ্নবীর চোখেও বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু উপায় নাই। জমিদারির মতন সম্মানের বোঝাও এখন তাঁদের শাস্তির সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মহাসমারোহেই মেলার উদ্বোধন হয়। সন্ধ্যার পর খালের দুই পারের লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া সাহেবের স্টীমলঞ্চ দেখে দেখে প্লেট ও ডিম হাতে করিয়া উর্দিপরা চাপরাসীরা যাতায়াত করিতেছে।

কুরপালার বাসিন্দারা ঘরে বসিয়াই মেলার জলুস দেখিতে পায়।

শোনে বাঘের গর্জন, বিলাতী ব্যাণ্ডের বাজনা। মেলার কলরব পৌছায় রূপমতীর তীর পর্যন্ত।

কিন্তু কুরপালার ক্ষত এখনও শুকায় নাই। নারায়ণ জেলে, বিলের জমি লইয়া দেওয়ানী মামলা চলিতেছে। মাতব্বররা তাই পরামর্শ করিয়া স্থির করে, মেলার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিবে না।

অশ্বিনী বলিল, মেলা ভাইকাঠ করব।

আদম জিজ্ঞাসা করে, সেডা আবার কি?

অশ্বিনীর কথা সংশোধন করিয়া দেয় নসীরাম—'ভাইকাঠ' নয়রে। কাট। ভাইকাট। বাবুরা একবার বিলাতী বস্তর ভাইকাট করিয়া ধরল দেশী বস্তর। বার্ডসাই ভাইকাট করিয়া বিড়ি।

আদম বলে, বার্ডসাইর বদল যেমন হৈল বিড়ি, বিলাতী ধুতির বদল জোলার বস্তর, সেইরকম এই মেলা ভাইকাট করলে আমারগোও একটা মেলা বসাইতে হবুব।

সকলে হাসিয়া ওঠে! ভজহরি বলে, সে কি সম্ভব?

আদম কহিল, তোমরা কও আমার মাথা মোটা। আমি কিন্তু কইয়া রাখলাম, খালের এপারে একটা কিছু উচ্ছব না করতে পারলে এই ভাইকাট অচল হবে। ওপারে লোক ছোটবেই। মদ আর মাইয়া মানুষ, হেঃ হেঃ চাচা।

মেলার আকর্ষণ নানারকম, মদের দোকান, জুয়ার আড্ডা। কুরপালায় সব খবরই আসে। আসে মাদ্রাজী ডিগবাজি ও দড়ির খেলার খবর। একটি মাদ্রাজী তরুণী ডিগবাজি খাইতে খাইতে ত্রিশ হাত জমি পার হইয়া যায়। এক নাগপুরী দম্পতি দড়ির উপর নানা কসরৎ দেখায়। স্ত্রীর মাথায় পর পর চারটি কলসী, স্বামী তাকে কাঁধে করিয়া শূন্যে দড়ির উপর হাঁটে। স্ত্রী হাতে তালি দেয়, স্বামী তালে তালে গান গায়।

দেখার মতন আরও অনেক কিছু আসিয়াছে, বাঘ, ভালুক, তিব্বতী ছাগল, হিমালয়ের অজগর সাপ।

সারা পরগনা মেলায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। চাল চিঁড়া বাঁধিয়া আসে মধুমতীর ওপারের লোক খুলনা ও বরিশাল জেলা হইতে। নৌকায় খাল ছাইয়া যায়।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া কুরপালার দু-একজনও যাইতে আরম্ভ করে। গ্রামের কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে বলে, কাউরে কইও না যেন।

ভজহরির ছেলে নরহরি একদিন মদ খাইয়া ফিরিল। ভজহরি তার পিঠে পেয়ারার ডাল ভাঙ্গিল।

এরকম ঘটনা আরও দু-একটা বটে। কারও টাকাটা সিকিটা হারায়। বয়স্করা জানে এসব ছেলেদের কাজ। তারা মেলায় খরচা করিয়া আসিয়াছে।

আদমের ভাই কদম জুয়া খেলিয়া একটা ঘড়ি পাইল। খবরটা সঙ্গে সঙ্গেই রটিয়া গেল।

দলে দলে লোক ঘড়ি দেখিতে আসে। তরুণের সংখ্যাই বেশী। দাম সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলে। যে যেমন খুশি বলে, দুই, পাঁচ, দশ টাকা। তবে কদমের নিজের ধারণা যে ঘড়িটার দাম অন্তত পঞ্চাশ। চার আনা দিয়া সে একটা দামী জিনিস পাওয়ায় অনেকেরই হিংসা হয়। তারা বলে, পঞ্চাশ টাকা না ছাই।

আদম লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায়, এর মধ্যে সোনার যন্তর আছে।

লোকে প্রশ্ন করে, তুমি জানলা কি করিয়া?

শুনছি সলামতুল্লার কাছে।

সালামতুল্লা আদমের শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের লোক। জেলার পুলিশ

সাহেবের বাবুর্চী, চাকরি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, আগে বাবুর্চী ছিল তার বাবা নিয়ামতুল্লা।

গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু বলিতে হইলে আদম সালামতুল্লার দোহাই দেয়।

অকালী বলিল, সালাম মিয়া বড় চাকুরিয়া, সাইব সুবার ঘড়িটড়ি অনেক দেখছেন। কিন্তু এটাত দেখেন নাই।

আদম উত্তর করে, তার সাইবের এইরকম একটা ঘড়ি তিনি আমারে দেখাইছে।

যোগেশ বলে, সাইবের ঘড়ি, তার দাম মোটে পঞ্চাশ টাকা?

আদম এবার মুশকিলে পড়িয়া যায়।

ছোটদের ইচ্ছা ঘড়িটা খুলিয়া দেখে ওর মধ্যে টিক-টিক শব্দ হয় কেমন করিয়া। ভিতরে বসিয়া কল চালায় কে? কিন্তু ঘড়ির কাছে ঘেঁষিবার উপায় নাই। বৃদ্ধ স্বামী তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে যেরূপ পাহারা দেয়, কদম ঘড়িটাকে তার চেয়েও কড়া নজরে রাখে।

রাণীডাঙ্গার সঙ্গে তাদের ঠকিবারই সম্পর্ক। খালের ওপার হইতে লাভ করিয়া ফেরা কুরপালার ইতিহাসে এই প্রথম। এই লাভ লোককে লোভী করিয়া তোলে। এক এক করিয়া প্রায় সকলেই এবার প্রকাশ্যে মেলায় যাইতে আরম্ভ করে। যায় না শুধু মাতব্বররা কয়েকজন।

সরু সরু পথ, দুইদিকে সারি সার বিপণি। সুন্দর সাজান রঙিন কাগজের বাক্স, শিশি বোতল। তারা লেবেল পড়িতে পারে না, তবে জানে যে এগুলিতে তরল আলতা, সুগন্ধি তেল, ভাল সাবান আছে। কিনিতে ভারী ইচ্ছা হয়।

বাড়া ফিরিয়া বৌকে যদি অন্ততঃ একখানা রঙিন সাবান দিতে

পারিত। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানেরা কেনে লাল শাঁখা, রঙিন সাবান, বেলোয়ারী চুড়ি। কিনিয়াই বন্ধুদের উপহাসের ভয়ে কাপড়ের তলায় গোঁজে।

পুতুলের দোকানের সামনে আসিয়া ছেলেরা বায়না ধরে, এটা চাই, ওটা চাই। তরুণরা জালি গেঞ্জি গায়ে চড়াইয়া সস্তা সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

একজন দোকানী মাদুলি হাতে করিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া চেঁচায়, এই মাদুলি ধারণ করলে অম্ল, অজীর্ণ, বিসূচী, অগ্নিমান্দ্য, কুষ্ঠ, প্রদর, ম্যালেরিয়া সব সারে। সাপে কামড়ালে মাদুলি ধোয়া জল রোগীর মাথায় ঢালুন। রোগী সেরে উঠবে। বিছায় কামড়ালে ক্ষতস্থান এই মাদুলির জলে ধুইয়ে দিন। যন্ত্রণা থাকবে না। দাম দু'আনা মাত্র। সত্বর কিনুন। বিলম্বে ঠকবেন।

কত পয়সা আপনারা এমনি নষ্ট করেন। আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনাদের অনুরোধ করছি একবার মাত্র দু'আনা পয়সা খরচা করে দেখুন।

আর একটা কবচ ধরিয়া বলে, হাতের মধ্যে এই জিনিসটা আপনারা দেখছেন। দেখতে ছোট বটে কিন্তু এর শক্তি অসীম। আপনার মামলা চলছে, আপনি এই কবচ ধারণ করুন। হাকিম আপনার পক্ষে রায় দেবেন।

আপনি হয়ত কোন নারীকে ভালবেসেছেন। এই কবচ ধোয়া জলে চন্দন ঘষে কপালে পরুন। আপনার ভালবাসার জন নিজে এসে ধরা দেবেন। অষ্টধাতুর এই মধুকরী কবচ। দাম মাত্র আট গণ্ডা পয়সা।

কুরপালার যাদের দেওয়ানী মামলা চলিতেছে তাদের কেহ কেহ এক একটা কিনিয়া কেনে।

একটি মুসলমান জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্ধির কিছু জমি ছিল। এমন কবচ আছে যাতে জমিটা পাওয়া যায়?

কবচওয়ালা বলিল, সেলাম আলেকুম বড়মিয়া। নিশ্চয় আছে। বোগদাদী কবচ। ইস্পাহানের নাম শুনেছ? তার রাজধানী বোগদাদ। সেখানকার মস্তবড় ফকিরের দোয়ায় পাওয়া।

স্থানীয় চাষী মজুররা মেলায় চাল, ডাল, ফল পাকুড় আনিয়াছে। বেচিয়া তেল, নুন কিনিবে। কামাররা আনিয়াছে ছুরি, কাঁচি, জোলারা লুঙ্গি, গামছা। পোটোরা পুতুল। কয়েকটি মেয়ে কাঁথা সেলাই করিয়া পাঠাইয়াছে, তার মধ্যে কুরপালার হাস্যের কাঁথাই সব চেয়ে সুন্দর।

মেলায় এই অঞ্চলের জোলা ও কামার কুমারের কিছু কিছু লাভ হইল বটে কিন্তু জুয়া ও মদে লোকসান হইল তার চেয়ে ঢের বেশী। বঙ্কিম সম্প্রতি হাটখোলার উত্তর-পুব দিকে মদের দোকান কিনিয়াছে। ভিড় সেখানে অসম্ভব রকম। আর ভিড় জুয়ার আড্ডায়।

শঙ্কর আরও দুইদিন মেলায় আসিয়াছিল। সেদিন দেখিল এক নূতন দৃশ্য। পনর ষোল বছরের একটি চাষীর ছেলে মাতলামি করিতেছে। চলিতে চায় কিন্তু পারে না। দুপা চলিয়াই টলিতে টলিতে একটা গাছের উপর আসিয়া পড়ে।

শঙ্কর তাকে ধমক দিলে সে বলিল, তবুত আজ সেয়ানা হইতে পারলাম না। আমারে নরহরি কইছিল কিন্তু।

শঙ্কর ব্যাপারটা বুঝিতে পারে না। অপর একটি চাষীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, পুব দিকে একবার দেইখ্যা আইসেন কর্ত্তা। চাষাভুষার কেমনতর সর্বনাশ হইতেছে।

শঙ্কর মেলার শেষে পুব দিকে একটু আগাইয়া যায়। জায়গাটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। সেখানে দেখে বাঁশের খুঁটির উপর ছোট ছোট কতগুলি চালা। প্রত্যেকটির তিনদিকে দরমার বেড়া, সামনে একখানা করিয়া আলকাতরা মাখান চটের পর্দা। ভিতর হইতে একটি নারী আসিয়া পর্দার সামনে দাঁড়ায়। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না। দু চার মিনিটের মধ্যেই একটা না একটা শিকার জোটে। শিকারগুলি সবই প্রায় কুরপালার চাষী মজুর।

শঙ্করের ছেলেবেলায় রাণীডাঙ্গার মেলায় এক পয়সার কাঠের পুতুল বিক্রয় হইত, এই মেয়ে গুলি সেই কাঠের পুতুলের চেয়েও শ্রীহীন, কালো চামড়ায় ঢাকা এক একটা চলন্ত জীব ছাড়া আর কিছুই নয়। দেখিয়া শঙ্করের চোখ জলে ভরিয়া যায়।

পরদিন প্রাতেই সে বঙ্কিমের বাড়ী গেল। বঙ্কিম এক গাল হাসিয়া বলিল, এসো শঙ্কর। শঙ্কর বলিল, আমি এসেছি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

সেকি কথা! ছোট রাজার ছেলে তুমি। গ্রামের গৌরব। তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করব?

কুণ্ডু মশাই, দেশের রাজা এখন আপনি, রায়েরা নয়। সে কথা যাক্, আমি এসেছি রূঢ় কথা বলতে। স্তুতি করতে বা শুনতে নয়।

বঙ্কিম প্রশ্ন করিল, কথাটা কি বাবাজী?

দেশের একি সর্বনাশ করছেন আপনি? এত অনিষ্ট জমিদাররাও করতে পারেনি।

তার মানে তোমার বাবা, ঠাকুরদা দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট করেছেন, আমি তাঁদের চেয়েও বেশী করছি, এইত তুমি বলতে চাও? যাক্ তোমার জন্ত একটু চা আর খাবার নিয়ে আসুক?

চা খেয়ে এসেছি। খাবার আমি খাবনা। আমি বলতে এসেছি, মেলায় বেশ্যা আর জুয়া এ দুটো আপনি বন্ধ করে দিন। মদের দোকান সম্প্রতি ডেকে নিয়েছেন, সেটা বন্ধ করতে বলা নিরর্থক তা জানি। কিন্তু জুয়া আর পতিতার আড্ডা ত' ইচ্ছে করলেই তুলে দিতে পারেন; বঙ্কিম বলিল, ওদের সঙ্গে যে আমার কন্‌ট্রাক্ট করা আছে।

বেশ্যার সঙ্গেও আপনি কন্‌ট্রাক্ট করেছেন? ছিঃ।

মেলা চালু করতে হলে এসব যে দরকার।

শঙ্কর রূঢ় স্বরে কহিল, আপনার দরকার যে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে।

দরকার শুধু আমার নয়, সমাজেরও। ঐ মেয়ে গুলোই বা বাঁচে কিকরে?

রাগে শঙ্করের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। সে বলিল, তার চেয়ে ওরা মরে যাওয়া যে ঢের ভাল।

তোমাতে আমাতে মতের তফাৎ বড় বেশী। আমাদের এ বিষয়ে আর কোন কথা না হওয়াই ভাল।

আপনি কি এদুর্নীতি বন্ধ করবেন না?

এখন যে অসম্ভব।

বেশ—বলিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কিম জানে ভাল ছেলে বলিয়া ছাত্র মহলে শঙ্করের প্রতিপত্তি খুব। সে ইচ্ছা করিলে মেলায় তরুণদের পিকেট বসাইতে পারে। এই পরিস্থিতি পুলিসকেও অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সে তাই অস্ত্র অস্ত্র

প্রয়োগ করিল, বলিল, অন্য সবাই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু তোমার কাছে এটা আমি আশা করিনি বাবাজী।

শঙ্কর বিস্মিত ভাবে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বঙ্কিম কহিল, ভেবেছিলাম কথাটা তুলব না। সেটা হল বিশুদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা দেখছি—

বঙ্কিম ও বিশ্বনাথ প্রায় এক বয়সী। বিশ্বনাথ সামান্য বড়। বাল্য ও কৈশোরে ত কথাই নাই, প্রথম যৌবনেও একজন ছিলেন, হুজুর, ছোট রাজা। বঙ্কিম বিশ্বনাথকে সম্বোধন করিত, কর্তা বা ছোট রাজা বলিয়া। বিশ্বনাথ বলিতেন, তুই। ডাকিতেন, বঙ্কিম।

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তুই এখন তুমিতে উঠিয়াছে। ছোটরাজা আসিয়া ঠেকিয়াছে বিশুদাদায়।

শঙ্কর বলিল, বাবার সঙ্গে এমন কি ব্যক্তিগত ব্যাপার?

বঙ্কিম প্রথমে খানিকটা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, বলে, তোমার বাবাকেই বরং জিজ্ঞাসা ক'র। শেষটায় যেন বাধ্য হইয়া বলে, কাল বিশুদাদা এসেছিলেন তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি এমন কি ভিটে পর্যন্ত বন্ধক রাখতে।

বাবা এসেছিলেন আপনার কাছে!

তোমারই লেখা পড়ার খরচার জন্য টাকার দরকার। তুমি দেশের গৌরব, একদিন হয়ত হাকিম কিংবা একটা বড় উকিল হবে। রানীডাঙ্গার নাম উজ্জ্বল হবে তোমাকে দিয়ে। আমি তাই বিষয় বন্ধক না রেখেই টাকা দিয়েছি। সেই জন্যই বলছিলাম, তোমার কাছে এব্যবহার আমি আশা করিনি। থাক্, তুমি এবিষয় কিছু জানতে না দেখছি।

বঙ্কিমের ভাবটা এমন যেন শঙ্করের একটা মস্ত বড় অপরাধ সে ক্ষমা করিল।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পর বলে, না, মা আমার আর কিছু বলার নেই—বলিয়াই সে দ্রুত পদে বাহির হইয়া যায়।

বঙ্কিম মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

শঙ্কর পরের দিনই দেশ হইতে চলিয়া যায়। খবরটা কুরপালায় হাস্তের নিকট পৌঁছে ঘোর সন্ধ্যার সময়। রেড়ির তেলের ক্ষীণ আলোয় তখনও সে কাঁথা সেলাই করিতেছিল। শঙ্করের দেওয়া রঙিন সুতার সেলাই।

খবরটা শুনিয়া সে একবার সামনে মাচার দিকে চায়। সেখানে একটা বেতের তৈয়ারি পেটরায় আরও কয়েক খানা কাঁথা সেলাই করা আছে। সবই শঙ্করের জন্য।

মায়ের কাছে এই বিধবার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া শঙ্কর মধ্যে মধ্যে তাকে সাহায্য করিত।

ইন্দুপ্রকাশের চেষ্টায় বঙ্কিমের মেলায় কতগুলি কাঁথা প্রদর্শিত হয়। হাস্তের কাঁথা দেখিয়া শঙ্কর তাকে উৎসাহিত করে। বলে, তুমি এই রকম কয়েকখানা সেলাই করে দিও। আমি কলকাতায় নিয়ে যাব।

কলকাতায় কাঁথা!—হাস্ত বিস্ময় প্রকাশ করে।

তোমার বাহারি কাজ বড় লোকেরা শখ করে কিনবে।

হাস্ত কাঁথার উপর বিভিন্ন ডিজাইনের পাড় তোলে। তোকে

বাঘ হরিণ, নদনদী অনেক কিছু। খালের বিচিত্র কত্থা বলায়। ভাল করিয়া কাচাইয়া, পাট করিয়া ঐ পেটরায় তুলিয়া রাখে।

আজ হাস্ত ভাবে, শঙ্কর দাদাবাবু তাকে এমনি করিয়া না বলিয়া চলিয়া গেলেন। এই কাঁথা গুলি দিয়া এখন সে কি করিবে?

কয়েকদিন পরে মেলা বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে কদমের ঘড়িরও দম ফুরাইল।

আদম বলে, এ হারাণের বেটার কারসাজি।

কদম ত রাগিয়াই খুন। সে বলে, ঘড়িওয়ালারে পাইলে মাথা ফাটাইয়া দিতাম। হালা দিন গুনিয়া দম দিছে।

মেলা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুজব রটিল। বঙ্কিম রূপমতীর পারে কারখানা করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেটকে আনাইয়াছিল সেইজন্য।

বার

বৃটিশ সরকারের তরফ হইতে মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে এক একটা কমিশন আসে। গালভরা থাকে তাদের নাম, সারা দুনিয়ায় তাদের পবিত্র উদ্দেশ্য বিঘোষিত হয়। আমাদের স্বরাজ বা স্বাধিকার দিতে তাঁরা আসেন। অবশ্য, নাবালক জাতি যতখানি স্বরাজ পাইতে পারে ঠিক ততখানি।

বিখ্যাত সাইমন সাহেবের নেতৃত্বে এইরূপ একটা কমিশন আসি[illegible] সারা ভারত, আসমুদ্র হিমাচল, এই কমিশন বর্জন করিল। [illegible] পতাকা দেখাইল। কিন্তু শাসক সম্প্রদায় উহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। সাইমনের রথ নির্ধারিত পথে চলিতে লাগিল।

এই রথযাত্রার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য লাহোরে যারা পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন পুলিস তাদের উপর মৃদু যষ্টি চালনা করিল। দেশবরেণ্য বৃদ্ধ লালাজীও বাদ গেলেন না। লাঠি পড়িল তাঁর বুকের উপর।

এর কিছুদিন পূর্বে এম, এ তে প্রথম হইয়া শঙ্কর সরকারী কলেজে প্রফেসারি পায়। বিশ্বনাথ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, ছেলে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা দিয়া আই সি এস হইবে। হইবে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট।

এই সময় শঙ্কর জানাইল যে সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছে। পিতাকে লিখিল,—

লালাজীর এই লাঞ্ছনা সমগ্র ভারতের অপমান, ভারতবাসীর অপমান। যে শাসনযন্ত্র অমন জনবরেণ্য লোকের অঙ্গে আঘাত করতে পারে, করার পর সে সম্পর্কে একটা এনকোয়ারি করতেও সম্মত হয় না তার অধীনে চাকরি করা মনুষ্যত্বের গ্লানি। খবরটা পড়ে আমি তাই আজই পদত্যাগ করেছি।

আশীর্বাদ করুন যে পথ আমি বেছে নিলাম কখনও যেন সেই পথভ্রষ্ট না হই। আপনার অনুমতি নিয়ে পদ ত্যাগ করাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু জাতির এই লাঞ্ছনা আমাকে এমন পীড়িত করেছে যে আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, বাবা।

ইতি—

শঙ্কর

বিশ্বনাথ চিঠিখানি স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, দেখ শঙ্কর কি লিখেছে।

সরোজ চিঠি পড়িয়া একটুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। তাঁর মতামত ঠিক বুঝিতে পারেন না।

এই সংবাদে সব চেয়ে খুশি হয় সর্ব্বদমন। সে বীরেন্দ্রকে বলে, ভালো হইয়েছে, বড় বাবু। শঙ্কু বাবু হাকিম পুলিস হৈলে আপনারগো ছাড়াইয়ে যাইতো।

ঠিক বলেছ তুমি চোবে, বলিয়া বীরেন একটু হাসে।

চাকরি ছাড়িয়াই শঙ্কর কংগ্রেসে যোগ দেয়। নেতারা তাকে

কলিকাতায় কাজ করিতে বলেন। সে বলে, এখানে লোকের অভাব হবে না। আমি গ্রামে গিয়ে কাজ করব।

গ্রামে! তোমার মতন লোক পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে—অনেক নেতা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করে, আপনি কি করতে বলেন?

কলকাতায় কংগ্রেসের কাজ কর, কাউন্সিলর হও, কাউন্সিলে ঢোক। চাকরি ছাড়া সার্থক হবে।

ও আমি চাই না।

তা হলে আর করলে কি ইয়ংম্যান?

শঙ্কর কোন উত্তর করিল না। সে রাজনীতির ছাত্র। রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিত। কংগ্রেসের ইতিহাস, ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণসভার কার্যকলাপ, বিশেষতঃ পল্লী সমস্যা সম্বন্ধে পড়াশুনা করিয়া, নেতাদের আশিষ লইয়া একদিন রানীডাঙ্গায় চলিয়া আসিল।

তার মাকে শুভার্থিনীরা পরামর্শ দেন, তুমি বুঝিয়ে বললে এ রাস্তা ও ছেড়ে দেবে। অবুঝ ত আর নয়, হীরের টুকরো ছেলে।

সরোজ বলেন, ছেলে করবে দেশের সেবা, মা হয়ে আমি তাই নিষেধ করব?

তবে কি করবে হাস্ত সর্দারনি?—একজন বর্ষীয়সী বলিয়া ওঠেন। সরোজ তার মুখের দিকে তাকান।

আশে পাশের অনেক জায়গাই বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় যথেষ্ট সাড়া দিয়াছিল। দেয় নাই শুধু রাণীডাঙ্গা ও কুরপালা। রায়েদের বিরোধিতায় জন্ত আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৯০৫ সালে রায়েদের প্রতাপ প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ও বঙ্কিম তাদের তালপুকুর পরগনা কিনিয়া নেয় নাই।

প্রথম প্রথম শঙ্করের বেশ একটু অসুবিধা হয়। ভূম্যধিকারী শ্রেণী শ্লেষ করে, নিরামিষ লড়াই, সুতোর স্বরাজ।

কেহ কেহ বলে, মদে স্বাধীনতা আটকালে ইংরেজ পরাধীন হত কোন্ যুগে?

শঙ্কর সহযোগিতা পায় কয়েকটি তরুণের। তারা কংগ্রেসের একটি শাখা কমিটি স্থাপন করে, করে জাতীয় স্কুল। বিষ্ণু চাটুয্যে হয় হেড-মাষ্টার, শঙ্কর রেক্টর।

সঙ্গে সঙ্গে চলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ। বিষ্ণু সামান্য হোমিওপ্যাথি জানিত। শঙ্করও শিখিতে লাগিল।

ঔষধের জন্য দু-চারজন করিয়া কুরপালার চাষীরা আসিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠায়। বয়স্কদের মধ্যেও দু'একজন নাইট-স্কুলে যোগ দেয়।

শঙ্করকে মধ্যে মধ্যে কুরপালায় যাতায়াত করিতে হইত। একদিন সে যদুনাপিতের উঠানের উপর দিয়া যাইতেছিল এমন সময় তার কানে গেল যদুর স্ত্রী তিনকড়ি বলিতেছে, ছোটরাজার ছাওয়ালের অত ঘোরাঘুরি কিসের? মতলবটা ত' ভাল ঠেকতেছে না। বাপেরই মতন না কি?

বাপের মতন—কথাটা শঙ্করের কানে বাজে।

লোকের অবিশ্বাস দেখিয়া মধ্যে মধ্যে সে দমিয়া যায়। রাগ করে। আবার ভাবে, এ রাগ তার কার উপর? দোষ কার? দোষই বা কতটা?

•

ভজহরির ছেলে নরহরির কলেরা। নাপিতপাড়ার সবাই সন্ধ্যার সময় দরজা বন্ধ করে। রোগীর শিয়রে আসিয়া বসে, বিষ্ণু ও শঙ্কর।

তিনটি মাত্র প্রাণী তার সেবা করে, তারা দুজন আর রোগীর মা সারদা।

ভজহরি বারান্দায় বসিয়া মধ্যে মধ্যে বলে, মা কালী, মা তারা নরুকে সারাইয়া তোল। জোড়া পাঁঠা দেব।

ছেলে সারিয়া উঠিলে সারদা বলিল, আপনারা একদিন পেরসাদ দেন।

বিষ্ণু বলিল, রান্না করবে কিন্তু তুমি।

সারদা যেন আকাশ হইতে পড়িল! বলিল, রসুই! আমি করব রসুই আর তোমরা তাই খাবা?

বিষ্ণু বলে, নিশ্চয়। নইলে খাবই না। এ সম্পর্কে আমি ভারী উদার।

সারদা একটুক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া বলে, সেটা কি?

খাওয়ার প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়া যাইত। কিন্তু বিষ্ণুর জিদ চাপিল সারদার রান্না সে খাইবেই।

তারা সারদার রান্না খাওয়ায় রাণীডাঙ্গায় সোরগোল ওঠে। উচ্চ বর্ণীয়েরা অনেকে বলেন, এই করে ওরা আনবে স্বরাজ। স্বরাজ মানে যদি হয় অন্ত্যজের ছোঁয়া খাওয়া, তাহলে দরকার নেই আমাদের অমন স্বরাজে।

বিশ্বনাথ রায়ের ছেলে দলে না থাকিলে বিষ্ণুকে হয়ত একঘরে হইতে হইত। বন্ধুদের কাছে ইহা শুনিয়া সে হাসিয়া বলে, সমাজ আমাকে একঘরে করার সম্মান দিতেও নারাজ দেখছি। আমি গরিব কি না।

ভজহরির বাড়ীতে একখানা টিনের ঘর আছে আর দুটা ধানের মড়াই। চাষীর ইহাই স্বচ্ছলতার লক্ষণ। লোকে ভাবে, তার অবস্থা ভালই। কিন্তু কয়দিন তার বাড়ীতে কাটাইয়া শঙ্কররা দেখিল, এই

পরিবারের না আছে একখানা বিছানা, না একখানা কাপড়। সম্বল মাত্র খানকয়েক কাঁথা তাও জীর্ণ মলিন। তৈজসপত্রের মধ্যে একটা ঘটি, পিতলের দুটা চুমকি আর দু'খানা থালা।

শঙ্কর খোঁজ নিয়া জানিল ভজহরির ভাল ভাল জমিগুলি বঙ্কিমের কাছে বন্ধক পড়িয়াছে।

একদিন সে বলিল, তোমার অবস্থা ত' ভালই জানতাম ভজুদাদা?

ভজহরি বলিল, আমার কপাল। ফসল ভাল হৈলেই বছরের খোরাক হইতে চায় না। তার উপর দেবতার কোরোধ, ভ্রূকুটি আছেন, আছেন অনাবিষ্টি, অতিবিষ্টি। এইত এ বছর বেশী বিষ্টিতে তিলগুলা নষ্ট হইয়া গেল।

কয়দিন পরে শঙ্কর একটা মিছিল বাহির করে। প্রথমে ছিল পঁচিশ ত্রিশটি ছেলে। ছেলেরা বন্দেমাতরং ধ্বনি করে, বলে, গান্ধীজীকি জয়।

পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল, ইনকুইলাব জিন্দাবাদ। রাণীডাঙ্গার বিপ্লবের জয়ধ্বনি এই প্রথম।

মিছিল হাটখোলায় পৌঁছায় বেলা নয়টা আন্দাজ। সবে মাত্র তখন বাজার বসিয়াছে। বাজারের লোকে মিছিলের ভিড় বাড়ায়। শঙ্কর কুরপালায় যাওয়ার প্রস্তাব করিলে রামনাথ বলেন, কুরপালা!

শঙ্কর উত্তর করে, কেন, আপত্তি কি?

গ্রামটা বড় ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

শঙ্কর বোঝে আপত্তির কারণ শুধু উহাই নয়। সে বলে, একদিন হুলই বা দেরি, কুরপালার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে নিবিড়।

রামনাথ তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। তাঁর মনে হয় এযুগের ছেলেদের স্বভাবই এই রকম। হেঁয়ালিতে ভরা।

বিষ্ণু ও কুরপালায় যাওয়ার জন্য জিদ ধরে। হিরণ সেন বলেন, শঙ্কর স্বপ্নের মানুষ, ও যখন ধরেছে, চল কুরপালায় একবার ঘুরে আসি, রামনাথ।

বিষ্ণু বলে, কেন আমি যে বলেছি তার কি দাম নেই?

আছে বৈ কি ভায়া—বলিয়া হিরণ বিষ্ণুর পিঠ চাপড়াইয়া তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেন।

বিষ্ণু বলে, কই আমার নাম ত করলেন না? দোহাই পাড়লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা ছেলেটির।

বিষ্ণু সাদা-সিধা মানুষ। কুটকপটের ধার ধারে না। তাই লোকেও তার স্পষ্টবাদীতায় রাগ করে না।

এপারে রাণাডাঙ্গা, ওপারে কুরপালা। মাঝে রাণীর খাল রাণীডাঙ্গার বুকে শুভ্র পৈতার মতন ঝুলিতেছে। তাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে শূদ্র কুরপালা হইতে। হাটের নীচে জীর্ণ সাঁকোটা বিত্ত ও নিঃস্বতার, সুখ ও দুঃখের, আলো ও আঁধারের মিলন প্রয়াসে ব্যর্থ হইয়াই যেন একদিকে কাত হইয়া পড়িয়াছে। কচুরিপানা অক্টোপাশের মতন খুঁটিগুলিকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কোথাও দেখা যায় অসংখ্য জলজ-গাছ, কাঁটা শ্যাওলা, জলস্রোতে সেগুলি একটু একটু নড়ে। তার বুকে ছোট ছোট মাছ ছুটাছুটি করে। শামুক হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস নেয় আবার মুখ বোজে।

সাঁকোর উপর তরুণদলের গান শুনিয়া কুরপালার খালধারের

বাসিন্দারা বিস্মিত হয়। ভাবে, একি? এর আগেও মধ্যে মধ্যে মিছিল বাহির হইয়াছে কিন্তু কুরপালার কথা ত' তাদের মনে পড়ে নাই। এদিকে তারা ফিরিয়াও চায় নাই।

কুরপালার লোকের তাই ভয় হয়, এই মিছিলের পিছনেও হয়ত বঙ্কিম কুণ্ডুর হাত আছে। সে নিশ্চয় নতুন কোন মতলব আঁটিয়াছে।

প্রথমেই এরফানের বাড়ী। মিছিলকারীরা তার উঠানে দাঁড়াইয়া গান ধরিলে কোরফানের মেয়ে পরিবাছু একটা লাল নিশান ধরিয়া বলিল, এটা আমারে দাও।

এরফান ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ধমক দিল।

ওকে ধমকাচ্ছ কেন এরফান ভাই—বলিয়া শঙ্কর মেয়েটির হাতে একটি নিশান দিলে সে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে থাকে। কোরফানের মুখও খুশির হাসিতে ভরিয়া ওঠে।

কুরপালায় জেলাবোর্ড কি লোক্যাল বোর্ডের রাস্তা নাই। পথ সর্বত্র: গৃহস্থের উঠান, পোড়ো ভিটা, দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত জমি, বাদ যায় নাই কিছুই। লোকে যেখানে যেরূপ সম্ভব মাঠ-ঘাট ঝোপ-জঙ্গল ভাঙিয়া যাতায়াত করে।

ভজহরি ও যদু নাপিতের বাড়ীর মাঝখানে একটা ছোট সোঁতা খাল। তার উপর তালগাছ পাতা। গাছটা সাঁকোর কাজ করে। তিনকড়ি জলের ধারে বেড়া দিয়া রাখিয়াছিল। হিরণ সেন বলিলেন, এ তো যাতায়াতের রাস্তা, এখানে বেড়া কেন?

ভজহরি বলিল, পরশু যদুর পরিবারের সঙ্গে আমার রাখহরির মার একটু কলহ হৈছিল।

কলহ অবশ্য একটু নয় তুমুল।

পাড়া প্রতিবেশীরা যদুবরের স্ত্রীর উপর এমনিই বিরক্ত। তারা বলিল, দেও বেড়া ভাইঙ্গা।

কেহ যদুকে ডাকিতে লাগিল। ভজহরি বলিল, যদুর ক্ষ্যামতা কি?

কুরপালার তরুণরা আবার বলে, ভাঙ্গো বেড়া।

হিরণ সেন বলিলেন, শুভকাজে বেরিয়ে লোকের মনে দুখখু দিতে নেই।

রামনাথ বলিলেন, কিন্তু ছোটলোকদের তোমরা যদি এ… আশকারা দাও, তাহলে ত' দেশ-গাঁয়ে টেকাই যাবে না।

কথাটা সকলেরই কানে বাজে। আদম আর থাকিতে পারে না সে বলে, তোমরা ভদ্দর লোকেরা আর মানুষ হবা কবে। আসবা মেশতে অথচ মনে মনে ঘেন্না করবা। না আইলেই পার।

তাকে শান্ত করে শঙ্কর। কয়েকজন তরুণকে লইয়া সে জলে নামি… যায়। ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করে, এই জল ভেঙ্গে মাঠে গিয়ে যাবে ত'?

তা যাবে। কিন্তু কচুরির ধাপ ভাইঙ্গা কি যাইতে পারবা?

শঙ্কর বলে, তা হ'ক। কিন্তু তুমি নেমে এস, ভজুদা।

একে একে সকলেই নামিয়া পড়ে। জল ভাঙ্গার চেয়ে কচুরি পানার ধাপ ঠেলিতেই কষ্ট হয় বেশী। ভুড়ভুড় করিয়া বুদ্‌বুদ ওঠে। আসে পাঁকের গন্ধ। জোঁক ও ব্যাঙের রাজ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। ছোট ছোট মাছগুলি পাঁকের মধ্যে লুকায়। পাখীরা কিচির মিচির করিয়া ওঠে।

তিন চারশ' হাত জল। তারপরই জোলাপাড়ায় যাওয়ার মেঠো পথ। এইটুকুর মধ্যেই বেত, বাঁশ, লতানে গাছ ও আগাছা দুই দিক —

হইতে থালের উপর ঝুঁকিয়া ছোট ছোট তোরণ গড়িয়াছে। তার গায়ে গায়ে লাল-হলুদ ফুল। বাতাসে পাতা নড়ে। একদিকে টকটকে লাল আর একদিকে সবুজ। যেন রঙিন পতঙ্গ।

মাথার উপর স্নিগ্ধ ছায়া, পায়ের তলায় শীতল জল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে থাকার পর বেশ ভালই লাগে। কিন্তু শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হয়। বেতের কাঁটায় গা ছড়িয়া যায়, খোলামকুচি ও ভাঙা শামুক পায়ে বেঁধে।

শঙ্কর বলে, এ জানলে এ পথে আসতুম না।

বিষ্ণু বলিয়া ওঠে, একেবারে ক্যালকেশিয়ান।

মাঠে উঠিয়া দেখা গেল অনেককেই জোঁকে ধরিয়াছে। হিরণ সেনের দু-পায়ে দুটা। তিনি হাসিয়া বলেন, এরই নাম অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

মিছিল আবার চলিতে শুরু করে।

তিনকড়ি কি ভাবিয়াছিল সে-ই জানে। লোকগুলি ডাকিল না, খোশামুদি করিল না, এমন কি ঝগড়াও নয়। সে ভাবিল, এ তাকে অপমান করার এক ফন্দি। এবং এর পিছনে আছে ভজহরি ও তার স্ত্রী।

এই সময় সে দেখিল, গজেনও মিছিলে যোগ দিয়াছে। এবার তিনকড়ির সম্পূর্ণ রাগ পড়িল ছেলের উপর। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, হাবার পুত হাবা। আইস্লুক ফিরিয়া। বোঝবে তখন মজা।

দল ক্রমে ভারী হইতে থাকে। চাষী মজুরেরা অনেকেই যোগ দেয়। তারাও গান ধরে। কথা জানে না, সুর ধরিতে পারে না। ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিয়া, আল্লাহো আকবর বলিয়া ত্রুটি সংশোধন করিয়া লয়।

প্রাণে তাদের অপূর্ব স্পন্দন। তারা ভাবে এই মিছিলের পিছনে

কি যেন খুব বড় কিছু আছে। জিনিসটা যে কি ঠিক ধরিতে পারে না। কল্পনা আরও রঙিন হইয়া ওঠে।

স্বদেশী মসজিদের সামনে গান থামিল। রামনাথ বলিলেন, এ আবার কি খেয়াল, শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল, মুসলমান ভাইদের ন্যায্য দাবি মানতে আমরা বাধ্য।

আদম পিছনে ছিল, সে এবার সামনে আসিয়া শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বড় দুঃখ যে তোমারেও মানষে ভুল বোঝে, ছোট রাজার পো।

মিছিল একে একে সকল পাড়া ঘোরে। দু-একটা বাড়ীতে টিনের ঘর, কোথাও বা ধানের মড়াই আছে। তা ছাড়া সর্বত্র এক দৃশ্য। ঘরে বেড়া নাই, চালায় খড় নাই, খুঁটিগুলি ঘুণে ধরা। মাটির ভিত, তাও হেলিয়া পড়িয়াছে। কামারশালায় হাপর চলে নাই বহুদিন। পোটোর ঘরে পুতুল নাই, জেলের নাই জাল। উঠানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। যেমন দারিদ্র্য, তেমনই ঔদাসীন্য আর অজ্ঞতা।

বাড়ীর নীচে তরল রূপার মতন রূপমতীর জল অথচ দিগম্বর শিশুর দল কাদামাটি মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মাথায় তাদের দীর্ঘদিনের ধুলা-বালির জট।

বৃদ্ধেরা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কাসে, বৃদ্ধারা উকুন বাছে আর বিড় বিড় করে।

আগে পয়লা বৈশাখ মিছিল বাহির হইত। উহা মনে পড়ায় এক বৃদ্ধ বলে, এর মধ্যে বছর ফুরাইল! ও আল্লা। যাক্ চারডি চাউল আনছে কইতে পার?

জীবনের পারে বসিয়া কালের ঢেউ গনিবার সামর্থ্য লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু বুদ্ধের চালের চাহিদা ফুরায় নাই। এই দল চাল দেয় না শুনিয়া সে টিপ্পনী করে, তা হইলে মরতে আইছ কি করতে?

এক বাড়ীতে একটি বধূ কচু গাছের ধারে ছাইয়ের গাদার পাশে বসিয়া কইমাছ কুটিতেছিল। মিছিল উঠানে আসিলে সে তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া এক শরা ভিক্ষার চাল লইয়া আসিল। মোটা লাল চাল।

দলটি ভিক্ষার জন্য আসে নাই শুনিয়া বধূটি জিভে কামড় দিয়া বলে, লজ্জায় মরি। রায় রাজার পোরে গেছিলাম ভিক্ষা দিতে!

এত দুঃখ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা কিন্তু এর মধ্যেও লোকগুলার মুখে কেমন যেন একটা তৃপ্তির ছাপ। শহরের গরিবের মধ্যে শঙ্কর ইহা দেখে নাই। পল্লীর জল মাটি গাছপালা ঝোপ ঝাড় মানুষগুলাকে বুঝি এমন করিয়াই গড়ে।

মধুর মা তাদের সবাইকে বাতাসা ও জল খাওয়াইল। আলিমেহের দিল দুই কাঁদি কলা। বলিল, আমার ব্রেক্কের রম্ভা।

দীন ময়রা দিল কয় হাঁড়ি দই। বৈকালে হাটে বেচিবার জন্য রাখিয়াছিল। শোভাযাত্রীদের বাড়ীতে পাইয়া সে যেন পরম অনুগৃহীত হইল। কহিল, আপনারা অতিথ্ নারাণ। দইটুক সেবায় লাগাও।

এই মিছিলের ফলে কুরপালায় সাড়া পড়িয়া যায়।

এরই কয়দিন পরে নারায়ণ সর্দার খালাস হইয়া আসে। রামেন্দ্রকে প্রহারের জন্য তার এক বছরের জেল হইয়াছিল। লোকে তখন আপিল করিতে বলে। নারায়ণ উত্তর করে, আপিল কিসের? মানুষটারে অমন প্রহার করলাম! এট্টু অন্তত: ভুগি।

সেই ভুগিয়া সে দেশে ফিরিল। আসিয়াই কংগ্রেসে নাম লিখাইল।

শঙ্করকে কহিল, আমি একলা মানুষ। শরিক নাই, দায় দায়িত্ব নাই। আপিস কর আমার বাড়ীতে।

নিষ্ঠা তার অদ্ভুত। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে কংগ্রেসের সভ্য যোগাড় করে। তুলা ও চরকা বিলায়, কাটুনিদের নিকট হইতে সুতা সংগ্রহ করিয়া আনে।

পুরুষদের মধ্যে যেমন নারায়ণ, মেয়েদের মধ্যে তেমনি হাস্থ। উৎসাহ তার অদ্ভুত। তারই চেষ্টায় দু-চারটি করিয়া স্ত্রীলোক কংগ্রেসের সভ্য হয়।

মাস দুইয়ের মধ্যে মহিলা শাখা স্থাপিত হয়, তার ভার পড়ে হাস্থের উপর। এই কাজ পাইয়া সে নিজের দুঃখ-কষ্ট ভোলে, কুরপালার অনেক মেয়েকেই কংগ্রেসে টানিয়া আনে। পারে না শুধু পদ্মকে।

পদ্ম তার সবচেয়ে আপনার জন। সে আসিলে কী আনন্দই না হইত। কিন্তু পদ্মের কাছে কথাটা পাড়িলেই সে এড়াইয়া যায়। বলে, পরে ভাবিয়া কব।

হাস্থ বোঝে, এই আপত্তি তার নিজের নয়, অক্রুর।

শঙ্কর দেখে রাণীডাঙ্গার বাবুদের চেয়ে কুরপালার লোকেরই আন্তরিকতা বেশী। তাঁত চালানো ত' দূরের কথা, রাণীডাঙ্গার বাবুরা সুতা কাটিতেও চায় না। বলে, এই সময় অন্য কিছু করলে রোজগার বেশী হবে।

আর কুরপালার চাষীরা সুতা কাটিয়া সামান্য যা পায় তাতেই তাদের অভাবের কিছুটা লাঘব হয়। স্বায়ত্তশাসন, হোমরুল তারা বোঝে না। তারা চেনে শঙ্করকে, বিষ্ণুকে। মনে করে গান্ধী একজন অবতার। স্বরাজ বলিতে তারা বোঝে গান্ধীরাজ, যে রাজ্যে প্রচুর ধান-কলাই পাওয়া যাইবে, কুইনাইন পাওয়া যাইবে। পুলিসের

অত্যাচার থাকিবে না, মালক্রোক থাকিবে না। থানার বড়বাবু ছোটবাবু হইবে শঙ্কর ও বিষ্ণুর মতন লোক।

আদম বলে, দারোগা কেন, শঙ্করদাদা হবেন মাজেষ্টর। ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া কবে হট্, কট্—আর লোকে তারে কবে সেলাম আলেকুম।

সাগরদীঘি থানার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নারায়ণের ভিটায় উঠিয়া আসে। রাণীডাঙ্গা হয় তার অধীন। এরূপ ঘটনা এর আগে কখনও ঘটে নাই। সমস্ত ব্যাপারে বরাবর রাণীডাঙ্গাই অগ্রণী, কুরপালা পিছনে। রাণীডাঙ্গার কংগ্রেস কুরপালার নাড়ুর ভিটার কংগ্রেসের অধীন, বাবুরা ইহা বরদাস্ত করিতে পারে না। বলে, এরই নাম উলটু পুরাণ।

শঙ্করের আশা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের মতন এই আন্দোলনেও মুসলমানরা যোগ দিবেন। কিন্তু তাকে নিরাশ হইতে হয়। আদম ও রাসেদুল প্রভৃতি কয়েকজন আসেন বটে কিন্তু বিশাল বিরাট মুসলমান সমাজে কোন সাড়া জাগে না বরং দেখা যায় গান্ধীজীর উপরও তারা যেন আস্থা হারাইয়াছেন।

সামান্য কয়টি বৎসর। কিন্তু এরই মধ্যে জাতির দেহে কী বিষেরই না সঞ্চার হইল। সঞ্চার করিল, অলক্ষ্য এক নিপুণ হস্ত।

শঙ্কর ভাবে, জাতির নেতাদের কি এতে কোন দায়িত্ব নাই? তারা ঠিক পথে চালিত করিতে পারিলে এটা কি সম্ভব হইত?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে নিরাশ হয়। তখন তাঁকে উৎসাহ যোগায় বিষ্ণু! সে বলে, ভয় কি ভাই? এ পথে অনেক বাধা আসবে। সেগুলো আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। কবি তাই বলেছেন,—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে............

তের

একদিন দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথের তিনি বিশেষ পরিচিত। শুধু পরিচিত নন, জটিল মামলা সম্পর্কে অনেক সময় তিনি তাঁর পরামর্শ নেন। তিনি শঙ্করকে কহিলেন, আপনি ইউনিভার্সিটির জুয়েল। দেশ আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করে।

শঙ্কর বলে, কি রকম ?

ইচ্ছে করলে আপনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এমন কি আই, সি, এস হতে পারতেন।

সেটা কি এমন বড় কথা ?

বড় নয় ! বলেন কি ? তবে সরকারী চাকরি না করতে চান একটা নামজাদা উকিল কি ব্যারিষ্টার হোন। তখন কংগ্রেসে গেলেই একেবারে লিডার। খালি ত্যাগ দিয়ে, চরিত্র দিয়ে টপে (Top) যাওয়ার আশা এ দেশে অন্ততঃ কম—বলিয়াই দারোগা মৃদু মৃদু হাসিতে থাকেন।

শঙ্কর বলে, লিডারশিপের ও-রাস্তা আমার জন্য নয়।

দারোগা পিতৃবন্ধুর মতন উপদেশ দেন কিন্তু উপরে রিপোর্ট করেন বিপরীত। তাঁরও ত ভবিষ্যৎ আছে। ছেলেকে তিনি দারোগা করার আশা রাখেন।

চারিদিকে অভাব, অনটন। হাহাকার। জিনিস সব অগ্নিমূল্য।

এই সময় বঙ্কিম কুণ্ডু খুচরা মদ বেচার লাইসেন্স আনাইয়া দুই আনা করিয়া এক এক ভাঁড় মদ বেচিতে শুরু করে।

সস্তা নেশার প্রলোভন দলে দলে লোককে শুঁড়ীখানায় টানিয়া আনে। তার মধ্যে চাষীই বেশি। প্রথম ভাঁড় খাইয়া একটু রঙিন ভাব হইলে তারা আর এক ভাঁড় খায়। রং আরও চড়ে, এক একটা পিছল ধাপ লোককে তার নীচের ধাপে টানিয়া নেয়। বাড়ে দিন-মজুরের দুর্দশা, ফৌজদারী মামলা, মাথা ফাটাফাটি, লাম্পট্য।

শঙ্কর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে লিখিয়া পাঠায়। তাঁরা স্থানীয় অবস্থা বিচার করিয়া তাকেই কর্তব্য নির্ধারণের নির্দেশ দেন।

স্বেচ্ছাসেবীরা দোকানে পিকেটিং করে না বটে কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া মদের অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। বুঝাইয়া শুনাইয়া মদ্যপদের ফিরাইবার চেষ্টা পায়। কেহ ফেরে, কেহ তর্ক করে, কেহবা রাগিয়া যায়। বলে, ধুত্তোর স্বদেশী। নিজের পয়সায় একটু নেশা করব ত' তোরগো কি ?

কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম এতদিন উদাসীন ছিল। স্বার্থে আঘাত লাগায় সে এবার বিরোধিতা সুরু করিল। স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলে বটে কিন্তু মাতালের গালাগালির পিছনে থাকে তার ইঙ্গিত। গুণ্ডার দলকে সে বিনা পয়সায় মদ খাওয়ায়, নগদও কিছু কিছু দেয়।

একদিন শঙ্কর মদের অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিল। এই সময় বড় একটা ঢিল আসিয়া পড়ে তার নাকের উপর। প্রচুর রক্তস্রাব হয়। কর্মীরা বলে, আজ আর কুরপালায় গিয়ে কাজ নেই। চলুন আপনাকে বাড়ী রেখে আসি।

শঙ্কর সম্মত হয় না। কুরপালায় তার অনেক কাজ।

বেশী রাত্রে নারায়ণ রাণীডাঙ্গা হইতে রঞ্জিত ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। রঞ্জিত তাদের গ্রামের লোক, রাণীডাঙ্গার প্রথম এম, বি। পাশ করিয়া কিছুদিন হইল প্রাক্‌টিস শুরু করিয়াছে। শঙ্করের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। ঘরে ঢুকিয়াই সে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল, মদের সঙ্গে অসহযোগ করতে বলায় মাতালরা আমার সঙ্গে একটু বেশী সহযোগ করে ফেলেছে।

সে ত' শুনেছি। এখন আছ কেমন?

রক্তটা অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল, আবার পড়ছে। মাথায়ও যন্ত্রণা আছে, তাই আপনাকে ডেকেছি।

রঞ্জিত পরীক্ষা করিয়া ইনজেক্‌সন দিল। একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া বলিল, তোমার সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার।

শঙ্কর বলিল, বিশ্রামের ব্যবস্থা ভগবানই করে দিয়েছেন। যাক, বাবা ব্লাডপ্রেসারের রোগী। দেখা হ'লে তাঁকে বলবেন যে আমার জন্য ভাবনার কোন কারণ নাই।

রঞ্জিত বলিল, নিশ্চয়। আমি ভোরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

কিন্তু সে দেখা করার আগেই বিশ্বনাথ ও সরোজদেবী কুরপালায় আসিয়া উপস্থিত হন।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা ছড়াইয়া পড়ে। ভিড় বাড়িতে থাকে। লোকে বলে, আহা এমন মানুষকেও হিংসা করল।

একদল খেপিয়া যায়। বলে, গোল্লায় যাউক অহিংসা। আজ্ঞা করুন দাদাবাবু, একেবারে গোড়ার থা মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া আনি। শঙ্কর অতি কষ্টে তাদের ঠাণ্ডা করে।

ডাক্তার বলে, এসব স্ট্রেন (strain) তোমার সহ্য হবে না শঙ্কর। তুমি শুধু শুধু বিপদ ডেকে আনছ।

শঙ্কর উত্তর করিল, কিন্তু এরা খেপলেও বিপদ আমার কম নয়।

কর্মীদের ইচ্ছা ছিল কংগ্রেসের কাজ আজ বন্ধ রাখে। কিন্তু শঙ্কর আপত্তি করিল। কহিল, না, আমি শুয়ে শুয়ে দেখতে চাই তোমরা কেমন কাজ কর।

দাদাবাবুকে খুশি করার জন্য সকলেই উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া যায়। চরকার ঘর্ঘর, তাঁত ও তুলা পেঁজার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চলে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গুঞ্জন। সব ছাপাইয়া ওঠে রাণী-ডাঙ্গার বিষ্ণু চাটুয্যের কণ্ঠস্বর। সে ছেলেদের পড়ায়, আই মেট এ ল্যেম ম্যান.আই মানে আমি।

মেট্ মানে—গোলমাল করনা ছোকরা। পিছনে তুমি আদমের ছেলে না? করমচা নয় একটু পরেই খেলে।

একটি মনোযোগী ছাত্র আওড়াইতে থাকে, মেট্ মানে, গোলমাল করনা ছোকরা।

বিষ্ণু বলে, ও কি বলছ সরফরাজ? মেট্—সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম অর্থাৎ দেখা পাইয়াছিলাম। লতিফ মিয়া মাছটা কিনলে কত দিয়ে? বার···আ···না। কুরপালা দেখছি কলকাতা হয়ে চলল।

এ অর্থাৎ একটি, ল্যেম মানে খোঁড়া। ডাবটা পেলে কোথায় বোষ্টমি?

শোনা যায় পদ্মের কণ্ঠস্বর, দাদাবাবুর জন্য নিয়া আইলাম।

বিষ্ণু বলে, সে ত' বুঝলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ যে?

পদ্মের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হাস্ত আগাইয়া আসে। দাদাবাবুর জন্য পদ্ম ডাব আনায় সে ভারি খুশি। তা ছাড়া দেখাও তাদের বহুদিন পরে। হাস্ত বলিল, ভাগ্যিস তবু মনে পড়ছে।

জানইত ভাই। আসার জো নাই। আগ্ন দাদাবাবুর কথা শুনিয়া ডাব দুটা নিয়া আইলাম। আর তোমার জন্য—বলিয়া পদ্ম একটা বোঁচকা হইতে কতগুলি কাঁটা ফল ও চারখানা মালপোয়া বাহির করিয়া দেয়।

হাস্ত জিজ্ঞাসা করে, ভোগ ছিল বুঝি?

হ।

পদ্মদের আখড়ায় মধ্যে মধ্যে উৎসব হয়। কখনও ভোগ দেওয়া হয় মালপোয়ার, কখনও খিচুড়ির।

উত্তেজিত মানুষদের থামাইতে গিয়া শঙ্কর বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

সরোজ তার মাথার ধারে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছিলেন। শঙ্কর এক একবার তার আঙুল টানে, কখনও নখ খোঁটে, কখনও বা আঙুল মটকাইয়া দেয়। সরোজ বলেন, উঃ, তোর সেই ছেলেমানষি আজও গেল না।

পদ্মকে সঙ্গে লইয়া হাস্ত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পদ্ম তোমার জন্য ডাব, মালপোয়া আরও কত কি লইয়া আইছে দাদাবাবু। কাল রাত্তিরে কীর্তন হইছিল।

শঙ্কর কহিল, ঐজন্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বৈষ্ণব হয়ে যাই।

পদ্ম বলে, ঠাকুর না টানলে তোমার সাধ্য কি দাদাবাবু?

ঐটেই খাঁটী কথা। মানুষ বড় দুর্বল। নিজের শক্তিতে কোন কিছু করার সাধ্য তার নেই—শঙ্করের কণ্ঠে ছিল অবসাদের ভাব।

ধীরে ধীরে তার চোখ বুজিয়া আসে। সরোজ বসিয়া হাওয়া করেন। কখনও গায়ে হাত বুলান। খানিকটা পরে হাস্থ আসিয়া তাঁকে বলে, বেলা হৈয়া গেল। আপনার উনানে এবার আগুন দি?

না, দরকার নেই। আমি জলটল খেয়ে থাকব'খন।

তা হয়না মা। ছোট রাজার শরীর গতিক ভাল না। তুমিই বা জল খাইয়া থাকবা কয়দিন?

নারায়ণের ভিটায় রান্নার ব্যবস্থা আছে। স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া পনর ষোল জন লোক খায়। স্বেচ্ছাসেবীরা পালা করিয়া রান্না করে। তাদের সাহায্য করে হাস্থ। দুজনে হাস্থের তোলা জল খায় না। রাণীডাঙ্গায় খাইয়া আসে।

বিষ্ণুর বৈমাত্রেয় ভাই হারাণ সরোজ দেবীর জল তুলিয়া দিল। হাস্থ উনান ধরাইল। সরোজ কহিলেন, মসলা আমি পিষে নেব 'খন।

হাস্থ মসলার চুবড়ি হইতে জিরা ও হলুদ তুলিয়া দেয়। সরোজকে বলে, লঙ্কা ও মরিচ আপনি তুলিয়া নেও মা। (লঙ্কাকে তারা বলে মরিচ)।

লঙ্কা ও লবণ যে হাতে হাতে দিতে নাই এই চাষীর মেয়ে তাহাও জানে দেখিয়া সরোজ বড় খুশি হন। তার চিবুক ধরিয়া বলেন, মা যেন আমার লক্ষ্মীটি।

খানিকক্ষণ পরে বাহিরে কলরব ওঠে। বিষ্ণুর কণ্ঠই তার মধ্যে জোরালো। কে আর একজন বলিতেছে বাবুর যে অসুখ তা আমি জানিনা ত জানে কেডা? আইছি ত সেইজন্য।

তুমি ত ভারি অবুঝ। বলছি দেখা হবে না তবু জিদ করবে—বিষ্ণুর কণ্ঠস্বর।

একটিবার দেখা আমি চাই-ই। তানার ছিরিচরণ দর্শন না করিয়া ফেরব না।

বিষ্ণু বলে, তুমি ত নাছোড়বান্দা কম নও। ভারী Adamantine. পড়েছিলুম একবার তোমার মতন একজনের পাল্লায়। শোন নাড়ু, নৌকো করে যাচ্ছি টাউন ন' পাড়ায়। রূপসা থেকে পড়েছি নারাণ খালিতে।

শঙ্কর সরোজ দেবীকে বলিল, মা নারাণকে বল লোকটিকে ভিতরে নিয়ে আসতে।

নারায়ণের সঙ্গে ঢোকে জামুলার নিধিরাজ। সে কুরপালারই লোক। তুলসী বরদার জ্ঞাতি। রামেন্দ্রের জমি দখল করিতে যাইয়া এক বিদ্রোহী প্রজাকে সে খুন করে। সঙ্গে সঙ্গেই ফেরার হয়। তার কিছুদিন পর হইতে জামুলার শ্বশুর বাড়ীতে আছে। রামেন্দ্র রায় মোটা রকমের কিছু খরচা করায় পুলিসও আর নিধিরাজের খোঁজ করে নাই।

তার চেহারার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ছিল মোটাসোটা মানুষটি, ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটিত। বর্তমানে অনেক কৃশ দেখায়। আগের চেয়ে গায়ের রং কালো হইয়াছে। সামনের দিকে পড়িয়াছে টাক। পিছনে ও কানের পাশে কতগুলি কাঁচা-পাকা চুল।

বিশ্বনাথ প্রথমে তাকে চিনিতে পারেন নাই। একটু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, নিধে না? ব্যাপার কি, তুই যে অসময়ে?

হ ছোট রাজা। আমিই আপনারগো নিধি—বলিয়া নিধিরাজ কাঁদিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, ছিঃ অমন করতে নেই।

নিধিরাজ আরও জোরে কাঁদিয়া ওঠে। একটু পরে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া বলে, আপনার ছাওয়াল একটা দেবতা। শাপভ্রষ্ট দেবতা।

শঙ্কর বলে, তা বেশ। তুমি একটু শান্ত হও দেখি।

নিধিরাজ জিজ্ঞাসা করে, ভিড়ের মধ্যে তুমি আমারে ঠাহর করছিলা? তাই না দাদাবাবু?

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ।

নিধিরাজ এবার চেঁচাইয়া উঠিল, সাধে কি কই তুমি .দেবতা, দেবাংশ!

শঙ্কর বলে, আঃ চুপ কর ভাই।

নিধিরাজ বাধা মানে না। বিশ্বনাথকে বলে, এই হাত দিয়া ক[illegible] টিল ছোড়লাম ছোট রাজা। এই বাম [illegible]। আপনারা ত জানই নিধির বাম হস্তের জোর। তোমার ছাওয়ালের সঙ্গে চোখাচোখি হৈয়া গেল। উনি কেওরে কইল না। কইলে স্বদেশীরা আমার হাড় গুঁড়াইয়া দিত।

একটু থামিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, যে হস্ত রায়েরগো জন্য অনেক রুধির পাত করাইছে, সেই হস্তই আপনার ছাওয়ালের নাসিকা ফাটাইল। ওজনের দাড়িপাল্লাডা ধাতা পুরুষ ঠিকই রাখছে।

সরোজ পরম স্নেহভরে পুত্রের দিকে চাহিয়া তারপর নিধিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কাজ তুমি করলে কেন?

লোভ মা, লোভ—মানষের বড় রিপু। নেশার লোভ দেখাইল।

তার উপর নগদও কিছু দিল—বলিয়া নিধিরাজ মাটিতে দাগ কাটিয়া নাকে খত দিতে আরম্ভ করিলে শঙ্কর তার হাত ধরিল।

আমার পাপ পেক্ষালন করতে দাও, দাদাবাবু। বিঘ্ন হইও না।

শঙ্কর তাকে ঠাণ্ডা করে। নিধিরাজ বিশ্বনাথের পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, নেশা আর করব না ছোট রাজা। আপনার পা ছুঁইয়া কইলাম।

সরোজ বলিলেন, কে তোমায় পয়সা দিয়েছে, লোভ দেখিয়েছে?

সে আর না শোনলেন ছোটরাণী। বিশ্বাসের ঘাতকতা করিয়া পাপ আর বাড়াইতে চাই না।

বিশ্বনাথ কহিলেন, এখন বাইরে গিয়ে বস। শঙ্করের শরীর খারাপ।

যাইতেছি হুজুর। ওনার জন্য আমার ব্রেক্ষের দুইটা পাকা গাব আনছিলাম। আর আনছি হাটেরথা এট্টু দুধ। ওনারে গাব আর দুধ দেন।

বাহিরে যাওয়ার আগে নিধিরাজ শঙ্করকে বলিল, বাড়ী আর ফেরব না। এখানে পড়িয়া থাকব মহতের ছাওয়ায়। বটব্রেক্ষের [illegible] যেমন থাকে পথিক।

বৈকালে শঙ্করের অজ্ঞাতেই নারায়ণের দল পিকেটিং করিতে গেল। সঙ্গে গেল নিধিরাজ। তারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল, মার খাইবে তবু মারিবে না। এমন কি রাগতভাবে একটা কথা পর্যন্ত উচ্চারণ করিবে না।

হাট হইতে রাণীর দীঘির দিকে একটা রাস্তা গিয়াছে। এই পথ দিয়া ফনিমনসা হরিচট্ট প্রভৃতি অনেক গ্রামের লোক যাতায়াত করে। হাটবাজার ও স্কুল করিতে আসে।

ঘাটের পুবে পথের উপর বড় একটা বট গাছ। তার নীচে উত্তর দিকে বঙ্কিমের মদের দোকান। প্রায় দু' বছর হইল সে এই দোকানের লাইসেন্স নিয়াছে। লোকে বলে, ঐ শুঁড়ীখানা চালু করার জন্যই সে মেলা বসাইয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবীদের একদল দাঁড়াইল বট গাছের পশ্চিমে আর একদল খানিকটা পুবে—রাণীর দীঘির উঁচু পাড় ও রাস্তার সংযোগ স্থলে। রাস্তা হইতে শুঁড়ীখানার দিকে কাহাকেও যাইতে দেখিলেই স্বেচ্ছাসেবীরা হাতজোড় করিয়া আগাইয়া যায়, বলে, গান্ধীরাজা কইছেন, সি, আর, দাস মানা করিয়া গেছেন, ওদিকে আর যাইও না।

উৎসাহ নিধিরাজেরই বেশী। সে বলে, আমি কালও মাতাল ছিলাম। শঙ্কর দাদাবাবুর মাথা ফাটাইছি। পুরান মাতাল হৈয়া আমি কইতেছি ও বিষ ছুঁইস নারে, ছুঁইস না।

কেহ কথা শোনে। কেহ শোনে না। কেহ বলে, তুমি কাল খাইয়া আজ ছাড়ছ। আমরা আজ খাইয়া লই, কাল হইতে ছাড়ব।

নিধিরাজ বলে, তা হয় না। যে ছাড়ে সে কাল পরশুর পরোয়া করে না।

স্বেচ্ছাসেবীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কোন মুহূর্তে বঙ্কিমের লোক আসিয়া চড়াও হইবে। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ ইন্দুপ্রকাশ আসিতেছেন। গায়ে নামাবলী, পায়ে খড়ম, পরিধানে শুভ্রবাস, মাথায় কাশগুচ্ছের মতন সাদা চুলের গোছা। উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট, গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় এই ব্রাহ্মণ যেন ভারতীয় কৃষ্টির প্রতীক।

তাঁকে দেখিয়া তরুণদের উৎসাহ বাড়ে, তারা বলে, বন্দে-মাতরং। মহাত্মা গান্ধী কি জয়। ইন্দুপ্রকাশ বলেন, বন্দে-মাতরং।

শীতল চক্রবর্তী ঘোড়ায় চড়িয়া রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, একী, আপনি এখানে? এদের সাবধান করতে এসেছেন বুঝি?

না ভাই। শঙ্করের রক্ত দেখে স্থির থাকতে পারিনি। কালই এস, ডি, ওর কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছি।

শীতল ঘোড়া হইতে নামিয়া ইন্দুপ্রকাশের কানের কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া বলেন, লাঠি সোটা চলবে। এ বয়সে তা সহ্য হবে না দাদা। আমার ছেলেটাও আসছিল। আমি তাকে নিষেধ করলুম।

ইন্দুপ্রকাশ হাসিয়া বলেন, কিন্তু আমার যে ফেরার উপায় নেই ভাই।

শীতল আবার ঘোড়ায় উঠিয়া রওনা হন।

পরের দিন রাণীডাঙ্গার আরও অনেকে আসেন। বেশীর ভাগই তরুণ। বিরোধিদের ও বিশ্বিমের লোকের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

তিন চার দিন পরে বিশ্বনাথের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইলে সরোজ ভয় পাইয়া গেলেন। শঙ্করকে বলিলেন, তুইত সেরে উঠছিস। এখানে এই ভিড়ের মধ্যে ওঁর শরীর খারাপ হবে। তাই ভাবছিলাম রাণীডাঙ্গায় চলে যাই।

শঙ্কর হাসিয়া বলে, আমি একমাত্র ছেলে হলে হয় কি? মায়ের আমার বাবার জন্য ভাবনা বেশী।

সরোজ কহিলেন তুই বড় বাজে বকিস শঙ্কর।

সামনে ছিলেন ইন্দুপ্রকাশ। শঙ্কর তাঁকে শুনাইয়া কহিল, এ নিয়ে

অনুযোগ করলেই মা বলেন, তোরা হলি নদীর ছুটো পার। মা নিজে নদী। আমরা দুজন ছুটো পার। বুঝলেন দাদু?

সরোজ ইন্দুপ্রকাশকে আগে লক্ষ্য করেন নাই। তাঁকে দেখিয়াই ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চৌদ্দ

বঙ্কিম কুণ্ডু বীরেনকে বলিল, কুরপালা তুমি আমায় ছেড়ে দাও। ওদের আমি কিছু শিক্ষা দিতে চাই। ইদানীং ওরা বড় বেড়ে উঠেছে।

বীরেনের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। বিষয় আশয় একে একে সবই গিয়াছে। যে দু'একটা তালুক মৌজা আছে তার মধ্যে কুরপালার আয়ই সবচেয়ে বেশী। সেখানে প্রজাদের কাছে ভাল সেলামি ও নজরানা পাওয়া যায়। বছরে তারা দু'একদিন বেগারও খাটিয়া দেয়। দেখা হইলে "রাজা" "হুজুর" বলিয়া সম্বোধন করে।

বীরেনের মুখের ভাব দেখিয়া বঙ্কিম কহিল, রাণীডাঙ্গা, বলতলি, কাকডাঙ্গা এসবত রইলই বাবাজী।

বীরেন বলিল, আচ্ছা দেখি।

মোল্লার ভিটার দুর্ঘটনার পর হইতে সেই বিষয় সম্পত্তি দেখে। রামেন্দ্রের দেখিবার ক্ষমতা নাই। সারিয়া উঠিয়াছেন বটে কিন্তু কর্মশক্তি আর ফিরিয়া পান নাই। শরীর জীর্ণ, বসিয়া বসিয়া তামাক টানেন, আর আকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবেন। শুধু টাকা-পয়সার নয়, অতীত জীবনের সমস্ত জমা খরচার হিসাব করেন।

বীরেন অনেক সময়ই সর্ব্বদমনের পরামর্শ নেয়। এই ব্যাপারেও সে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি করি বলত' চোবে ?

সর্ব্বদমন তার নিজস্ব বাংলায় বলিল, ঘুমাইতে থাকো। বীরেন কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল না। বলিল, তার মানে ?

আজকাল করকে তারিখ লাগাও।

বীরেন বঙ্কিমকে "না" বলেনা। কিন্তু কুরপালা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাও করে না।

মামলা মকদ্দমায় শুধু শুধু অর্থব্যয় ও অসন্তোষের সৃষ্টি। বীরেন আদালত হইতে কিছু সময়ও পাইবে। অথচ যত সত্বর সম্ভব কুরপালা তার চাই-ই। দেরি আর চলে না। এইসব সাত-পাঁচ ভাবিয়া বঙ্কিম শেষটায় কথাটা জাহ্নবীর কানে তুলিল। একদিন রামেন্দ্রের ঘরে বসিয়া তাঁর দাসী ময়নার মাকে বলিল, বৌদিকে ডেকে দাও ত'। বল, আমার একটু কথা আছে। তিনি দরজার আড়াল থেকে শুনুন।

ময়নার মা বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিল। রামেন্দ্র বলিলেন, বীরেনের মার সঙ্গে তোমার কি কথা ?

বঙ্কিম বলিল, কুরপালার সম্পর্কে।

রামেন্দ্র বলিল, ওঃ, কুরপালা তুমি চাও বুঝি ? তাহ'লে ত' ওঁকে একবার ডাকতেই হয়। ময়নার মা, তোমাদের মা ঠাকরুনকে একবার ডেকে দাও। বলবে, আমি ডাকছি।

জাহ্নবী আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইলে দাসীকে মধ্যবর্তিনী রাখিয়া বঙ্কিম বলিল, দাদাকে অবশ্য আগেই বলেছি। আপনাকেও জানানো দরকার। দয়া করে কুরপালা আমাকে ছেড়ে দিন।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরেনকে বলেছেন ?

হ্যাঁ। সে ঠিক স্থির করে উঠতে পারছে না। আজকাল করে ঘোরাচ্ছে।

বেশ, আমি তাকে আজই বলে দেব।

রামেন্দ্র বলিলেন, হ্যাঁ, দিও বলে।

বঙ্কিম বলিল, আমিও বলছি, দাদা ও আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন রাণীডাঙ্গা, বলতলি, কাকডাঙ্গা আমি চাইব না। কুরপালাও আপনাদেরই থাকবে। তবে কাগজে পত্তরে ওটা এখন আমার দখলে আনা দরকার হয়ে পড়েছে।

পাওনাদারের এই সব আশ্বাসের মূল্য জাহ্নবী জানিতেন। তালপুকুর নিলামে তুলিয়াও বঙ্কিম এই কথাই বলিয়াছিল—কুরপালা, রাণীডাঙ্গা কখনও চাইব না, শপথ করে বলতে পারি।

জাহ্নবী বলিলেন, আপনি বলেই আমাদের সময় দিচ্ছেন। অন্য পাওনাদার হলে কবে সব গ্রাস করত।

তা নয় রাণীমা, তা নয়—বঙ্কিম স্থিরমস্তিষ্ক লোক, উচ্ছ্বাসের ধার ধারে না। কিন্তু আজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই বলিল, রাণীমা। বহুদিন পরে আবার এই সম্বোধন। বিশ পঁচিশ বৎসর আগে রামেন্দ্রকে সে বলিত, 'বড় রাজা'। জাহ্নবীকে রাণীমা।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন ভোরে নৌকা করিয়া সাগর-দীঘির সাব-রেজিষ্ট্রার আসিলেন। রামেন্দ্র বঙ্কিমকে কুরপালা লিখিয়া দিলেন। সাব-রেজিষ্ট্রারকে কহিলেন, দেখুন ত' সইটা ঠিক আছে কিনা। আজকাল আমার হাত বড় কাঁপে।

সাক্ষী হিসাবে দলিলে স্বাক্ষর করিলেন জাহ্নবী, বীরেন এবং শীতল ডাক্তার।

সাব-রেজিষ্ট্রার বঙ্কিমের বাড়ী ভুরি ভোজন করিলেন। তিনি বিদায় নেওয়ার সময় বঙ্কিম বলিল, আপনাকে বড় কষ্ট দিলুম। আপনার পাথেয় বাবদ সামান্য কিছু নিয়ে যান। তা'ছাড়া ভোজন-দক্ষিণাটাও বাকী আছে।

এত আমার কর্তব্য, ড্যুটি। এর জন্য আবার টাকা কেন?—মুখে এই কথা বলিলেও সাব-রেজিষ্ট্রার বাঁ হাতখানা বঙ্কিমের দিকে একটু বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিম তার হাতে পঁচিশটি টাকা গুঁজিয়া দিল।

সাব-রেজিষ্ট্রার বলিলেন, মাফ করবেন। এ সব টাকা আমি বাঁ হাত দিয়েই নেই। গুরুর আদেশ।

সাব-রেজিষ্ট্রার চলিয়া যাওয়ার পর ঘটনাটা জানাজানি হওয়ায় রায়বাড়ীতে যেন বিষাদের ছায়া নামিল। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদটা রাণীডাঙ্গায় ছড়াইয়া পড়িল। বৈকালে কুরপালার প্রজারাও জানিতে পারিল। তারা আপসোস করিতে লাগিল, এতদিন ছিলাম রাজার প্রজা। এখন হইলাম মুদীর।

অজু আক্ষেপ করিয়া পদ্মকে বলিল, তখন কত কইলাম যে ভিটাটা আর তিন চার বিঘা জমি লাখেরাজ লেখাইয়া নে। তা কিছুতেই নিলি না।

ব্যাপারটা এই, প্রকৃত আভিজাত্যের যে সুষমা থাকে দারিদ্র্যের মধ্যেও রায়েদের সেটুকু বজায় ছিল। বীরেন কর্তা হইবার পর উহা একেবারেই লোপ পায়।

রায়েরা কখনও প্রজার বাড়ী যাইতেন না। বীরেন খাজনার জন্য বাড়ী বাড়ী যায়, গল্প গুজব করে, হাতের তালুতে কলিকা নিয়া তামাক টানে। একদিন অজু বৈরাগী বলিল, সাহস করিয়া একটা কথা কব?

বীরেন বলিল, কি?

আপনার চোখ দেইখ্যা মনে হয় একটু ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার অভ্যাস আছে।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা! গাঁজা? শব্দটার অর্থ বীরেন জানিত। অশিক্ষিত বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়া বিস্মিত হইল। তার ধৃষ্টতায় একটু রাগও করিল।

কিন্তু সেই হইতে প্রায়ই সে অজুর বাড়ীতে যাইয়া গাঁজা টানিত। পদ্মের সঙ্গে রসিকতা করিবার চেষ্টা পাইত। পদ্ম কাছে ঘেঁষিত না।

জমিদারের ছেলে বলিয়া গাঁজারুরা প্রথমে তাকে বেশ খাতির করে। ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাতির কমিতে থাকে। আরম্ভ হয় প্রচ্ছন্ন পরিহাস। অজু বলিত, আপনি ত' এই আখড়ার মোহান্ত।

সে প্রায়ই তার নিকট হইতে টাকাটা সিকিটা ধার বলিয়া চাহিয়া লইত। একদিন সে পদ্মকে বলিল, তোর দিকে বীরেনবাবুর একটু নজর পড়ছে। এই ফাঁকে আখেরের সুবিধা করিয়া নে।

পদ্ম বলে, এ কও কি তুমি?

কব আর কি? অরগো জমিদারি আর বেশীদিন থাকবে না। এই সময় ভিটাটা আর তিন চার বিঘা জমি লাখেরাজ লেখাইয়া নে। বৈষ্ণবরে দিয়া অরাও কিছু পুণ্য সঞ্চয় করুক।

সেইদিনই পদ্ম বীরেনকে বলে, আপনি আর এখানে আসবেন না।

বীরেন প্রশ্ন করে, কেন বল দেখি?

আপনার বিপদ হইতে পারে। অরা আপনারে সন্দ করে।

সন্দেহ! কে অজু?

পদ্ম মাথা নাড়াইয়া জানায়, হ্যাঁ।

বীরেন ভয় পাইয়া যায়। এরই কয়দিন আগে অজু তার সামনে

গলা টিপিয়া একটা বিড়ালকে মারিয়া ফেলে। তার তখনকার সেই হিংস্র দৃষ্টি বীরেন আজও ভুলিতে পারে নাই।

তার যাওয়া আসা বন্ধ হয়।

দুই-তিন দিন পরে অজু পদ্মকে জিজ্ঞাসা করে, তুই বুঝি বীরেন-বাবুরে আসতে মানা করিয়া দিছ?

পদ্ম উত্তর করে, হ।

যেমন বুদ্ধি! মাথায় যদি তোর একটুও ঘিলু থাকত—বলিয়া অজু কুৎসিত মুখভঙ্গী করে।

৬

কুরপালার নতুন জমিদার বঙ্কিম কুণ্ডু প্রজাদের ডাকিয়া পাঠায়। রূপমতীর তীরে যাদের বাড়ী কিংবা জমি আছে প্রথমেই তাদের ডাক পড়ে। প্রত্যেকে সাধ্যমত দু'একটাকা নজরানা দেয়। অজু বৈরাগী হাস্তের নামে একটি টাকা জমা দিলে বঙ্কিম বলিল, অগুর বৌ কোথায়?

সে লজ্জায় আইল না, আমারে দিয়া হুজুরের নজর পাঠাইয়া দিল।

ধীরাজ উপস্থিত ছিল। সে টিপ্পনী করে, কংগ্রেস করার সময় ত' লজ্জা থাকে না। যত লজ্জা জমিদার বাড়ী আসতে।

হাস্তের নজরানা বঙ্কিমের সেরেস্তায় জমা হয়। কিন্তু অজুর টাকা সে গ্রহণ করে না। বলে, পুরানো জমিদারদের সেরেস্তায় তোমার নাম পত্তন নেই। তোমায় আমি প্রজা বলে স্বীকার করতে পারি না।

অজু বলে, গদাধর মালো আমারে দিয়া গেছিল।

বঙ্কিম বলিল, মনিবের হুকুম ছাড়া দান বিক্রির ত' তার কোন ক্ষমতা ছিল না।

আমরা ঘোটন মানুষ। অনেকদিন আপনার আশ্রয়ে আখড়া বাঁধিয়া আছি।

আচ্ছা তোমার বিষয় পরে যা হয় হবে—তারপরই এরফানের দিকে চাহিয়া বঙ্কিম বলিল, কারিকর সাহেব ত' এখন মাতব্বর হয়েছ। তোমায় কুরপালার একটা মাথা বললেও চলে।

এরফান খুশি হইয়া বলে, আল্লার দোয়ায় আর আপনকার মা বাপের আশীর্বাদে পাঁচজনে এখন মানতে শুরু করছে। দেখলেই কয়, সেলাম আলেকুম, বড় মিয়া।

ভাল ভাল। আর এক কলকে তামাক খাও।

এরফান কলিকায় সুখটান দিতেছে এমন সময় বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কাছে আমার পাওনা হ'ল কত?

খানিকটা ধোঁয়া এরফানের গলায় আটকাইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন খাতে?

দোকান বাকীর কথা এখন থাক্। সে ত' সবে এই দু'মাস হ'ল নিতে আরম্ভ করেছ।

এরফান উত্তর করে, বিলাত-বাকীত' আপনিই বন্ধ করছিলা।

সে যাক্। আমি বলছিলাম সুদী টাকার কথা। এরফান বলিল, দোকান বাকির টাকাও ত' সেই খাতে ঢোকা হইছে।

তা হ'য়েছিল। তবে নগদই ছিল একশ টাকা। দোকানের দরুন ছিল আগের মাত্র গোটা পঞ্চাশেক।

এরফান জিজ্ঞাসা করে, এখন মোট দাঁড়াইছেন কত?

তিনশ ছত্রিশ টাকা বার আনা।

ওঃ আল্লা। তার থা মাথায় একটা বাড়ি দেও তুমি।

বঙ্কিমের কর্মচারী কালীপদ বলিল, নেওয়ার সময়ত' মনে ছিল না, মিয়া সাব।

তুমি থামা কর দেখি—এরফান তারপরে বঙ্কিমের দিকে চাহিয়া বলে, এই যে কয় কিস্তি উসুল করলাম।

বঙ্কিম বলিল, গেল বছর দিয়েছ কুড়িটাকা, তার আগের সনে যোল টাকা ছয় আনা। আর কোরফানের মুনিষ খাটার দরুন ছ' টাকা। এবার ত' মাত্র পাঁচটি টাকা ছুঁইয়েছ।

দেড়শ টাকার খত। দিলাম ছয়কুড়ি, আটকুড়ি। এখনও সাড়ে তিনশ' টাকা বাকী?

বঙ্কিম বলে, ছ'কুড়ি, আটকুড়ি দেও নি। দিয়েছ আড়াই কুড়িরও কম। যাক্ সান্যাল মশাই হিসেবটা ওকে একবার বুঝিয়ে দিন।

বৃদ্ধ সান্যাল সুদী কারবারের হিসাব রাখেন। নাকে চশমা লাগাইতে লাগাইতে তিনি বলিলেন, কর্তার কথনও ভুল হয় না। স্মরণশক্তি ওঁর অদ্ভুত। ব্যাস বশিষ্ঠের মতন। তবে যথন চাইছ, হিসেবটা একবার শুনে নাও।

এরফান বলে, তা জানি। হিসাব ওনার ওষ্ঠের ডগায় বাস করেন।

সাধে কি বড় হয়েছেন—বলিয়া সান্যাল হিসাব বুঝাইতে আরম্ভ করেন। চক্রবৃদ্ধ হারে সুদের হিসাব। দুইছত্র শুনিয়া এরফান গলদ্‌ঘর্ম হইয়া ওঠে। বলে, খাতার হিসেব খাতায় থাকুন। আপনার মতলবখানা কি কও দেখি, কুণ্ডুরপো?

বঙ্কিম বলিল, মতলব আবার কি? আমার পাওনা টাকা আমি চাই।

আকালী বলে, আস্তে আস্তে নেও। বিধাতা আপনারে অঢেল দিছে।

এরফান বলিল, গ্রামের লোক, গ্রামেই বাস্তব্য করি। এথন আবার প্রজা হইনাম। টাকা আপনার উসুল হবেই।

তা' জানি কিন্তু এখন যে আমার টাকার দরকার। একটা কল করব ভাবছি।

এরফান বলিল, আপনে কল করবা, সে ত' তাজ্জব ব্যাপার। আমার এই কয়টা টাকায় আর তোমার কি হবে?

রাই কুড়িয়েই বেল হয়। শুধু তোমার কাছে নয়, চাইছি সবাইর কাছে।

সকলেই বিপদ গনে। আকালী বলে, আমার কাছের পাওনা আইসে মাসে উসুল করব।

বঙ্কিম টাকা চায় না। চায় জমি। আকালীর কথা তার মনঃপূত হয় না।

এরফান বলে, আমার হাতে ত' এখন কিছু নাই হুজুর।

বেশ, একটা কাজ কর। রূপমতীর ধারের জমি ক'বিঘে আমায় ছেড়ে দাও। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ওইখানে কল ক'রতে বলেছেন।

আদম বলে, ধীরাজ দাস সেদিন কইছিল, দ্যাশের ভালর জন্য তুমি কল করবা। এর মধ্যে আবার পুলিস মাজেষ্টর কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

আদম বলে, তাও ঠিক, অত সুক্ষ্ম বোঝলে কি আর পথের ক্যাদা হইয়া পড়িয়া থাকি? আপনকার মতন দাঁড়ি-পাল্লার—

কি যে বল মিয়াসাব—বলিয়া এরফান তাকে থামাইয়া দেয়।

বঙ্কিমের ভাবটা এমন যেন সে কিছু শুনিতে পায় নাই। সে এরফানকে বলিল, জমিটা ছেড়ে দিলে টাকাত' উসুল হবেই, নগদও কিছু পাবে।

কিন্তু ঐ জমি আমার গো জান পরান, আমার গো কৈলজা। ঐ মাটির উপর ছাও পোনারগো বাঁচা-মরা নির্ভর—কথা কয়টিতে এরফান সমাগত সমস্ত চাষীর মনের ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়।

বঙ্কিম তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বেহারী শীলকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি ক'রবে বেহারী ?

বেহারী উত্তর করিল, আমি গায়ে গায়ে পরিশোধ করব হুজুর।

কি রকম ?

আপনারে খেউরি করব, আপনার নায়েব গোমস্তা অচেন, তারগো কামাব। আমার বুদ্ধুর মা আসিয়া আপনার ঘরের ওনার নথ কাটবে, পায়ে আলতা পরাবে—বেহারী এই কথা বলে আর মুচকি হাসে।

বঙ্কিম বলিল, টাকা নিলে খত দিয়ে। এখন বলছ কামিয়ে শোধ করবে। সে হবে না।

বেহারী বলিল, দেবেন রায় রাজারে কামাইয়া আমার ঠাকুরদাদা গুরুচরণ শীল দশ বিঘা জমি পাইছিল। আর আপনারে খেউরি করিয়া দুইশটা টাকা শোধ হবে না ?

আমি রাজা উজীর নই। কামাবার পয়সা তুমি নগদ নিও। আর পনর দিনের মধ্যে সুদ সমেত আমার টাকার ব্যবস্থা কর—একটু থামিয়া বঙ্কিম আবার বলিল, রূপমতীর ধারে তোমার কিছু জমি ছিলনা ?

চাষীরা এবার পরস্পরের মুখের দিকে চায়। ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে। এ যেন বিচারালয়। অপরাধী তারা প্রত্যেকে। বিচারপতি নির্দয়। মাংসের বদল মাংস পাইলেও সে খুশি হইবে না। টাকার বদল সে টাকা চায় না—চায় জমি, প্রজার রুধির !

যদু নাপিত এতক্ষণ এককোণে বসিয়াছিল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথা বলার ফলে গ্রামে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া ওঠে। সে কিছুকাল কলিকাতায় ছিল। সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছে। মৌন ভঙ্গ করিয়া সে বলে, আপনি কল করবা সেত' সুখের কথা। আমরা তবু দু'একখানা বস্তুর পাব।

বঙ্কিম বলে, সুবিধে তোমাদের অনেক কিছুই হবে। আমি বরাবর লোকের ভালই করে এসেছি।

যদু বলিল, তা আমারে বেস্মরণ করছ কেন? আমার গজা ত' নজরানা দিয়া গেছে।

কালীপদ উত্তর করে, নজরানা জমা হয়েছে, তোমাকে ডেকেছেন টাকার জন্য।

ট্যাকা। সে ত নাগিনই মাস মাস মনিয়াটা করিয়া শোধ করছে।

সান্যাল কহিলেন, শোধ কি হে? দুবার পাঁচ টাকা করে পাঠিয়ে সে শুধু তামাদি বাঁচিয়েছে।

কার কথা কও, সান্যাল মশয়?

তোমার ছেলে নাগিনের কথা।

সে ত' মাস মাস রসিদ দেখাইত, কইত যার ট্যাকায় সিলিন করলাম, বিয়া করলাম, বিলের জমি কেনলাম, বাঁচিয়া আছি যার জন্য, তার পাওনা শোধ না করলে ধম্মে সবে না।

সান্যাল বলিলেন, তোমার নাগিন বাক্‌পটু বরাবরই।

যদু নাপিত একটুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, রসটা বুঝছি এবার। ব্যাটার শ্বশুর মরছে, তারগো সংসার অচল। নাগিন শালারে প্রতি মাসে টাকা পাঠাইত আর আমারে কইত বঙ্কিম মশায়রে মনিয়াটা করলাম।

কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসে। বঙ্কিম বলে, আমার টাকার কি করবে বল দেখি?

যদু নাপিত উত্তর করে, আপনে ত' জমি চাও? তা নাগিনের গর্ভধারিনীরে শুধাইয়া কইয়া যাব।

লোকগুলা মুখ ভার করিয়া নিজ নিজ বাড়ী ফেরে। তারা বোঝে যে গাংপারের জমি আর রাখা যাইবে না। বিলের জমি ছিল একত্রিশ ঘর

চাষীর ; কিন্তু গাংপারের জমিতে স্বার্থ প্রায় সমস্ত কুরপালার। তাদের জীবনের কত স্মৃতি জড়িত এই মাঠের সঙ্গে। যুগ যুগ ধরিয়া এই মাটি তাদের অন্ন দিয়াছে, বস্ত্র দিয়াছে। এই জমি তারা চষে, এখানে গরু চরায়, ষাঁড়ের লড়াই দেয়। ফসল কাটা হইলে দল বাঁধিয়া হাডুডু ও দাড়িয়া বাঁধা খেলে। বাতাবি লেবু দিয়া খেলে ফুটবল।

এদিকে ধীরাজ দাস ও উপিন কালীর দল বঙ্কিমের হইয়া জমির মালিকদের বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, কল হইলে কুরপালার লোকেদেরই সুবিধা। তারা চাকরি পাইবে, সস্তায় কাপড়ও পাইবে। মিলের চাকুরিয়াদের জন্য বঙ্কিম কোঠাবাড়ী তুলিয়া দিবে। রাণীডাঙ্গার মতন কুরপালারও পথঘাট, টিউবওয়েল এবং ডাক্তারখানা হইবে।

এক এক জায়গায় তাদের কৌশল এক একরকম। দেনদারকে তারা মামলার ভয় দেখায়। যারা বঙ্কিমের কাছে ঋণী নয় এমন দু'এক ঘর চাষীকে দেখায় নগদ টাকার লোভ।

তিনকড়ি একদিন স্বামীকে কহিল, গাংধারের জমি যাইয়া ছাড়িয়া দেও। ঐ মুখপোড়া যখন চাইছে তখন আর রাখতে পারবা না।

যদু নাপিত বলে, তাত' বুঝি, কিন্তু—

কিন্তু না। এখন দিলে দেনাটা শোধ হবে। নগদও কিছু পাবা। এর পরে জমিত' যাবেই। দেনাও পরিশুদ্ধ হবে না।

যদু বলে, কইছ ঠিকই। এরই জন্য কয় ইস্তিরি বুদ্ধি—

যদু নাপিতের দেখাদেখি অনেকেই গাংপারের জমি বেচিতে আরম্ভ করে। দুই মাসের মধ্যে একশ বিঘার উপর জমি বঙ্কিম কুণ্ডুর হস্তগত হয়

পনর

লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সেই প্রথম স্বাধীনতা দিবস। কুরপালায় সভা হইবে, সভাপতি ইন্দুপ্রকাশ। প্রস্তাবও তিনি পাঠ করিবেন।

সভার আগের দিন সন্ধ্যায় সরকারী হুকুম আসিল, যে-হেতু ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মনে করেন যে, কোনও সভা হইলে বা মিছিল বাহির হইলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে সেই হেতু তিনি ২৫শে জানুয়ারি হইতে এক মাস সাগরদীঘি, সুরেন্দ্রগঞ্জ ও ব্রজধাম থানায় ১৪৪ ধারা জারি করিতেছেন। যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের হুকুম না লইয়া ঐ সময়ের মধ্যে ঐ অঞ্চলে কেহ সভা করিতে বা মিছিল বাহির করিতে পারিবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে জেল ও জরিমানা উভয় শাস্তিই হইবে।

শঙ্কর বলিল, আপনার ত' প্রস্তাব পাঠ করা হবে না, দাদু।

ইন্দুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অপরাধ?

আপনার এই বয়সে—

তোমাদের ভাবনা নেই। এই বুড়ো হাড়ে অনেক কিছু সইবে, ভাই—বলিয়া ইন্দুপ্রকাশ স্মিত হাস্য করিলেন। কী মিষ্টি হাসি। এই হাসিই সকলকে নিশ্চিন্ত করিল। সমস্ত আপত্তি মূক হইয়া গেল।

নারায়ণের ভিটার সামনে মাঠ। ছেলেরা বলে, গান্ধী ময়দান। সভা সেইখানে।

স্বাধীনতা প্রস্তাব পাঠের পর ইন্দুপ্রকাশ সংক্ষিপ্ত এক বক্তৃতা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হন।

শ্রোতাদের মধ্যে ছিল নিধিরাজ। সে চেঁচাইয়া উঠিল, অহিংসুক আর থাকা যায় না। আয় সগলটি মিলিয়া বাওন দাছুরে ছিনাইয়া নি। দেশী আমরা শত শত মানুষ। আর পুলিস ত' দুইগণ্ডা।

কথাগুলি শেষ হওয়ার আগেই দারোগা তার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দেন।

মহকুমা হাকিম ইন্দুপ্রকাশকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কিছু বলবার আছে ?

হাঁ হুজুর। আপনি বাঙ্গালী। কাছারির মাঠে এসে আপনিও এই প্রস্তাব পাঠ করুন।

হাকিম মৌলবী মহম্মদ ইদ্রিস হুকুম দেন, ছয়মাস অশ্রম কারাদণ্ড।

লোককে হিংসাত্মক কাজে প্রবৃদ্ধ করার জন্য নিধিরাজের বেলায় ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

বৃদ্ধের আত্মত্যাগে, নিধিরাজের পরিবর্তনে কুরপালায় সাড়া পড়িয়া যায়। লোকে কিসের যেন প্রতীক্ষা করে, কোন্ এক শুভ মুহূর্তের, যখন ডাক আসিবে, জাতির সেবার ডাক।

বিষ্ণু নারায়ণ আদম আকালী রাসেঙ্গল হাস্ত উৎসাহ এদের অপরিসীম, নিষ্ঠা অদ্ভুত, ত্যাগ অকুণ্ঠ। যারা কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তারাও সুতা কাটে। হাটবাজারে যাওয়ার সময় লোকের হাতে একটা করিয়া তকলি থাকে। তারা কথা বলিতে বলিতে তকলিতে দুটা পাক দেয়।

তিন মাস পরের কথা। নারায়ণের ভিটার কিছু দূরে, সোতা খালের পারে তিনসারি নালা কাটা হইল কাটিল কংগ্রেসীরা। লোকে

বলিল, সম্ভব চুলা করবে, স্বদেশী গো মচ্ছবের জন্য। দেশে মচ্ছব নাই অনেকদিন।

দীর্ঘকাল পরে মহোৎসবের আশায় লোকে প্রফুল্ল হয়। গান বাজনা তো আছেই, তার উপর আছে ভোগের প্রসাদ, খিচুড়ি, ভাজি ও মালপোয়া।

কয়েকদিন পরেই নৌকা বোঝাই হইয়া নারিকেলের ড্যাগা (বাকলো) আসিতে লাগিল। সাগরদীঘিতে নারিকেল গাছ খুব কম। লোকে প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি নাড়ু?

নারায়ণ উত্তর করে, শঙ্করদার হুকুম।

ড্যাগাগুলি ভাল করিয়া শুকাইলে কংগ্রেসীরা একদিন তাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। পুড়িয়া পুড়িয়া সব নিঃশেষে ছাই হইয়া যায়।

এর পর লবণ সত্যাগ্রহ। নারিকেলের ড্যাগা বা বাকলের ঐ ছাই জলে জ্বাল দিয়া নুন তৈয়ারি হইবে। দলে দলে লোক আসে লবণ তৈয়ারি দেখিতে, নুনের ভাগ লইতে।

শঙ্কর তাদের বাধা দেয়। সে বলে, তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পার, কোনও চীৎকার করবে না, জয়ধ্বনিও নয়।

ইয়াকুব বলিল, একবার 'বন্দেমাতরং'ও নয়?

নরহরি বলিল, গান্ধী মহারাজ তো সকলরে লবণ তৈয়ার করতে হুকুম দিছেন।

শঙ্কর উত্তর করে, হুকুম দিছেন সত্যি কিন্তু প্রথমেই সকলকে নয়।

বড় বড় গামলায় ছাই জ্বাল হয়, ধোঁয়ায় ধোয়ায় আকাশ ছাইয়া যায়। সেই ধোঁয়ার জালের মধ্যে জলন্ত অগ্নিশিখার মতন দেখা যায় কতকগুলি লাল পাগড়ি।

যে কয়জন স্বেচ্ছাসেবীর আজ সত্যাগ্রহ করার কথা তারা কড়ার চারধারে দাঁড়াইয়া গাহিতে আরম্ভ করে,—

হবে জয় জয়রে
হে বীর নির্ভয়
জয়ী প্রাণ, জয়ী মান
জয়ীরে আনন্দময়
হবে জয় জয়রে।

ধোঁয়ার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে লাঠি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দু'চারটা আর্তনাদ শোনা গেল, কড়াই ভাঙ্গিল, লোকের মাথা ফাটিল, জনতা ছত্রভঙ্গ হইল। স্বেচ্ছাসেবীরা তখনও গাহিতেছে,

হবে জয় জয়রে।

সেদিন গ্রেপ্তার হয় মাত্র দুইজন, রাসেদুল ও নারায়ণ।

বিষ্ণু চাটুয্যে ও সুশীল দাস পুলিসের নৌকায় লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করে। পুলিস তাদের ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। সুশীলের চশমা ভাঙ্গিয়া যায়।

বৈকালে রহম চৌকিদার আসিয়া খবর দেয়, ছোট দারোগা সাহেব রাসেদুলকে বড় নির্যাতন করিয়াছেন।

তার উপর অনুগ্রহটা এত বেশী কেন?—বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করে।

রহম বলে, ছোট দারোগা নিজে মোছলমান কি না তাই রাসেদুলরে কইল, মোছলমান হইয়া তুই এসব করতে গেলি কেন? কয় আর মারে, সে কী মার।

কথাটা শুনিয়া শঙ্করের হাতের আঙ্গুল ও নীচের ঠোঁট কাঁপিতে থাকে। চোখ দুটা লাল হয়। সে বলিয়া ওঠে, কী দুর্ভাগা দেশ

আমার। পর মুহূর্তেই নীরব হইয়া যায়। নীরব ও শান্ত, যেন কিছুই হয় নাই এমন শান্ত ভাব।

হাস্ত জানিত দ্বিতীয় দিন শঙ্কর সত্যাগ্রহ করিবে। তখনও কিছু কিছু শীত ছিল। ভোরে সে একখানা সুন্দর কাঁথা আনিয়া শঙ্করের হাতে দিল। তার উপর শালের কল্কার মতন কল্কা বসান হইয়াছে। সে বলিল, আপনে এইখান নেও।

শঙ্কর বলিল, জেলে ত' নিতে দেবে না।

তবু তোমার সঙ্গে থাউক।

কাঁথার সুন্দর কারুকাজ দেখিয়া শঙ্কর বলিল, কে করেছে?

ভুলিয়া গেছ তুমি?—বলিয়া হাস্ত একটু হাসে। ভারী করুণ সে হাসি।

শঙ্কর বলিল, ওঃ, মনে পড়েছে। কী লজ্জার কথা বল দেখি। তোমাকে কাঁথা সেলাই করতে বলে সেই যে কলকাতা চলে গেলাম, তারপর আর কি্ছুই মনে ছিল না।

তুমি লজ্জা করিও না। বড়গো কি অত মনে থাকে?

সেইদিনই শঙ্কর, বিষ্ণু ও সুশীল দাশ গ্রেপতার হয়।

সুতা কাটিয়া হাস্ত সামান্য কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল। উহা গচ্ছিত ছিল শঙ্করের কাছে। কংগ্রেসের টাকায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এইদিন ঐ টাকাও আটক করিল।

শঙ্কর বলিল, এর মধ্যে কিছু টাকা ছিল এক গরিব বিধবার।

দারোগা প্রৌঢ় কিন্তু রসিক ব্যক্তি। তিনি কহিলেন, বিধবার টাকা, আপনার কাছে কেন?

তার যে কেউ নেই।

মোর রোম্যান্টিক্ (More romantic), তা' বিধবাটির বয়স কত?

শঙ্কর ঘৃণায় কোন উত্তর করিল না।

পরের দিন নুন জ্বাল দেওয়া বন্ধ থাকে। মেয়েরা বঙ্কিমের বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেট করে। পুলিস তাদের ধরিয়া লইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় নামাইয়া দেয় মধুমতীর এক চরে। চরটা দশ বার মাইল দূর। ভিন্ন থানা, জেলাও ভিন্ন।

বিষ্ণুর মাসী বলেন, এখানে নামাচ্ছেন যে আমাদের?

পুলিসের এ, এস, আই বলিল, নুন জ্বাল দেবেন বলে। জলটা নোনতা কিনা।

ছোট চর। দৈর্ঘ্যে আধ মাইলেরও কম, চওড়া তিন চারশ' হাত। নদীর বুকে লম্বা একফালি জমি। চরে কোন বসতি নাই। নদীর পারেও নয়। যতদূর দেখা যায় শুধু ধূ-ধূ করে মাঠ। আর চরের বুকে কাশের ঘন বন।

আকালীর দিদি মনোহরা চীৎকার করিয়া ওঠে, এখন আমারগো উপায়?

এই কথার উত্তরেই যেন নদীর মধ্যে পুলিসের নৌকা হইতে এক লহর হাসি ভাসিয়া আসে।

বিষ্ণুর মাসী সকলকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাস্য ভিন্ন কেহই প্রবোধ মানে না। বিন্দু বলে, ফাটক যে এর থা ঢের ভাল ছিল।

একটু পরে তুলসী কাহারের বৌ সিন্ধুবালা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মাসীমা ঘরের একজন আমারে আর আস্তা রাখবে না। পোড়া কাঠ দিয়া পিটাইয়া খেদাইয়া দেবে।

কথাটা সত্য। তুলসী বরাবরই স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। জানে সবাই। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজকে লইয়া এত ব্যস্ত যে সহানুভূতি প্রকাশ

করিবারও অবকাশ পায় না। শুধু বিন্দুর মাসী বলেন, তাই ত' মা। তুমি এলে কেন ?

সিন্ধুবালা হেঁচকি তুলিতে তুলিতে বলিল, আইছিলাম তামাশা দেখতে। তখন কি জানি যে মুখপোড়ারা আমারগোও ধরবে ?

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসে—ঐ নারী কয়টির হৃদয়ের হতাশার মতন নিঃসীম গাঢ় তমিস্রা। নদীর বুকে লাখো লাখো কালো সাপ ফণা তুলিয়া ভাসিয়া যায়। শোনা যায় তাদের ফোঁস-ফোঁসানি। কাশের বনের মধ্যে বাতাসের শব্দে মনে হয় কে যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে।

সমস্তটা রাত কাটে বিভীষিকার মধ্যে। পরস্পরকে ছুঁইয়া, জড়াজড়ি করিয়া তারা বসিয়া থাকে। নদীতে এক একবার দাঁড়ের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়। বিন্দু বলে, আয় আমরা গলা ছাড়িয়া চেঁচাই।

আকালীর দিদি মনোহরা বলে, চুপ থাক্ বনের পশুরে তবু ডাকা যায় কিন্তু এই সময় পুরুষ মানুষেরে। ওরে বাপ্।

প্রভাতের অরুণ আলোয় তাদের মনের আঁধার একটু কাটে বটে কিন্তু রৌদ্র বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হতাশাও বাড়িতে থাকে। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়। রৌদ্রে মাথা ফাটিবার উপক্রম কিন্তু ভরসা করিয়া তারা নদীতে নামে না। ভয় খানিকটা কুমীরের কিন্তু তারচেয়েও বেশী ভয় পুরুষ মানুষকে।

একমাত্র বৃদ্ধা বিন্দুর মাসী নদীতে ডুব দিয়া আসেন। আর সবাই নদীতে দাঁড় কিংবা বৈঠার শব্দ পাইলেই কাশ বনের আড়ালে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে।

হাস্তের মনে পড়ে জুড়ানির কথা। মেয়েটিকে সে কংগ্রেস আপিসে রাখিয়া আসিয়াছে। সে খাইল কিনা, কোথায় রাত কাটাইল—হাস্তের

তার জন্য দুর্ভাবনা অনেক। সে বলিল, জুড়ানি এখন কি করতেছে কন দেখি, মাসীমা?

মনোহরা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, রাখ্ তোর জুড়ানি। আমরা কোথায় মরি নিজেরগো জ্বালায়।

বিষ্ণুর মাসী হাস্তকে আশ্বাস দেন, মেয়ে তোমার চালাক আছে। তার জন্যে কোন ভাবনা নেই।

এই মেয়েটি কিছুদিন যাবৎ হাস্তের আশ্রয়ে আছে। তার পরিচয় সংক্ষিপ্ত। মাইল কয়েক দূরে মধুমতীর পারে তার বাড়ী। তার মাকে কুমীরে খায়, বাপ মরে গলায় দড়ি দিয়া। একে ত' অনাথা, তার উপর বাপ মা ছিল একঘরে। অপরাধ, তার মা এক মুসলমান তরুণের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিয়াছিল। কুমীরের পেটে গিয়াও এই নারী সেই পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিল না। তার ও তার স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজ তাদের নয় বৎসরের এই মেয়েকে গ্রহণ করিল না। তার মাসী সমাজের ভয়ে তাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল।

কংগ্রেসের কাজে নিধিরাজ একদিন ঐ গ্রামে যায়। জুড়ানিকে সে লইয়া আসে। আনিয়া কংগ্রেস আপিসে হাস্তের হাতে দেয়।

মেয়েটির গায়ে একরাশ ময়লা, মাথায় ধুলা বালির জট, সর্বাঙ্গে পাঁচড়া। হাস্ত সাবান দিয়া তাকে নাওয়ায়, তার চুল আঁচড়াইয়া দেয়। পরিতে দেয় রঙিন খদ্দর। পদ্ম তাকে দেখিয়া গান ধরে,

লুকিয়েছিলি গৌরী কোন গহন-বনের ছায়,
আয়রে কোলে আয়।

মেয়েটি গৌরী কিন্তু বোবা। কতকাল সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। অনেকদিন হয়ত উপবাসেও কাটিয়াছে, সামনে ভাত ডাল

তরকারি পাইয়া সে একসঙ্গে একরাশ মুখে পুরিয়া দেয়, সঙ্গে মুড়াসমেত একটা কইমাছ।

ভাতের গ্রাসটা তার গলায় আটকাইয়া যায়। হাস্থ মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে টানিয়া বাহির করে। পিঠে মারে দুমদুম করিয়া গোটা দুই কিল। কিল না মারিলে মেয়েটির মুখ হইতে ঐগুলি টানিয়া বাহির করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

কয়েকমাসের মধ্যে হাস্থ জুড়ানিকে সুতা কাটা শেখায়, শেখায় ঘর-কন্নার ছোট ছোট কাজ। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, একবার দেখিলেই সব বুঝিতে পারে। আকার ইঙ্গিতে কোনপ্রকারে বুঝিলে আর ভোলে না।

সন্ধ্যার সময় চরের পাশ দিয়া যদু সাহার নৌকা যাইতেছিল। যদু রাণীডাঙ্গার লোক, হাটখোলায় মুদীখানার দোকান করে। বিষ্ণু চাটুয্যেকে সে ভালই চেনে। তার মাসীমাকেও। তাঁকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা এইখানে?

হাতের কাছে কোন অবলম্বন পাইলে ডুবন্ত মানুষের যেরকমটি হয়, মেয়েদের অবস্থা হইল সেইরকম। আনন্দে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

যদু আবার বলিল, পিকেট করছিলেন মা ঠাকরুন, না লবণ তৈয়ার?

তুমি জানলে কি করে?

গেছিলাম খুলনা পর্যন্ত। দুই তিন জায়গায় দেখলাম এই দৃশ্য।

দীন-দরিদ্র কুরপালার একটা শুভদিন আসিয়াছিল। ঘরে ঘরে চরকার গুঞ্জন, মুখে মুখে আশার বাণী। সুতা কাটিয়া, কাপড় বুনিয়া অনেকেই দুই পয়সা রোজগার করিল।

গ্রামের এই শুভদিন আনে শঙ্কর। অশিক্ষিতদের বর্ণ-পরিচয় করায়। চাষীদের বুঝায় জাতির স্বার্থের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কত গভীর। শেখায় আত্মসম্মান।

তার গ্রেপতারের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা যবনিকাপাত হয়। নারায়ণের ভিটায় তালা পড়ে। বিজ্ঞেরা বলে, কইছিলাম না তখন, এসব ধাষ্টামো কেন বাবা? আমারগো আবার স্বদেশী!

* * * *

হাস্তু আবার জুড়ানিকে লইয়া স্বামীর ভিটায় ফিরিয়া আসে। ঘরে তার এক কণা খুদ নাই, হাতে একটি কপর্দক নাই। এদিকে জুড়ানি তখন পেট চাপিয়া ক্ষুধায় কাঁদিতেছে।

ষোল

একদিন পদ্ম আসিয়া হাস্তের বাড়ী উপস্থিত হইল। তার মুখের সেই হাসি হাসি ভাবটুকু আর নাই। কেমন যেন মলিন। হাস্তু প্রশ্ন করে, হইছে কি রে?

পদ্ম বলে, তোমার বাড়ীতে একটু জায়গা দেবা?

হাস্তু তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

পদ্ম বলে, তোমারগো বৈষ্টম চলিয়া গেছে। একলা বে-পাড়ায় থাকব কেমন করিয়া?

হাস্তু বলে, তুমি থাকবা সে ত' ভাল কথা। কিন্তু এমন করিয়া আসবা তা ত' ভাবতে পারি নাই।

সবই বরাতের লিখন রে ভাই।

সেইদিনই বৈকালে মালপত্র লইয়া পদ্ম আসে। আর তাদের ধবলীর মেয়ে শ্যামলী। গাভীটির চোখে একটা করুণ ভাব। হাস্থ তার গলার নীচে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, তোর দুঃখু করে বুঝি?

শ্যামলী মাথা নাড়াইয়া বার দুই হাম্বা হাম্বা ডাকে।

পদ্ম বলে, দুঃখ ত অর করবেই। ভিটার বাঁধন। শ্যামলীরই ঐখানে হইল দশ বছরের উপর।

কয়েকদিন পরে পুলিস আসিয়া অজুর খোঁজ করিল। সারা কুরপালা জানিল যে সে খুনী আসামী। বহুদিনের ফেরার।

অনেকে পদ্মকেও সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করিল। তাদের ধারণা, ঘটনার সঙ্গে হয়ত তার কোন সংস্রব নাই। কিন্তু সে জানে সবই।

লোকে তাকে দেখিলেই নানা প্রশ্ন করে। কেহ বলে, তোমারে ফেলিয়া গেল কেন? ঝগড়া হইছে বুঝি? কেহ বা টিপ্পনী করে, খুনীর সঙ্গে যাও নাই—বেশ করছ।

পদ্ম সাধারণতঃ এসব কথায় কোন উচ্চবাচ্য করে না। কেহ বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে বলে, 'খুনী' বলিয়াই ত সঙ্গে গেলাম না।

অজু যে 'খুনী' পদ্ম তাহা জানিত না। ব্যাপারটা তার কানে হেঁয়ালিরই মতন মনে হইল। একদিন সে হাস্থকে জিজ্ঞাসা করিল, আসামী বারো বছর পরে ধরা পড়লে তার নাকি কিছু হয় না? সত্য নাকি?

হাস্থ উত্তর করে, আমিও ত' শুনছি সেইরকম।

পদ্ম বলিল, একযুগের উপরে দেখতেছি এর মধ্যে কিছু হয় নাই।

হাস্তু বলে, দাদাবাবু বাইরে থাকলে তানারে জিজ্ঞাসা করতাম!

তার বাবারে জিজ্ঞাসা করবি নাকি?

হাস্তু বলে, ওরে বাপ। আমার সাহস হয় না। আচ্ছা, বৈরাগী কি জানত যে পুলিস তার খোঁজ করতেছে?

তা জানিনা। তবে সে আর একজন বৈষ্ণবীরে লইয়া উধাও হইছে।

হাস্তু বলিল, সে আবার কেডা?

রসকলি কাটা এক বৈষ্ণবী কয়দিন আগে আইছিল। কথায় কথায় ছড়া কাটত।

পদ্ম লজ্জায় এই কয়দিন হাস্তের নিকটও কথাটা প্রকাশ করে নাই। হাস্তু নারী—নারীত্বের এই অপমানের বেদনা সে বুঝিতে পারে। সে দুইহাত দিয়া পদ্মের বাহু চাপিয়া ধরিয়া বলে, পুরুষগুলার সত্যই কোন দয়ামায়া নাই।

কিছুদিন পরে কাহারপাড়ার যোগেন আসিয়া খবর দিল অজুকে সে রাখালগাছিতে দেখিয়া আসিয়াছে। হাটের কাছে অসুস্থ হইয়া সে পড়িয়া আছে। শীর্ণ চেহারা, মুখে একগাল দাড়ি। দাড়ি, গোঁফ, মাথার চুল সব সাদা।

পদ্ম বলিল, ভয় নাইত কিছু? তুমি নিজে দেখছ? রাখালগাছি কোথায়?

রাখালগাছি পশ্চিমে বিশ ত্রিশ ক্রোশ হবে।

তুমি নিজে তার সঙ্গে কথা কইছ?

কথা! না কথা কই নাই—ফেরারী খুনী আসামীর সঙ্গে কথা বলিতে যোগেনের সাহসে কুলায় নাই।

পদ্ম বলিল, সঙ্গে আর কেউরে দেখলা ?

যোগেন মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

পদ্ম যোগেনের নিকট হইতে রাখালগাছি কতদূর, কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয়, এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব জানিয়া লয়। তারপর বলে, কেওরে কইও না যেন যে রাখালগাছিতে দেখছ।

সে ভয় করিওনা, বোষ্টমি। কাকপ্রাণীও জানবে না।

এর মধ্যে যোগেন কিন্তু তিন চার জনকে খবরটা বলিয়াছে। প্রত্যেককেই আবার সাবধানও করিয়া দিয়াছে, খবর্দার কেওরে কইও না যেন। তুমি নিজের লোক তাই তোমারে কইলাম।

গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষা করিতে করিতে বৈষ্ণবী পথ বাহিয়া চলে। মধ্যে মধ্যে দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করে, রাখালগাছি যাব কোন্ পথে ?

রাত্রিতে সে পথ চলে। অন্ধকারে ভয় করে বটে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে পুরুষের লোভী দৃষ্টিকে এড়াইয়া চলিতে হয় না। সেই জন্য রাত্রেই চলে বেশী। ঝড় ঝঞ্ঝা গ্রাহ্য করে না। অনেক সময় তার শরীর ও কাপড় বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিলে এক একবার চোখ মুছিয়া লয়। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক তাকে পথ দেখায়।

তার ভরা যৌবন দেখিয়া লোকে রসিকতা করে। কেহ বা বৈষ্ণব পদাবলির দুটা কলি আওড়ায়। পদ্মও পাল্টা জবাব দেয়। সে জানে এই অবস্থায় লজ্জা সঙ্কোচ দেখাইলেই নারীর যত বিপদ। লোকগুলার সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে।

একদিন বৈকালে আঠারবাঁকী নদীর তীরে পদ্ম বসিয়া আছে। নদীটা পার হইতে হইবে। পার কেহ করিতে চায় না। একজন চাহিয়াছিল, সে তার নৌকায় উঠিল না। লোকটি বলিল, মনের মতন মানুষ না পাইলে নৌকায় ওঠ্‌বা না বুঝি ?

পদ্ম উত্তর করে, ঠিকইত। মনের মতন হইয়া আইস, তখন ওঠব, নিশ্চয়।

প্রায় বিশ ক্রোশ পথ চলিয়া একদিন ঘোর সন্ধ্যায় পদ্ম রাখালগাছির হাটে পৌছিল। পা ফুলিয়াছে, ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। মাথা ঝিম ঝিম করে, শরীর আর বয় না। এক দোকানে সে জিজ্ঞাসা করিল, একটি বৈষ্টম এখানে অসুখ করিয়া পড়িয়া আছে। বলতে পারেন কোথায় ?

প্রৌঢ় দোকানী সবেমাত্র সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিয়া সুর করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেছিল। নারীকণ্ঠ শুনিয়া চশমা একটু নীচে নামাইয়া চশমার উপর দিয়া দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া সে বলে, কি চাই ?

পদ্ম তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে।

লোকটি বলে, তুমি বুঝি দু' নম্বর ?

পদ্ম বলে, কয় নম্বর বলিয়া মনে হয় ?

তোমার সঙ্গে আর পারা যাবে না—বলিয়া দোকানী উঠিয়া তাকে পথ দেখাইয়া দেয়।

পদ্ম যখন অক্রুর কুঁড়েয় আসিয়া উঠিল তখনও তার জ্ঞান আছে। সে একটু হাসে—ক্ষীণ হাসি। তার চাহনিতে মনে হয়, সে আশা করিয়াছিল পদ্ম আসিবে।

তাকে দেখিয়া পদ্ম শিহরিয়া ওঠে। একী চেহারা! যেন কঙ্কালের

উপর শিথিল চামড়া বসানো। সামান্য এই কয়েকদিনের মধ্যে অজুর মাথার চুল সব সাদা হইয়া গিয়াছে। চোখের তারা নিষ্প্রাণ।

পদ্ম সারাদিন অক্লান্ত সেবা করে। শুধু সকালটায় ঘণ্টা দুই করে ভিক্ষা, একতারা লইয়া পিলজঙ্গ, নপাড়া, উৎকুল এক একদিন এক এক গ্রামে ঘুরিয়া আসে। তার গান শুনিয়া কেহ চাল দেয়, কেহ পয়সা, কেহ সাবু বার্লি, যে যা পারে।

একদিন একটি ছেলে শামুকের লাল দুখানি খোলা দিল। খেলার জন্য মাঠ হইতে সে কয়খানি খোলা কুড়াইয়া আনিয়াছিল। কিশোরটির এই দান মাথায় ছোঁয়াইয়া পদ্ম বলিল, গোপাল তোমার ভাল করবেন।

যমের সঙ্গে লড়াই করিয়া সে অজুকে সবে একটু ভাল করিয়া তুলিয়াছে, রোগী তখনও উত্থান-শক্তিহীন। এই সময় তাদের দরজায় পুলিস পাহারা বসিল। লইয়া যাইবার মতন হইলে তারা তাকে চালান করিবে।

পদ্ম ভাবে, মানুষটারে এমন করিয়া সারাইয়া তোললাম, সে কী শুধু ফাঁসীকাঠে চড়াবার জন্য? একদিন সে জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা জানলা কি করিয়া সাহেব?

জমাদার বলিল, তোমার হামার দোঠো আঁখ আছে। ঔর সরকারকো আছে চারঠো। হেঃ হেঃ।

অজু বলে, সরকারের চক্ষু হৈল ঐ মাগী, পুলিসের গোয়েন্দা। পাইতাম একবার শয়তানীরে তা হৈলে গলাটা—অজু গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার ভঙ্গী করে। দেখিয়া পদ্ম ভয় পায়।

তার নিয়মিত ভিক্ষায় যাওয়া বন্ধ হইল। তার অনুপস্থিতেতে যদি অজুকে লইয়া যায়, সেই ভয়ে সে যেন পুলিসকে পাহারা দিতে থাকে।

মাঝে মাঝে তাদের কীর্তন শোনায়। জমাদার খুশি হয়। সে বলে, সীতাজিকো গাহনা গাও।

পদ্ম সীতার গান জানে না। রাধার জায়গায় সীতা ও কৃষ্ণের জায়গায় রামের নাম বসাইয়া কীর্তন গায়। জমাদার ও কনেষ্টবল দুজনেই খুশি হয়। বলে, বহুৎ বঢ়িয়া গাহনা। এ তোমারা আদমি হ্যায়?

সোয়ামী কাকে বলে জান সাহেব?

জমাদার বলে, জরুর। হাম্‌ভি সোয়ামি হ্যায়।

পদ্মের দিন আর চলে না। দুর্বল রোগীকে কোথায় একটু ভাল পথ্য দিবে, সে ত দূরের কথা, সময় মতন বালির জলও যোগাড় করিতে পারে না। অজু খুঁতখুঁত করে।

পদ্ম একদিন সাহস সঞ্চয় করিয়া জমাদারকে কহিল, তোমরা চলিয়া যাও। যাইয়া কবা যে তোমরা ঘুমাইয়াছিলা সেই সময় আসামী পলাইছে।

জমাদার বলিল, উঃ হোয় না। হামাদের নোকরি যাবে। ফাটকভি হোবে। বালবাচ্চা সব মর যাবে।

দয়ার জন্য ফাটক!

দয়ার মালিক হামি নেই। আছেন সীতাপতি। উনকো ভজনা কর। ঔর উস্‌কো নাম মত্‌ কর।

কার নাম নিতে মানা করলা সাহেব?

ঐ যো দোয়ারকামে—

কেষ্ট রাধার কথা বলতেছ? রাধাকৃষ্ণের জয় আর কব না?

জমাদার জোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, নেই, উ নাম নেই। বোলো রামচন্দ্রজী কি জয়।

এই কয়দিনের মধ্যে জমাদারকে খুশি করিবার জন্য পদ্ম ভদ্রলোকদের কাছে গানটা শিখিয়াছিল। সে এবার ধরিল,

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু
প্রজারঞ্জনকারী।

চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে জমাদারও ধরিল—জয় সীতাপতি সোঁদর তনু—

গ্রামে রটিয়াছে বৈষ্ণব খুনী আসামী। ফেরার। কেবল উৎকুল কি রাখালগাছি নয়, সাতবেড়িয়া বাহিরদিয়া প্রভৃতি সুদূর গ্রাম হইতেও লোকে এই বৈষ্ণব দম্পতিকে দেখিতে আসে। হাটের দিনই ভিড় হয় বেশী। সেদিন জমাদার ও কনষ্টেবল মাথায় পাগড়ি চড়াইয়া লয়।

মানব-মনের কৌতূহল অদ্ভুত। অপরিচিত জন্তু জানোয়ারকে মানুষ যেরূপ আগ্রহের সহিত দেখে সেইরূপ আগ্রহ লইয়া লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অজুর কুঁড়ের সামনে দাঁড়াইয়া থাকে। অজুকে দেখা যায় না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কেহ তার একটু কাসির শব্দ শুনিয়াই খুশি হয় কেহ বা পদ্মকে দেখিয়া বলিয়া ওঠে, ওঃ এর বৈষ্ণব!

পদ্ম এক একবার বিরক্ত হইয়া ওঠে। তার ইচ্ছা করে যে তাদের গায়ে গরম ফেন ঢালিয়া দেয়।

মধ্যে মধ্যে সরকারী ডাক্তার অজুকে দেখিয়া যান। এবার আসিয়া তিনি রিপোর্ট দিলেন, রোগী স্থানান্তরিত হওয়ার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে।

থানার ছোটবাবু আসেন, আসে ডুলি-বেহারা। পুলিস অজুকে ডুলিতে চাপাইয়া রওনা হয়। পিছনে চলে কৌতূহলীর দল। কেহ

বলে, বেটা জামাই বরাত করে এসেছিল। খুনী আসামী হ'য়ে থানায় চলল, তাও আবার মানুষের কাঁধে চড়ে।

কেহ বা টিপ্পনী করে, বরাত ভাল না হলে কি আর অমন বোষ্টমী জোটে ?

কোন।কোন মন্তব্য পদ্মের কানে যায়। কোনটা বা যায় না। সেও ডুলির পিছন পিছন চলিতে থাকে।

দু'একবার দারোগা তাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন। খানিকক্ষণ পরে মুখ বাহির করিয়া অজু বলিল, ফিরিয়া যা। মামলার ভাল তদ্বির করিস্ কিন্তু—

পদ্ম আর আগাইল না। মাথা নীচু করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

খানিকটা পরে চোখ তুলিয়া দেখিল ডুলিখানা কিছু দূরে গাছপালার ঘন সবুজের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

সতের

রবিবার। বেলা প্রায় একটা। উকিল বীরেশ্বরবাবুর বৈঠকখানা সবেমাত্র ফাঁকা হইয়াছে। চাকর ভণ্ডুল তাঁর মাথায় তেল মালিশ করিতেছিল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া 'জয় রাধে' বলিয়া বৈষ্ণবী খঞ্জনীর তালে তালে গান ধরিল,

যমুনায় জোয়ার এসেছে
(আজ) হৃদয় যমুনায়

বীরেশ্বরের ভাল লাগে। বৈষ্ণবী-সুকণ্ঠ, তার আন্তরিকতা মর্মস্পর্শী। গানের মধ্যে সে মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়।

একে একে বাড়ীর সবাই ভিড় করে, আশেপাশের বাড়ীর বধূরা আসিয়া জানালায় দাঁড়ায়। ছোটরা উঠানে। বীরেশ্বরের গৃহিণী বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন। গান থামিলে তিনি বলিলেন, আর একখানা গাও।

বৈষ্ণবী গায়, নূপুর চরণে এস কৃষ্ণ কানাই।

বীরেশ্বরের ছয় বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র আদরধন বলে, ও রকম নয়। নেচে নেচে গাও।

পদ্ম এবার শরীর দুলাইয়া দুলাইয়া গায়। শহরে সে নবাগত। কেহ চেনে না। তবে যে তার গান শোনে সেই মুগ্ধ

হয়। পদ্ম নিজেও ভাবে তার কণ্ঠে এত মাধুর্য আসিল কোথা হইতে?

বীরেশ্বর বলিলেন, বড় বৌমাকে বলে ওকে ভাল একটা সিধে এনে দাও, ভণ্ডুল।

বৈষ্ণবী তাকে যেন কিছু বলিতে চায়, লক্ষ্য করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন কথা আছে?

পদ্ম বলে, আজ্ঞা কর্তামশাই, একটা মামলা ছিল।

বেশ, ছুটির দিন এস।

আজ আপনার সুবিধা হবে? ও বেলায়?

জরুরী দরকার থাকলে আজই এসো।

পদ্ম চলিয়া গেলে বীরেশ্বরের স্ত্রী বলিলেন, দেখতে ত ভাল মানুষটি, এদিকে পেটে পেটে এত!

বীরেশ্বর বলেন, সব শোন তারপর রায় দিও।

সুন্দর মুখ দেখলে এ বয়সেও তুমি সব ভুলে যাও—বলিয়া গিন্নী হাসেন।

বৈকালে পদ্মের কাছে সব শুনিয়া বীরেশ্বর বলিলেন, তুমি কিছু জানতে না?

না বাবা। বারো বছর কিছুরই টের পাইনি।

রাখালগাছি হইতেঃ পদ্ম অজু ও পুলিসের পিছন পিছন ঘুরিয়াছে। থানায়, জেলের ফটকে, হাকিমের কুঠির দরজায়—গিয়াছে সর্বত্র। ফল কিছুই হয় নাই। কেহ হাঁকাইয়া দিয়াছে, কেহ করিয়াছে পরিহাস।

পুলিস একদিন অজুকে কাছারিতে আনিয়াছিল। পদ্ম এর বেশী কোন খবরই সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

বীরেশ্বর অজুর নাম, গ্রেপ্তারের স্থান ও তারিখ নোট বুকে লিখিয়া নেন। বলেন, পুরো নামটি কি বলত, অজয়, অজেন না অজিত?

তাও জান না? বেশ, তোমাদের প্রথম দেখা হল কোথায়?

পদ্ম বলিল, অজুর সঙ্গে তার পরিচয় লাউপালার আখড়ায়। সেইখানে দুইজনের কণ্ঠি বদল হয়। কেহ বৈষ্ণবকে অজু বলিয়া ডাকিত। কেহ বলিত অজ গোঁসাই।

বীরেশ্বর বলিলেন, তারপর এতদিন তার ঘর বাড়ী কোথায় তার খবরও নাওনি?

পদ্ম বলে, নাম শুধাইলে বলত বৈষ্ণবের আবার ঘরবাড়ী কি? ও সব ভাবা মানে বন্ধন বাড়ানো।

বেশ ওস্তাদ লোক দেখছি তোমার এই বোষ্টম।

পদ্ম বলে, আপনে এই শহরের উকিল গো মাথা। আপনে অরে বাঁচান।

বীরেশ্বর হাসিয়া বলেন, তুমি ভারী সরল মানুষ দেখছি। প্রায় বোকারই সামিল। যাক্ আস্‌চে রবিবারে এসো। দেখি কি করতে পারি।

তাঁর হাসিতে একটা অপূর্ব আন্তরিকতা ছিল। উহা অনুভব করিয়া পদ্ম প্রাণে বল পাইল। সে বীরেশ্বরের পদধূলি লইতে গেলে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, মেয়েরা হচ্ছ শক্তি রূপিণী। তোমাদের প্রণাম আমি নেই না।

পদ্ম সেই হইতে রোজই বীরেশ্বরকে গান শুনাইয়া যায়। ঠাকুরের নাম শুনিয়া বীরেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গে। তারপর ও শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ শোনেন, আনন্দ পান।

রবিবারের আগেই তিনি পদ্মকে বলিলেন, লক্ষীছাড়াকে বাঁচাবার জন্য তুমি অত অস্থির হয়েছ কেন?

পদ্ম কোন উত্তর করে না।

শুনলাম ও তোমাকে ফেলে আর একটা বোষ্টমীকে নিয়ে চলে এসেছে। পুলিসের ধারণা ওর সম্বন্ধে বড় খারাপ।

বীরেশ্বরের কথার উত্তরে পদ্ম শুধু বলিল, কত লোকেরে আপনে ফাঁসী কাঠের থা বাঁচাইছেন। অরেও বাঁচাইতে হবে।

তিনি যে বহুলোককে ফাঁসী কাষ্ঠ হইতে বাঁচাইয়াছেন এই খবর বৈষ্ণবীও জানে দেখিয়া বীরেশ্বর বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বলেন, চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, মা।

পদ্ম মনে খানিকটা বল পায়।

বীরেশ্বর বলিলেন, মামলা উঠতে দেরি আছে। পুলিস সাক্ষীদের পাত্তা পাচ্ছে না। তা ছাড়া অজুরও অসুখ। সে জেলের হাসপাতালে আছে।

পদ্ম বলে, আবার সেই অসুখ বাড়ছে বুঝি?

কোন অসুখ ছিল নাকি?

হ আজ্ঞা, আমাশা। রক্ত পড়ত। মরমর হইছিল। পিল-জঙ্গের ভরণ কবিরাজের ওসুধে যেই একটু কমল অমনিই পুলিস নিয়া আইল। আপনে একবার তার সঙ্গে আমার দেখা করাইয়া দেন।

কয়েকদিন পরে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। বীরেশ্বর জেল কর্তৃপক্ষের হুকুম করাইয়া নিলেন। তাঁর মুহুরী পদ্মকে জেলের ফটক পর্যন্ত পৌছাইয়া দিল।

পদ্ম আগেও জেলের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কিন্তু এরকমটি আর

কোনদিনও হয় নাই। তার বুক কেমন যেন ধুকধুক করিতে থাকে। আনন্দ কি আশঙ্কা এ ধুকধুকানি কিসের সে তো বোঝে না।

মাথায় টুপি, জাঙ্গিয়া পরা মানুষের দল, গলায় এক একটি করিয়া চাকতি ঝুলানো যেন কতগুলো নম্বর ওয়ালা জানোয়ার। কেহ মাটি কোপায়, কেহ সুরকি ভাঙ্গে, কেহ দড়ি পাকায়। একজনকে দেখিয়া পদ্মের বড় কষ্ট হয়। জেয়ান মরদ, পুরা পাঁচ হাত লম্বা, লোহার তৈরি শরীর। লোকটিকে ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘানির চাপে তার স্বাস্থ্য যৌবন এমন কি হাড়গুলাও যেন পিষ্ট হইয়া যাইতেছে।

মানুষটি একটুক্ষণ পদ্মের দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর আঙুল দিয়া কপাল ও গলার ঘাম মুছিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া আবার ঘুরিতে আরম্ভ করে।

একপাশে হাসপাতাল, লম্বা একতলা বাড়ী। সামনে বারান্দা।

তারপরই হলের মতন বড় একটা ঘর। সেখানে লোহার খাটে আট দশটি রোগী শুইয়া। নারীকণ্ঠ শুনিয়া যুবতী নারী দেখিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া ওঠে। একজন ত' উঠিয়াই বসিল।

পদ্ম অনুভব করে যে লোকগুলার দৃষ্টি তার উপর ন্যস্ত। সেই দৃষ্টি যেন তার গায়ে বিঁধিতে থাকে। সে অজুর খাটের সামনে যাইয়া দাঁড়ায়।

ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে মানুষটাকে চেনা যায় না। শীর্ণ মূর্তি, হাড়গুলি এক এক করিয়া সব গনা যায়। মুখের উপর কালির পোঁচ, চোখের মণি যেন দু'টুকরা মাছের আঁশে ঢাকা পড়িয়াছে। অজু বলে, কেডা?

পদ্ম উত্তর করে, আমি।

একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া অজু বলে, ও তুমি? আগে চেনতে পারি নাই।

সমস্ত বিস্মরণের মাঝখানে অশীতিপর বৃদ্ধের যেমন ধাঁ করিয়া একটা কথা মনে পড়িয়া যায়, অজুর অবস্থাও সেইরূপ। তীব্র আলোর হঠাৎ এক একটা জিনিস তার চোখে পলকের জন্য ধরা দেয়।

পদ্ম জিজ্ঞাসা করে, এরকম হৈছে কতদিন?

এখানে আসার পরই আবার আমাশা হয়। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর অসুখ বাহির হইয়া গেছে।

ভরণ কবিরাজগো ওষুধে ত' একবার আমাশা সারছিল। দেব তানারগো ওষুধ আনিয়া?

এখানে তা চলবে না। রাজার ওষুধে সারিয়া ওঠ, ভাল। না হইলে মর শালা পচিয়া গলিয়া। চোখ ত' গেছেই, এখন পরানডা থাকলে হয়।

তুমি ভাল হইয়া ওঠবা, চক্ষুও ভাল হবে। ভয় নাই বলিয়া পদ্ম অজুর খাটের পাশে বসিয়া তার কপালে হাত বুলায়, হাতের আঙুল টানে। তার কাহিনী শোনে।

পুলিস অজুকে গ্রামের থানা হইতে শহর কোতোয়ালিতে আনে। কোতোয়ালির হাজতে রাখে কয়েকদিন। সেখান হইতে একদিন কাছারিতে লইয়া যায়। তারপর জেল হাজতে। জেলে আবার আমাশা হয়। অবস্থা এমন খারাপ হইয়া পড়ে যে একদিন হাকিম আসিয়া তার জবানবন্দি লইয়া যান।

অজু বলিল, বেটা হাকিম না যেন গরুড়পাখী। নাসিকাটা চূড়ার মতন।

পদ্ম জিজ্ঞাসা করে, এনারা মারধর করে নাই ত?

অজু ফিসফিস করিয়া বলিল, আস্তে। এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। যে কথা হয় তাই ক্যামনে যেন উপরে চলিয়া যায়।

পদ্ম কমলালেবু ও ডালিম আনিয়াছিল। সে লেবুর কোয়া, ডালিমের দানা খুলিয়া খুলিয়া অজুর মুখে তুলিয়া দেয়। অন্য রোগীরা কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

পদ্ম বলিল, বীরেশ্বর বাবু কইছেন তুমি খালাস হবা। তিনি শহরের উকিলগো মাথা।

উকিলরা ওরকম কইয়া থাকে।

বলে টাকার জন্য। কিন্তু আমিত আর টাকা দেইনা।

তবে, তবে বলে কেন?—বলিয়া অজু পদ্মের হাত চাপিয়া ধরে।

আমি টাকা পাব কোথায়? তানারে গান শুনাইছি।

অজু রুক্ষস্বরে বলিল, গান শুনাইছ! থাউক, আমারে আর তোর রক্ষা করতে হবেনা। গান শুনাইয়া, পিরিত করিয়া—

কথাগুলি অজু বেশ চড়া গলায়ই বলে। ঘরশুদ্ধ লোকে ভাবে, ব্যাপারখানা কি?

পদ্মের লজ্জা করে। অজু যে স্বার্থপর তা সে জানে কিন্তু তাকে এতখানি নীচ কখনও ভাবিতে পারে নাই। পদ্ম বলে, বেশ আমি আর চেষ্টা করব না।

অজু বলে, না না, আমি তা কই নাই। চেষ্টা তুই-ই ত করবি, তা ছাড়া আর আমার আছে কেডা? বলিয়াই সে পদ্মের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরে। ঐ টুকুতেই পদ্ম সব ভুলিয়া যায়।

একটু পরে অজু বলে, টাকা পয়সা কিছু আনছিস?

হ। আনছি।

কত হবে?

পদ্ম তার হাতে দুইটি টাকা দিলে অজু বলে, বিড়ি দিয়াশলাইর জন্য আর ভাবতে হবে না। বড় তামাকও দু'একবার—

পদ্ম বলিল, গাঁজা আর তুমি খাইও না, লক্ষীটি—

বেশ। তুই যখন কইলি, তখন আর ছোঁব না। তবে একটা দিন—যাক্ আর গোটাকয়েক টাকা হইলে মেট ওয়ার্ডার সব শালারে হাত করিয়া ফেলতাম। এমন কি ঐ মাইয়া পাহারাওয়ালারে পর্যন্ত—

পদ্ম বলিল, সে কেডা ? ঐ যে সিঁড়ির ধারে বসিয়া আছে ?

ঠিক। ও পাহারাওয়ালা নয়, জমাদারনি : গোঁফ আছে, আর সোয়ামিরে ধরিয়া মারে তাই সকলে ডাকে পাহারাওয়ালা।

পদ্ম সিঁড়ির পাশে ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া আসিয়াছিল। বিড়ি টানিতে টানিতে সে একটা কুকুরকে আদর করে। অদ্ভুত আদর! সে কুকুরটাকে ডাকে "জন"। জন ছুটিয়া আসে। স্ত্রীলোকটি বেত দিয়া সপাসপ মারে। কুকুরটা পালাইয়া যায় কিন্তু ডাকিলেই আবার আসে।

পদ্ম বলিল, শুধু কুকুররে না, সোয়ামীরেও মারে? কিন্তু পর মুহূর্তেই ঐ মেয়েটির প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞ হইয়া ওঠে। দুর্বল নারীজাতির হইয়া অন্ততঃ একটি নারীও যে পুরুষ মানুষের উপর প্রতিশোধ লইতে পারে ইহাতে পদ্ম হয়ত খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করে।

জেল হইতে সে বাহির হইল প্রায় আধঘন্টা পরে। বিষণ্ণ মন, পা যেন আর চলে না। সে ভাবিতেছিল, এই মানুষটার সঙ্গে সে এতদিন ঘর করিল, খুনী আসামী জানিয়াও দুইটা জেলা তার পিছন পিছন ঘুরিল, যমের হাত হইতে তাকে ছিনাইয়া আনিল—আর সে কিনা একবার জিজ্ঞাসা করিল না, কেমন আছিস পদ্ম!

শুধু কি তাই ? তারই জন্য উকিলের কাছে গিয়াছে বলিয়া তাকে সন্দেহ করিল।

নিজের ভাগ্যদেবতাকে পদ্ম আজ ধিক্কার দিল। দেবতা তাকে প্রেমের গোলকধাঁধায় প্রবেশের পথই চিনাইয়াছেন কিন্তু বাহির হইয়া আসিবার উপায়টি বলিয়া দেন নাই।

আঠার

প্রথমে ইন্দুপ্রকাশ মুক্তি পান। জেলে তিনি পান এক নবজীবনের সন্ধান। তাঁর মন ক্রমে ক্রমে অন্তর্মুখী হইয়া ওঠে। ভয় ভাবনা কিছুই থাকে না।

তিনি আসিয়া দেখেন নারায়ণের ভিটা খাঁ খাঁ করে। কতকটা পুলিসের ভয়ে, কতকটা বা নেতার অভাবে কংগ্রেসের কাজ একেবারে বন্ধ। কংগ্রেস কমিটি যদিও বে-আইনী ঘোষিত হয় নাই তবুও লোকে ভরসা করিয়া নারায়ণের ভিটার ধারে ঘেঁষে না। প্রতিটি ঘরে তালা লাগানো, কোনটা মরিচা ধরা, কোনটা বা ধূলি সমাকীর্ণ। ঘরগুলি আরশুলা ও চামচিকার লীলাভূমি। কোণে কোণে মাকড়সার জাল।

তিনি ঐ ভিটায়ই আবার কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্র খুলিলেন। রাণীডাঙ্গার কেহ কেহ বলিল, কংগ্রেসের আপিস এবার আমাদের ওখানে খুললে হত না?

ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, না শঙ্করই ঠিক করেছিল। জাতির প্রাণমর্ম যে কুরপালায়।

দু'চারজন করিয়া লোক আসিতে আরম্ভ করে। জুড়ানিকে লইয়া হাজু আসে, আসে ভজহরির ছেলে শ্রীহরি ও নরহরি। আসে কোরকান। আবার চরকার মৃদু গুঞ্জন ওঠে, শোনা যায় তাঁতের খট্‌খটাখট্‌ শব্দ।

বিষ্ণু চাটুয্যে কারাগারে; তাই ইন্দুপ্রকাশকেই শিক্ষার ভার নিতে হয়। তিনি দুপুরে মেয়েদের পড়ান, সন্ধ্যার পর পুরুষদের। পিতা পুত্র, মাতা ও কন্যা একত্রে পড়ে। বৃদ্ধ ও কিশোর এক সঙ্গে মুখস্থ করে, অজ, আম, ইট।

নূতন শিক্ষার্থীদের উৎসাহ অদ্ভুত। নাম স্বাক্ষর করিতে পারাই তাদের কাছে একটা মস্ত বড় ব্যাপার। কেহ অ আ ক খ লিখিয়াই ইন্দুপ্রকাশকে আসিয়া বলে, ত্যাখেন ত' দাদাঠাকুর, লিখনটা হৈল কি রকম?

একদিন শ্রীহরি আসিয়া পরম উৎসাহের সহিত কহিল, দাঠাকুর খুব আউগাইয়া গেছি—বলিয়াই সে ইন্দুপ্রকাশের চোখের সামনে একখানা কাগজ ধরে। ধবধবে সাদা চাদরের উপর কাদা পায়ে হাঁস হাঁটিয়া গেলে যেমনটি হয়, কাগজের উপর সেইরূপ কতগুলি দাগ। ইন্দুপ্রকাশ একটুক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, তুমিই পড় শ্রীহরি।

শ্রীহরি পড়িয়া শুনাইল—

নাম—ছিরি হরি। পিতা—ভজহরি। সাকিন—কুরপালা। পেশা—সুদেশী। কেমন হইছে দাদাঠাকুর?

বেশ হয়েছে। এত অল্পদিনের মধ্যে যে রকম শিখেছ তাতে ভালই হবে—বলিয়া ইন্দুপ্রকাশ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক ছাত্রকে উৎসাহিত করেন।

গঠনমূলক সবরকম কাজই চলিতে থাকে। আবার লোকে হাট-বাজারে যাওয়ার সময়ও তকলি লইয়া বাহির হয়। হাঁটিতে হাঁটিতে, কথা বলিতে বলিতে তকলিতে পাক দেয়।

বঙ্কিমও এবার কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্য করে। তাছাড়া কুরপালার তাঁতী জোলাদের সুতা দাদন দিয়া, অগ্রিম টাকা দিয়া, ফরমাশ মতন ধুতি ও শাড়ি তৈয়ারী করাইয়া নেয়। সেগুলি চালান দেয় ঢাকা ও কলিকাতায়।

এই সময় রাণীডাঙ্গার কংগ্রেস-কর্মীরা নারায়ণের ভিটায় এক ভোজের ব্যবস্থা করে। কুরপালা ও রাণীডাঙ্গার কংগ্রেসীরা সকলেই নিমন্ত্রিত হয়।

অন্ততঃ কর্মীরা সবাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে যাতে পরস্পরের জল গ্রহণ করে—এই ছিল উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটিল। একটি কাহার ছেলে জল দিতে গেলে কানাই সর্দার বলিয়া উঠিল, ওমা, শেষটায় ভুঁইমালীর জল খাইতে হবে? একী সম্ভোগ? সম্ভোগ অর্থাৎ সম্ভব।

যোগেন কাহার একপাশে খাইতে বসিয়াছিল। সে বলিল, সম্ভোগ নয় কেন শুনি? তোমরাও ত' জালিয়া।

কানাই বলে, জালিয়া জাত আর কাহারও জাত।

তখনই প্রায় লাঠালাঠির সূত্রপাত। ভোজটা পণ্ড হইয়া যায়। গোলমাল চলে অনেকদিন। ব্যাপারটা জেলে ও কাহারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। নানা জাতির মধ্যে কে বড়, কে ছোট ইহা লইয়া যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে। ছোট কেহই নয়, বামুন কায়েতের নীচে কেহ নামিতে চায় না। বড় জোর বৈশ্য, শূদ্র নয় কেহই।

জটলা তর্কাতর্কি ত' আছেই, কখনও মারামারি পর্যন্ত হয়। কাহার ও চামারকে সমান বলায় কাহাররা একদিন ডহর পাড়ার নির্জন পথে বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্যের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দেয়। বৈকুণ্ঠ মামলা করে।

এই গোলমাল থামাইতে যাইয়া ইন্দুপ্রকাশকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। তিনি বাড়ী বাড়ী যাইয়া বলেন, গোলামের জাতে শূদ্র ই ত সবাই। বামুন আবার কে?

লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, একটা মানুষের হাতের জল খাইলে আর এক জনের, কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

যদু নাপিত বলে, একী কন দেবতা? চাঁড়াল আপনারে জল দিলে আপনার বদহজম না হইতে পারে কিন্তু চাঁড়াল বেটার ত নরকেও ঠাঁই হবেনা।

ইন্দুপ্রকাশ হাসিয়া বলেন, নরক আছে কিনা জানিনা। তবে ও জন্য কাউকে নরকে যেতে হয় না।

রামায়ণে রামচন্দ্র নাকি কইছেন।

তিনিই ত' গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন রে ভাই।

যোগেন কাহার বলিল, সে শুধু একজন ভাগ্যমন্তের বেলায় খাটছে।

ইন্দুপ্রকাশের ব্যক্তিগত প্রভাবে মামলা মোকদ্দমা, দ্বন্দ্ব কলহ বন্ধ হয় বটে কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেন যে সমাজ জীবন হইতে এই বিষ দূর করা তাঁর সাধ্যাতীত। তার জন্য চাই ব্যাপক শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন।

এই কয়মাসের মধ্যে রূপমতীর পারে যতখানি জমি তার দরকার বঙ্কিম কুণ্ডু তার প্রায় সবটাই দখল করিয়া লইয়াছে। জমিদারী স্বত্ব আগেই পাইয়াছিল, এবার পাইল প্রজাস্বত্ব।

লোকে জমি ছাড়িয়া ভিটা ছাড়িয়া যায়। গরু বাছুর হাল লাঙ্গল লইয়া রূপমতীর ওপারে চিতসি, রায়পাশায় যাইয়া ঘর তোলে। একদল যায় মধুমতীর চরে।

কারখানার জন্য মাটি কাটিয়া নীচু জমি ভরাট করা দরকার। কিন্তু মাটি কাটার জন্য বঙ্কিম দেশে লোক যোগাড় করিতে পারিলনা। চাষীদের সমাজ-বন্ধন আছে, আছে মর্যাদা। নিজের দেশ গাঁয়ে মাটিকাটা ও কুলীগিরি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বঙ্কিম শেষটায় বাহির হইতে কুলী কামিন আনাইল। রূপমতীর তীর হইতে পূবে আধ মাইল এবং কুরপালার সর্দার পাড়া হইতে ছল্লিমোহনের খাল পর্যন্ত সমস্ত মাঠ জুড়িয়া আরম্ভ হইল এক অপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য। মাটি

হইতে হয় ইট, ইট হইতে সুরকি। কুলীরা মাটি কোপাইয়া রাস্তা বাঁধে, দুরমুশ করে। নাগপুরী করাতীরা করে কাঠ।

কুলীদের জন্ত মাঠের মাঝখানে বঙ্কিম ছোট ছোট ডেরা তুলিয়াছে। বাঁশের খুঁটির উপর হোগলার ছাউনি। চারদিকে দরমার বেড়া। ঘরগুলি এত নীচু যে ভিতরে সোজা হইয়া বসিবার উপায় নাই। ঢুকিতে হয় হামাগুড়ি দিয়া।

কিন্তু মানুষগুলা মহাসুখে আছে। স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া রোজগার করে। পিঠে বোঁচকার মধ্যে শিশু বাঁধিয়া মেয়েরা শুধু ঘরকন্নাই করেনা, পুরুষদের সঙ্গে মাটি টানে, ভারা বাহিয়া মাল যোগান দেয়। এর মধ্যেই দু' তিনটি নারী সন্তান প্রসব করিয়াছে।

কুলীরা ভাত পচাইয়া একরূপ উগ্র মদ তৈয়ারী করে, নারী পুরুষে মিলিয়া সেই মদ খায়, রাত্রে এক একদিন খড়কুটা জ্বালাইয়া তার ধারে বসিয়া মাদল বাজায়, গান গায়, নৃত্য করে। কুরপালার বাসিন্দারা বলে, মাইয়া পুরুষে মিলিয়া ধেই ধেই, সাধে কি কইছে ছোটলোক।

রূপমতীর খেয়া-ঘাট দক্ষিণে পাঠান-পাড়ার মধ্যে সরিয়া গিয়াছে, মাঝিপাড়ার কোন চিহ্নই নাই। বঙ্কিম গ্রাস করিয়াছে সবই। পারে নাই শুধু হাস্তের দরুন দুই বিঘা।

হাস্তের কাছে লোক গেলে সে বলিল, ওই জমি আমার সোয়ামীর শেষ চিহ্ন। ওটুক্ আমি ছাড়ব না।

জমিটা বন্ধক ছিল বলতলির সিকদার সাহেবের কাছে। তাঁর কাছেও কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া বঙ্কিম বলিল, দেখি সর্দারনি ও জমি ভোগ করে কি করে?

উনিশ

খবরটা বাতাসের আগে আগে ছড়াইয়া পড়ে। সংবাদপত্র পৌঁছিবার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে কুরপালা গান্ধী-আরউইন চুক্তির খবর জানিতে পায়। প্রথমে শোনে নিধিরাজ।

রামনাথ সেনের ছেলে কলিকাতায় পড়ে। সে বাড়ী ফিরিতেছিল। রাণীর খালে নৌকা হইতে নিধিরাজকে ডাকিয়া বলিল, দাঠাকুরকে বল গিয়ে, বড়লাটের সঙ্গে গান্ধী মহারাজার চুক্তি হয়ে গেছে।

নিধিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, জেতল কেডা?

রামনাথের ছেলের উত্তরটা সে শুনিতে পাইল না। ছুটিয়া গিয়া ইন্দুপ্রকাশকে বলিল, একেবাঁরে জয় জয়কার দাদু।

হল কি নিধিরাজ?

বড়লাট্ গান্ধীর সঙ্গে মিটাইয়া ফেলছে।

খবরটা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হয়। হাস্ত তিনবার শঙ্খধ্বনি করে। ইন্দুপ্রকাশ প্রার্থনা করিয়া নিজ হাতে কংগ্রেস আশ্রমের দরজায় একটি মাটির প্রদীপ জ্বালেন। নিধিরাজ প্রশ্ন করে, বাজি পোড়া না দাঠাকুর? আর গোটাকয়েক পটকা—

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, গান্ধীর নিয়ম তা নয়।

যত সব নিরামিষ্যি নিয়ম—বলিয়া নিধিরাজ একটা মশাল জ্বালাইয়া লয়।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, ও দিয়ে কি হবে নিধিরাজ? যাই, কমিশনসার আপিসে একটা খবর দিয়া আসি।

ইন্দুপ্রকাশ হাস্তের দিকে চাহিয়া কহিলেন, নিধে একটা আস্ত পাগল। চলল এখন পাঁচ মাইল পথ।

মাথার উপর মশাল তুলিয়া জাতির জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিখিরাম ততক্ষণে তেঁতুলে ভিটার বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

ইন্দুপ্রকাশকে নিরালায় পাইয়া হাস্ত প্রশ্ন করিল, এবার স্বদেশীরা সব খালাস পাবে ত' দাদু?

ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, হ্যাঁ ভাই।

কয়েকদিন পরের কথা। গহনার নৌকা হইতে নারায়ণ যখন কুরপালায় নামে তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। শুক্লা-একাদশীর চাঁদ সারা মাঠে মিঠা আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু এ কী। সবই যে অচেনা মনে হয়। পথের মধ্যে মধ্যে খানা ডোবা। দু'পা আগাইতে সামনে পড়ে তারকাঁটার বেড়া। মাঠের এখানে ওখানে চুল্লী জ্বলে। কানে আসে নতুন নতুন শব্দ, অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

একটা বিরাটকায় কালো মানুষ তার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। লোকটার মাথায় বাবরি, বুকের ছিনা যেন একখানা পাথরের শিল। সে বলে, তুঁ কে বটেক?

নিজের গ্রামে অজানা লোক আসিয়া বাড়ী যাইতে বাধা দিবে এও ত উৎপাত মন্দ নয়। নারায়ণ একটু বিরক্তির সহিতই বলিল, তুমি মানুষটা কেডা বট?

কালো মূর্তি উত্তর করিল, হামি কুণ্ডুবাবুর মজুর ভোই।

নারায়ণ উত্তর করিল, হামি এই গাঁয়ের আদমি ভোই।

কালো মূর্তি বলিল, যা, উপপে যা। সামনে রসুই ভোইছে।

নারায়ণ চলিতে থাকে। সোজা যাইবার উপায় নাই। সামনে কোথায়ও গর্ত, পাশেই ধুলা বালির স্তূপ। গ্রামখানায় যেন ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

নারায়ণ হাস্তের দরজায় যাইয়া ডাকে, হাস্য বোঠান।

হাস্ত জিজ্ঞাসা করে, নাড়ু ঠাকুরপো নাকি?

হু।

হাস্ত দরজা খুলিয়া বলে, আইস। খালাস হইছ কবে?

নারায়ণ বলিল, পরশু দিন।

সে বারান্দায় উঠিলে কাচের কুপির আলোয় তাকে দেখিয়া হাস্ত বলিল, এ কী? এমন ছিরি হইছে যে?

থানায় পড়িয়া গেছিলাম। 'বেটারা মাঠটারে যা করিয়া রাখছে।

ছালটাল যায় নাই ত'? জল আনিয়া দি, তুমি গা ধুইয়া ফেল।

তুমি বড় ভাইর বউ, গুরুজন। তোমার আর জল আনতে হবে না। নিজেই ঘাটে যাইয়া নাইয়া আসি।

হাস্য বেতের তৈরি গোল ঝাঁপি খুলিল। তাতে ছিল শঙ্করের ফরমাশী কাঁথা, থানকয়েক নূতন কাপড়। কাপড়গুলি হাস্য নিজে বুনিয়াছে, উহা বেচিয়া আজকাল তাদের দিন চলে, তার ও জুড়ানির অন্ন সংস্থান হয়।

একপাশে একখানি জোলার কাপড় ও লাল গামছা। এই কাপড় পরিয়া, গামছা কাঁধে ফেলিয়া জগু রামেন্দ্র রায়ের বাড়ীতে দারোগার সঙ্গে দেখা করিতে যায়। স্বামীর শেষ চিহ্ন হিসাবে হাস্য ঐ দু'খানিকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল।

বিক্রির কাপড়ের মধ্য হইতে নারায়ণের জন্য একখানি বাহির করিয়া সে জুড়ানিকে ইশারায় বলিল, কুপিটা লইয়া ওনার সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাও।

জুড়ানি ঘাটের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলে, ঘা—ঘা? তারপর নারায়ণের দিকে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া ইঙ্গিতে জানায়—বুঝিয়াছি, ওকে ঘাটে লইয়া যাইতে হইবে।

কাজের ভার পাইলে বরাবরই সে আকারে ইঙ্গিতে, অর্ধস্পষ্ট ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করে। ইন্দুপ্রকাশ তাই তাকে বড় ভালবাসেন, ডাকেন মহারাণী বলিয়া।

নারায়ণ ঘাট হইতে আসিয়া দেখে হাস্ত তার জন্য একটা থালায় মুড়ি, নারিকেল ও খেজুরে গুড় সাজাইয়া রাখিয়াছে।

নারায়ণের খুব ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়া আরও চারটি চাহিল। তার পাতে মুড়ি ঢালিয়া দিয়া হাস্ত বলিল, আর সকলে পিছনে আসতেছে বুঝি?

নারায়ণ কহিল, আইছে অনেকেই।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হাস্য জিজ্ঞাসা করিল, দাদাবাবু?

ঠিক কইতে পারিনা। শেষে শঙ্কর দাদাবাবুরে অন্য ফাটকে নিয়া গেছে।

শোনলাম গান্ধীর লগে মিটমাট হইছে। সকলটিরে এবার ছাড়বে।

শুনছি ত' আমিও।

শঙ্কর মুক্তি পায় নাই কিন্তু সে পাইয়াছে, ইহাতে নারায়ণ কেমন সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। এবং সেই ত্রুটি ক্ষালনের জন্যই যেন বলিল, তানারা বড় কিনা। তানারা গো বেলায় একটু দেরি ত' হবেই।

হাস্ত বলিল, তুমি বসিয়া বসিয়া জেলের গল্প কর। আমি ততক্ষণ চারটা চাউল চড়াইয়া দি।

না। আমি দাঠাকুরের কাছে পেরসাদ পাব।

সেখানেও পাঠ উঠিয়া গ্যাছে। পাঁচ সাতজন যারা থাকে তারা নিজ নিজ বাড়ীতে খাইয়া আসে। শুধু দাদাঠাকুর একবেলা ভাতে-ভাত সিদ্ধ করিয়া নেন।

হাস্ত উনান ধরায়, জুড়ানি 'মসলা পেষে। নারিকেলের বড়া নারায়ণের খুব পছন্দ। ডাল ও বড়া পাইলে সে আর কিছুই চায় না।

নারিকেল ফুরাইয়া গিয়াছিল। জুড়ানিকে বড়ার জন্ত ডাল বাটিতে বলিয়া হাস্ত পাশে কানাই সর্দারের বাড়ী নারিকেল ধার করিতে যায়।

দুজনে মিলিয়া সজিনা চচ্চড়ি লাউর ঘণ্ট, নারিকেলের বড়া রাঁধে এইরূপ তিন চারটি পদ। আর নারায়ণ জেলের গল্প করে। খালি স্বদেশীওয়ালাদেরই জেল। হাজারের উপর কয়েদী, তাদের মধ্যে পড়ুয়াই বেশি। তবে বড় বড় লোকের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, ডাক্তার উকিল মোক্তার কবিরাজ এই সব।

কাজ ছিলনা কিছুই। খালি খাও আর গল্প কর। অবশ্য খাওয়াটা ভাল নয়।

কয়েদীরা গোলমাল করায় দু'দিন পাগলা ঘণ্টি বাজিয়াছিল। গোলমাল হইলে, কেহ পালাইয়া গেলে এইরূপ ঘণ্টি বাজে। তখন কয়েদীদের নিজ নিজ ঘরে ছুটিয়া যাইতে হয়।

হাস্য জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা মার খাও নাইত?

দাদাবাবুরে একদিন চড় মারছিল।

শঙ্করের বাড়ীর দিকে হাত দেখাইয়া হাত উঁচু করিয়া জুড়ানি জিজ্ঞাসা করিল, হুঁ, হুঁ—তারপর নিজের গালে এক চড় মারিয়া নারায়ণের দিকে চাহিয়া রহিল।

নারায়ণ বলিল, হ। দাদাবাবুরেই।

হাস্য বলিল, দাদাবাবুরে চড়!

ওরা বড় ছোটর ধার ধারে না, হাস্য বোঠান।

মারছিল কেন?

দাদাবাবু সরকার সেলাম দেয় নাই বলিয়া।

সরকার সেলাম কয় কারে?

ফাটকে সুপারিন্‌টেন বা বড় কেউ আইলে সেলাম করতে হয়।

হাস্ত বলে, তার জন্ত চড়!—খানিকটা পরে সে আবার জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি করতা?

আমি লেখাপড়া শিখছি প্রথম দাদাবাবুর কাছে। তার পরে প্রসূন বলিয়া এক ডাক্তারের কাছে। লেখন পড়ন ত' তিনি শিখাইছেই তা ছাড়া শরীরে ক্যামনে রক্ত চলাচল হয়, ক্যামনে আমরা নিঃশ্বাস নি, হজম করি—এ সবও বুঝাইয়া দিছে।

নারায়ণ বহুভাষী নয়। কিন্তু অনেকদিন পরে ছেলেবেলার খেলার সাথী হাস্ত বৌদিকে পাইয়া সে আজ প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে লাগিল।

জেলের বাবুদের সে কাঠের কাজ করিয়া দিয়াছে। কারও চেয়ার টেবিল। কারও বা আলনা। সে প্রায়ই বাবুদের বাড়ী খাইত। ভাল খাবার পাইলে আদমকে আনিয়া দিত। প্রসূন ডাক্তারকে নস্ত যোগাইত। তিনি মধ্যে মধ্যে খাবার খাইতেন। কিন্তু দাদাবাবু খাইতেন না।

নারায়ণের দুঃখ করিত ইউসুফ মেহেরের জন্ত। জেলার ফটক হইতে সকলকে যখন স্বদেশীদের জেলে পাঠায়, ইউসুফকে তখন জেলার ফাটকেই রাখে। তাকে থাকিতে হয় চোর ডাকাতের সঙ্গে।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ইউসুফ খালাস হইছে কইতে পার?

হাস্ত বলিল, তিনি কালই আইছে।

রাত দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নারায়ণ নিজের ভিটার দিকে রওনা হয়।

উঠানে ধবধবে জ্যোৎস্না। পুবে এক পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়া, সাদার মধ্যে কালোর চক। ছায়ার শেষ প্রান্তে একটা পেয়ারা গাছ,

অদ্ভুত তার গড়ন। গাছটা মাটির হাত খানেক উপর দিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। চাঁদের আলোয় গুঁড়িটাকে ইস্পাতের নলের মতন দেখায়। হাস্ত অর্থহীন ভাবে ঐদিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু তার মন তখন জেলের মধ্যে। সে ভাবে কারাজীবনের কথা, জেল দেখে নাই কিন্তু জেল সম্বন্ধেও একটা ধারণা করিয়া লয়।

বিরাট বাড়ী, উঁচু দেওয়াল—এত উঁচু যে মাথা তুলিয়া চাহিলে ঘোমটা খসিয়া পড়ে। ফটকে মস্ত মস্ত লোহার গরাদ। তালা খোলার সময় ঝনঝন শব্দ হয়। গালপাট্টাওয়ালা সেপাই সান্ত্রীরা গর্জন করিতে করিতে চারদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই জেলে শঙ্কর দাদাবাবু আছে। ছিল বিষ্ণু দাদাবাবু, রাণীডাঙ্গা কুরপালার আরও অনেকে।

খানিকটা পরে তার মনে হয়, এ কী পাগলামী! জেলের কথা সে ভাবে কেন?

কি যে আশা করিয়াছিল নারায়ণই জানে। হাস্ত তাকে যথেষ্ট যত্ন করিল, তাদের ঘরের মেয়েরা এত যত্ন করে না, করিতে জানে না। অথচ নারায়ণের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। এই অতৃপ্তির বেদনা লইয়া সে রাত কাটাইল।

রাত্রে ইন্দুপ্রকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। নারায়ণ ভোরে উঠিয়া দেখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গুনগুন করিতেছেন। সমস্ত শব্দ নারায়ণের কানে যায় না। শুধু একটি কথা বার বার শুনিতে পায়, শিবং।

এর মধ্যেই ইন্দুপ্রকাশের স্নান শেষ হইয়া গিয়াছে। কপালে চন্দন তিলক, দেখিলে মনে হয় সন্ধ্যা আহ্নিকও সারিয়া লইয়াছেন। মুখে

ফুটিয়াছে স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব, যেন আনন্দরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। নারায়ণ অপলক নয়নে তাঁর দিকে চাহিয়া থাকে। তারও মন আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

ইন্দুপ্রকাশের স্তব পাঠ শেষ হইলে নারায়ণ তাঁর পায়ের ধুলা নেয়। তিনি আশীর্বাদ করেন, মানুষ হও নাড়ু। জেলে ছিলে কেমন? আকালী বিষ্ণু ওদের খবর কি?

ভালই ছিলাম। ওনারাও খালাস পাইছে। তবে জেলে শোনলাম দাদাবাবুর শরীর ভাল না।

শঙ্করের! কি হয়েছে? সেদিন বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা, কই তিনি ত' কিছু বললেন না।

ওনারগো বাপ-বেটায় ভারী মনান্তরি হইছে কিনা।

মনান্তর কি নিয়ে?

দাদাবাবুর বাবা ফটকে যাইয়া তানারে একখানা কাগজে সই করিয়া দিতে কইছিল, মুচলেকার কাগজ।

দাদাবাবু এ্যামনে ত' ক্যাদার মতন, উরুক্ষু হইতে জানে না। কিন্তু বাপের কথা শুনিয়া তানার এত রাগ হইল যে দুই একটা ইঞ্জিরি বাক্যও কইয়া ফেললেন। শেষটায় বললেন, আমারে অপমানী করতে তুমি আর আসিও না, বাবা।

ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, তুমি জানলে কি করে?

এ বেত্তান্ত ঘটল আমারগো ফটকে। তারপর দাদাবাবুরে অন্য জেলে নিয়া গেল।

তাই দেখি বিশ্বনাথের মন-মরা ভাব। যাক, অভ্যাস হয়ে গেলে শঙ্করের শরীর ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম জেল অনেকেরই সহ্য হয় না।

জনের জুড়ি কি আর দ্যাশে আছে। তুই তবু তামুক খাস, ও তাও খায় না। তাছাড়া তুই বউর কথায় ওঠা-বসা কর, মায়েরে—

কোরফান হাসিয়া বলে, সাদি হোক, তখন নাড়ুও তাই করবে।

এবার হাসাহাসি পড়িয়া যায়।

বন্ধুকে লইয়া নারায়ণ গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হয়। দেখে গ্রামের এক নতুন রূপ। গত রাত্রেও এতটা কল্পনা করিতে পারে নাই। নদীর ধারটা বিশেষতঃ কুরপালার উত্তর পশ্চিম দিকটা একেবারেই খালি হইয়া গিয়াছে। যেখানে গৃহস্থের বাড়ী ছিল, সেখানে ইট সুরকির সড়ক। গো-চারণ ভূমির উপর ওভারসিয়ারদের থাকিবার অস্থায়ী চালা।

কুরপালাকে আজ চিনিবার উপায় নাই। নদীর ধারে এক মাইলের উপর লম্বা বাঁধ। পাশেই তারকাঁটার বেড়া। কোথায়ও বেড়ার জায়গায় দেওয়াল উঠিতেছে। বেড়ার ভিতরে লোহার বিরাট ফ্রেম, যেন লোহা ও ইস্পাতের একটা সীমাহীন জঙ্গল।

মানুষ ও কল সমানে কাজ করে। রাজমিস্ত্রী ইটের পর ইট গাঁথে, মেয়ে-পুরুষে ভারা বাহিয়া মাল যোগান দেয়। পুরুষরা রাস্তা বাঁধে, টিউবওয়েল বসায়। নল বসানো দেখিতে ছেলে বুড়ো সকলেই আসিয়া ভিড় করে।

অদূরে শোনা যায় ছাদ পেটার গান। মেয়ের দল তালে তালে ছাদ পেটে আর সুর করিয়া গান গায়, ভাষা বোঝা যায় না কিন্তু নারায়ণের কানে বেশ মিষ্টি লাগে।

অক্রুর আখড়ার উত্তরে ছিল একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। রাত্রে লোকে সেখানে ভয় পাইত। সেই গাছের তলা আজ চৌরাস্তার মোড়। নারায়ণ বলে, সাগর বৌয়ের ডোবাটা কোথায় রে কোরফা?

সেটা কারখানার মধ্যে পড়ছে।

ছেলেবেলায় এই পথ দিয়া যাইবার সময় নারায়ণ প্রতিবারই এই ডোবার উদ্দেশে প্রণাম করিত। তার জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র জলাশয়ের সম্পর্ক সে জানিত। কারখানা সেটাকেও গ্রাস করিয়াছে শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, রাক্ষুসে কল ডোবাটারেও গেলছে।

গিলিয়াছে সবই। নদীপারে চাষীদের নিজের বলিতে এক বিঘা জমি নাই। শুধু এক জায়গায় একফালি জমি তার কাঁটায় বাহিরে পড়িয়াছে। মিলের বেড়া এই জমিটুকু ঘুরিয়া আবার সরল রেখায় নদীর পার দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নারায়ণ বলিল, জমিটুকু কাররে ভাই?

কোরফান বলিল, তোমারগো জগু সর্দারের। বাঁকা কুণ্ড তার বোরে কত ভয় দেখাইল, টাকার লোভ দেখাইল। সর্দারনি তবু জমি ছাড়ল না। সাবাস মাইয়া বটেক।

খানিকটা দূরে, উত্তরে ডুইটা উঁচু চোঙা খালি ধোঁয়া ছাড়ে। শব্দ করে, মনে হয় যেন হাঁপায়। মধ্যে মধ্যে ছাড়ে আগুনের ফুলকি।

শুধু মাটির রূপই নূতন নয়। দেখা যায় অনেক অচেনা মুখ। অভিনব পোষাক। পাগড়িওয়ালা শিখ, গোল টুপি পরা করাতী কোমরে ন্যাতা জড়ানো হাজারিবাগের কুলী, মাটি মাখা বুনো বাউরী, বঙ্কিম নানা দেশের লোক আনিয়া জড় করিয়াছে।

কোরফান একজনকে দেখাইয়া বলে, উনি সর্বেশ্বর বাবু, আর ঐ নাকমোটা বাঙ্গালী সাইব, অনার নাম ড্যামসেন।

কুলী মজুররা সব ওভারসিয়রকে বলে, সর্বেশ্বর। আর যে লোকটি কথায় কথায় তাদের ড্যাম সোয়াইন বলে, তার নাম ড্যামসেন। নানা দেশের নানা জাতির লোক জড় হওয়ায় গ্রামের আগের দিন আর নাই।

নাই সে ভ্রাতৃভাব আর আন্তরিকতা। ঘন ঘন চুরি ডাকাতি শুরু হইয়াছে।

পথে একটা লোকের সঙ্গে দেখা, তার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গালভরা পাকা দাড়ি, পরনে গামছা, গায়ে ওয়েষ্ট কোট। সে মাথার উপরে একটা দড়ি ঘুরাইতেছিল। একটু লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ বলিল, আমারগো নসীখুড়া না? তার এই দশা!

কোরফান কহিল, ওনার জমি জিরাত ত' গেছেই। ভিটাটুকুও আর নাই। মানুষটা সেই শোকেই পাগল হইয়া গেল।

কেহ পাগল বনিয়াছে। কেহ ভিটাছাড়া হইয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। যারা যাইতে পারে নাই, তারা দেশেই দিনমজুরি করে। একদল ভিক্ষা করিয়া খায়।

অশ্বিনীরা মধুমতীর চরে যাইয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ওয়াজেদরা বাঘিয়ার বিলে। এক একটা দল দেশ ছাড়িয়া গাং দিয়া নৌকা বাহিয়া যায়, গাং পারে তখন ভিড় জমে। নৌকার লোকেরা পারের লোকের দিকে চায়, পারের লোকে চায় নৌকার দিকে।

এই রকমই একদিন। সানা মিয়া পুত্র পরিবার ধান চাল লইয়া নৌকায় রূপমতী পার হইতেছিল। তার গাই বলদ নদী সাঁতরাইয়া যাইতেছিল। গরুগুলি এর চেয়েও কত বড় নদী পার হয়। কিন্তু সেদিন সানা মিয়ার চন্দু নামে ষাঁড়টা জলে ডুবিয়া গেল।

ঘটনাটা বলিয়া কোরফান কাপড়ে চোখ মোছে। তারপর আবার বলে, সানার সেই ষাঁড়টারে লড়তে শিখাইছিলাম আমি।

মাঠের উত্তরে চল্লির খাল পারে বড় একখানা পাকা ঘর উঠিতেছে। উহা দেখাইয়া কোরফান বলিল, ওইটা হবে বিজলি ঘর। ওই ঘরের

যা রোশনাই দিয়া সারা কারখানায় জলুস ছড়াইয়া দেবে, কলও চলবে ঐ বিজলিতে।

ছড়ির খালের ও পারে ঐ যে দেওয়াল উঠতেছে ওখানে হবে বাকা কুণ্ডুর বাড়ী।

গ্রাম ঘুরিয়া নারায়ণ ফিরিল বেলা একটায়। আসিয়াই শুনিল নিধিরাজের জেল হইয়াছে। অপরাধ থানার সামনে জয়ধ্বনি করা।

মশাল জ্বালিয়া সে ফণিমনসায় গান্ধী আরউইন খবর দিতে যায়। পথেই সাগরদিঘী থানা। থানার সামনে আসিয়া দুই তিনবার চীৎকার করে—গান্ধী মহাত্মাকি জয়। দারোগা তখনই তাকে গ্রেপ্তার করেন। পরদিন মহকুমায় চালান দেন।

নারায়ণ বলিল, গান্ধীর সঙ্গে মিটমাট হইল, আবার ফাটক কেন?

ইন্দু প্রকাশ বলিলেন, এখন ওরা নানা রকম ছুঁতো ধরে স্বদেশীকে দাবিয়ে রাখবে।

ও চুক্তিটার সার তা হইলে এই?

দেখ কি হয়, বলিয়া ইন্দুপ্রকাশ আবার জুড়ানিকে পড়াইতে লাগিলেন। ধানের ছোট একটি আঁটি তুলিয়া তিনি বারবার বলেন, ধা-ধা-আ-আ-ন।

ইট দেখাইয়া বলেন, ই ই-ইট।

জুড়ানিও অর্ধস্পষ্ট স্বরে বলে, ধা-ধা- ধান। ই-ই-ই-ইশ।

তারপর লিখিয়া দেখায়—ধান, ইট। অক্ষরগুলি সুন্দর হয়।

নারায়ণ কয়েক দিন লক্ষ্যহীনের মতন ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। নিজের ভিটায় থাকে না, কংগ্রেসেরও কোন কাজ করে না। হাস্তের বাড়ী খাইতে যায় না। কোনদিন কোরফানের বাড়ী চিঁড়া মুড়ি খাইয়া

থাকে, কোনদিন বা কানাই সর্দারের বাড়ী আসিয়া তার বৌকে বলে, দুইটি ভাত দাও, কানাই খুড়ি।

তার ভাল লাগে না কিছুই, নিজেও সে সব সময় বোঝে না এ ভাল না লাগার কারণ কি, অভিমান তার কার উপর।

কিন্তু হাস্ত বোঝে। সে জানে তার উপর রাগ করিয়াই নারায়ণ এইরূপ বাউণ্ডুলের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইজন্য তার উপর হাস্তের রাগ হয়। সে ভাবে একী অন্যায়!

কুঁড়ি

শঙ্করের সঙ্গে জেলে গোলমাল হওয়ার পর হইতেই বিশ্বনাথের মনের অবস্থা ভাল নয়। বিষয় আশয় একে একে নিঃশেষ হইয়া গেল, গেল মান প্রতিপত্তি সবই। কিছুটা গেল কালধর্মে কিন্তু বেশীর ভাগই অবস্থার হীনতার জন্য।

লোকে বলে তিনি বুদ্ধিমান্। নিজেকে তিনি বুদ্ধিমানই মনে করেন। কিন্তু সেই বুদ্ধি কোন কাজে লাগিল না। নিজের অবস্থার ভাঙ্গন পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। একা থাকিলেই আজকাল এই সব কথা মনে হয়। রাগ হয় নিজের উপর, শঙ্করের উপর।

তাকে দিয়া কত আশা করিলেন। সে শুধু সেই আশায়ই বাদ সাধিল না, জেলের মধ্যে তাঁর মুখের উপর বলিয়া দিল, আপনি আর আমাকে ছোট করতে এখানে আসবেন না। হয়ত, ইহাই তাঁর প্রাপ্য ছিল।

কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া শঙ্করের আদর্শবাদকে তিনি কথনও বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। মুখে কিছু বলেন না বটে কিন্তু মনে মনে ভাবেন, জমিদারের ছেলে স্বদেশী করবে কেন? ও সব হল সাধারণের জন্য।

অবস্থা হিসাবে তাঁরাও নিতান্ত সাধারণের পর্যায়েই নামিয়াছেন। কিন্তু আভিজাত্যের গর্ব টুকু মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই। বাল্যে পিতাকে পুণ্যাহ করিতে দেখিয়াছেন প্রজারা রূপার থালার উপর নজরানা দিত, খাজনা দিত। বলিত, হুজুর, মহারাজ।

তাঁর বাবা ইন্দ্রনাথ সপ্তাহে দুদিন কাছারি করিতেন, প্রজাদের আরজি গ্রহণ করিতেন বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া দিতেন। তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে বড় তরফের দেবেন রায়ও কিছু বলিতেন না।

বিশ্বনাথের বাল্যে তাঁর মনে সেই যে আভিজাত্য বোধ ছাপ মারিয়া গেল, সারাজীবন সেই টুকুকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। শক্তিমান্ পুরুষ, কিন্তু কালের সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিলেন না। তাঁর যত দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটনের কারণ ঐখানে। আবার চরিত্রের যত কিছু সুষমা ও মহিমা তাহাও ঐ আভিজাত্য বোধের জন্য।

পুত্রকে অবলম্বন করিয়া কল্পনার যে সৌধ গড়িয়াছিলেন শঙ্কর কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তখনও মনে আঘাত পান। কিন্তু তার ত্যাগের মহত্বে খানিকটা গৌরবও বোধ করেন। সেই গৌরব বোধ স্বার্থের ক্ষতিকে সেদিন ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু শঙ্করের রূঢ় ব্যবহার তাঁর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি ভাবেন, কি নিয়ে ছিলাম এতদিন? এই আমার অবলম্বন, বৃদ্ধ বয়সের আশ্রয় এই শঙ্কর!

মুখ ফুটিয়া কারও কাছে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু একলা থাকিলেই এই সব কথা মনে পড়ে, বুক তখন হু হু করিতে থাকে। এক এক দিন কপালের শিরা টনটন করিয়া ওঠে। আপন মনে বলেন, অপমান? বাপ হয়ে আমি অপমান করলাম তোর!

ঠিক এই সময় ঘটে আর এক পরাজয়। বিলের জমি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলায় বঙ্কিমের জয় হয়। তালপুকুর, কিংবা কুরপালার জমিদারি পাইয়া সে কোনও উৎসব করে নাই। কিন্তু এবার ঢাক ঢোল পিটাইয়া বিল দখল করিল, ঐ জমিতে কালীপূজা দিল, কাঙালী ভোজন করাইল।

জমির ন্যায্য অধিকারীদের অনেকেরই বাড়ী জমির গায়ে। কেহ ঘরে বসিয়া, কেহ উঠানে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখে। বাদ্য বাজনা শোনে। ঘরকন্না করিতে করিতে মেয়েরা দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে। পুরুষরা তাদের প্রবোধ দেয়, ভাবনা করিস না। আমরা হাইকোর্ট করব।

আদম স্ত্রীকে বলে, জানিসই ত' তোর দাদা কলকাতায় গেছিল। গঙ্গার ধারে হাইকোর্ট দেইখ্যা আইছে। নদীর শেতল পানিতে জজ সাইবগো মাথা শেতল থাকে! মাথাও সুরুক্ষু। তানারগো কাছে আমরাই জেতব।

বাড়ীতে বসিয়া বিশ্বনাথ এই বাজনা শোনেন, তাঁর মনে হয় এই শব্দ তাঁকেই যেন বিদ্রূপ করিতেছে। তাঁর কান দুটা গরম হইয়া ওঠে।

বসন্ত মধ্যে মধ্যে কলিকার আগুন বদলাইয়া দেয়। বিশ্বনাথ তামাক টানেন আর ভাবেন বিলের মামলার কথা, শঙ্করের কথা। সকলে খালাস পাইল, শঙ্কর এখনও আসিল না। জেলে তার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যাইতেছে, এই জন্যই তিনি তাকে বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। সে ভুল বুঝিল, রাগ করিল, তাঁকে অপমান করিল।

বিশ্বনাথ এই সব ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখেন সামনে দাঁড়াইয়া কুরপালার সৌদামিনী। তিনি কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, তুমি এখানে? তোমাকে আমি আসতে নিষেধ করে দিয়েছি না?

অন্যদিন বিশ্বনাথের মেজাজ খারাপ দেখিলে সৌদামিনী চলিয়া যায়। আজ কিন্তু সে উত্তর করিল,হ, দিছিলা।

বিশ্বনাথ বলেন, তবে?

আমি আইছি ঠেকায় পড়িয়া। তা না হইলে এ মুখা আর হইতাম না।

চিরকাল তোমার অভাব অভিযোগ আমি মেটাতে পারি না।

নিজের জন্য আমি আসি নাই। আইছি নাতি গো জন্য। ছিমুর ছাওয়াল গো জন্য। সকাল হ'তে দুধের বাছা গো পেটে কিছু পড়ে নাই। তাঁর উপর বাঁকা কুণ্ডু কাল কইয়া পাঠাছে, ভিটা ছাড়তে হবে। খালি জমিতে তার খিদা মেটল না।

বিশ্বনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁর মনে পড়িল জীবনের এক অতীত অধ্যায়। সরোজ তখনও আসেন নাই। বিশ্বনাথ তরুণ যুবক, সুশ্রী স্বাস্থ্যবান।

সৌদামিনীও সুন্দরী। তার ছিল ডাগর ডাগর দু'টা চোখ। বিশ্বনাথ সমবয়সীদের বলিতেন, দীনুর বৌ যেন হরিণী নয়না। কুরপালার এই হরিণী নয়না রাণীডাঙ্গার রায় বংশের ছেলেকে মুগ্ধ করিল। উভয়েই উভয়কে ভালবাসিল।

সৌদামিনীর বৃদ্ধ পঙ্গু স্বামী দীন বিশ্বাস শুইয়া শুইয়া দেখিত, সবই বুঝিত। কিন্তু প্রতিবাদ করিত না। করিতে ভরসা পাইত না। মনে খুব আঘাত পাইলে কখনও কখনও তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুখ হইতে শুধু লালা নিঃসরণ হইত।

লোকটা বিশ্বনাথের কাছে মাঝে মাঝে গেঞ্জি চাহিত, রঙিন জালি গেঞ্জি। এই জিনিসটার উপর তার লোভ ছিল অসাধারণ।

এই প্রেমের ফলে সৌদামিনীর একটি পুত্র হয়। সেও আজ কয় বৎসর হইল দুইটি পুত্র সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছে।

মাতৃহীন ছেলে দু'টিকে পিতামহীই মানুষ করে। জমি জমার আয়েই কোন রকমে তাদের দিন গুজরান হইত।

বঙ্কিম প্রথমে সেই জমি গ্রাস করে। সেই টাকায় কিছুদিন তাদের চলিয়া যায় কিন্তু টাকাই বা কয়টি? জেলা জজের হুকুম নিবার জন্য মুহুরী পেশকারের খরচা বাবদই বেশীর ভাগ টাকা বাহির হইয়া যায়। অবশিষ্ট ফুরাইবার পর আরম্ভ হয় অনশন, অর্ধাশন।

বিশ্বনাথ জানেন সবই কিন্তু করার কিছু উপায় নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন। এর জন্য দায়িত্ব তাঁর নিজেরও কিছু আছে। তাঁরা পাঁচজনে মিলিয়া বঙ্কিমের লোভ বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। তিনিই প্রথম উপযাচক হইয়া তাকে রূপমতীর পারে কারখানা করিতে বলেন। শত শত গরিব দেশবাসীর কথা, চাষী মজুরের কথা তখন তাঁর মনে পড়ে নাই। আজ সেইজন্য অনুশোচনা হয়।

খানিকটা পরে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, সৌদামিনী নাই, কখন যেন চলিয়া গিয়াছে।

দুপুরে সরোজিনী কহিলেন, সৌদি অত গজর গজর করছিল কেন? অন্য দিন ত' ভয়ে কথাটি কয় না।

বিশ্বনাথ নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। সৌদামিনীর কোন কথাই তাঁর কানে যায় নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছিল?

সরোজ কহিলেন, ঠিক বুঝলাম না।

বিশ্বনাথ কহিলেন, অভাব ওকে ওইরকম করেছে। অভাব ও বঙ্কিমের অত্যাচার—মুখে এই কথা বলিলেও তাঁর একটু ভয় হইল। ক্রোধের বশে সৌদামিনী হয়ত তাদের যৌবনের সম্পর্ক প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। এতদিন সরোজ কিছুই জানিতেন না—ইহা ছিল বিশ্বনাথের মস্ত বড় সান্ত্বনা।

কয়েকদিন পরের কথা। সকাল হইতে সৌদামিনী নাতি দুইটিকে লইয়া বঙ্কিমের কাছারিতে বসিয়া আছে। আসিয়াছে ভিটা বেচিতে। সরকার গোমস্তারা খুবই ব্যস্ত। গরিব বিধবার কথা শুনিবার মতন তাদের ফুরসৎ নাই।

সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে তাগিদ দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই কালীপদ চেঁচাইয়া ওঠে, দেখনা হাতে কত কাজ?

কাজ যত, অকাজ তার চেয়ে ঢের বেশী। তারা ঘনঘন তামাক টানে, হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙ্গে। এগুলির ফাঁকে চলে গল্প গুজব।

কালীপদ বলিল, সান্যাল মশাই শুনেছেন, অজু বৈরাগী খালাস হয়েছে?

খুনে অজু খালাস হয়েছে! তুমি জানলে কি করে?

বড় রায় বাড়ীর পেয়াদা তোতলা সুরেন বলল। সে সদরে দেখে এসেছে।

সান্যাল কহিলেন, সুরেনের কথা!

কালীপদ বলিল, সে সদরে দেখে এসেছে অজুর হাত ধরে পদ্ম ভিক্ষা করছে।

সান্যাল কহিলেন, হাত ধরে কেন?

অক্ষুটা অন্ধ হয়ে গেছে কিনা।

বেশ হয়েছে। হাতে হাতে ফল। বেটা ঘোর পাপী যেন কলির অবতার! খালাস হল শুধু বোষ্টমীর জন্য। সে মানুষটা খাসা।

কালীপদ বলিল, মামলার সাক্ষীরা সব মরে গেছে। একটা ছিল, সেও পাগল।

সান্যাল জিজ্ঞাসা করিলেন, বোষ্টমী আছে কেমন?

শুনলাম ঠিক তেমনটিই। যেন চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছুকরী।

বৃদ্ধ সান্যাল বলিলেন, চেহারা ঠিক সেইরকম, সেই ঢলঢলে চোখ?

শুনেছি দেখতে আরও খাসা হয়েছে। বক্সি-বাড়ীর সিঁদুরে আমের মত।

খবরটা বীরেনকে পৌঁছে দিলে হত না?

সৌদামিনী এবার বলিয়া উঠিল, বৈষ্ণবীরে নিয়া খুব ত' রস চালাইছ। আমি যে মানুষটা বসিয়া আছি সেদিকে খেয়াল নাই।

কালীপদ বলিল, এক সময় তোমারও দিন ছিল। কিন্তু এখন আর হিংসে করে লাভ কি?

তা কই নাই। ছাওয়াল দুইটা না খাইয়া আছে।

শেষটায় বেলা বারটা আন্দাজ সান্যালদের সময় হইল। সৌদামিনী কাগজে টিপসই দিল, দলিলের উপর ছেলে দুইটির বুড়া আঙুলের ছাপ পড়িল।

এই সময় বীরেন আসিয়া উপস্থিত। বঙ্কিম তাকে একদিন বলিয়াছিল, তুমি পুরনো জমিদার, মাঝে মাঝে এসে কাজকর্ম দেখো। এও ত তোমাদেরই বিষয়।

বীরেন সেই হইতে প্রায়ই বঙ্কিমের কাছারিতে আসিয়া বসে। গল্প-গুজব করে, তামাক টানে। জিনিসটা সরকার গোমস্তাদের পছন্দসই

নয়। পরোক্ষে তারা বলে, একটু লজ্জাও নেই? রাজার ছেলে হয়ে তুই এখানে আসিস কোঁপরদালালি করতে।

সৌদামিনীর বড় নাতিটির ইচ্ছা ছিল দলিলে নাম স্বাক্ষর করে। সে পিতামহীর দিকে চাহিয়া বলিল, আমি কিন্তু সই করতে পারি। ছি রি মন্ত—ছয়ে হ্রস্ব ই, রয়ে দীর্ঘ ঈ, মযে আকার—

বীরেন মুখ ভেংচাইয়া ধমক দিল, যাক্ আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। ছয়ে হ্রস্ব ই, মযে দীর্ঘ ঈ—

সৌদামিনী ও ছেলেটি হতভম্ব হইয়া বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হিসাবের পর সুদ-সমেত বঙ্কিমের মুদীখানার দেনা চুকাইয়া সৌদামিনীর সামান্যই পাওনা হইল। সে বলিল, টাকা কুল্লে এই কয়ডা?

সান্যাল বলিলেন, সব যে খেয়ে বসে আছ। এখন ভুলে গেলে?

সৌদামিনী টাকা কয়টি তুলিতে গেলে তিনি আবার বলিলেন, আমাদের যে কিছু পাওনা ছিল।

সৌদামিনী নাতি দু'টিকে দেখাইয়া কহিল, কচি কাচ্চারগো ভিটা বেচার টাকায়ও তোমরা ভাগ বসাবা?

বীরেন বলিয়া উঠিল, সেরেস্তার লোক শুধু শুধু তোমাদের জন্য খাটতে যাবে কেন?

সৌদামিনী খুচরা পয়সা কয়েক আনা সান্যালের দিকে আগাইয়া দেয়। বলে, বেশ, আপনে বাওন মানুষ। আশীর্বাদ করবা, অরা যেন আমার ভাসিয়া না যায়।

সান্যাল বলিলেন, আশীর্বাদ কি এতে আসে? এতগুলো টাকা নিচ্ছ আর বামুনকে ছোঁয়ালে মাত্র ক' আনা পয়সা? আমি শুধু একাও

নই, মুহুরী পাইক পেয়াদা, দিতে হবে সবাইকে। ভাগে চটকস্ত মাংসও জুটবে না।

এতগুলা টাকা দেখলা—? বলিয়া সৌদামিনী পয়সাগুলি তুলিয়া লইল। নাতি শ্রীমন্তের হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল, সান্যাল ঠাকুরকে পেন্নাম করিয়া টাকাটা দে। ভাল হবে।

শ্রীমন্ত মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সান্যালের পায়ের কাছে টাকাটি রাখিল। সান্যাল হিসাব আরম্ভ করিলেন, কালীপদ চার আনা, পেয়াদা সুরেন দু আনা, কার্তিক দু' আনা, মুহুরী তিন, তিন, দু আনা। আর…

আর একজনের নাম তিনি করিলেন না। শুধু বলিলেন, এতে ত' কুলুবে না।

আবার নতুন করিয়া হিসাব আরম্ভ হয়, কালীপদ দুই, দুই— কালীপদের মুখের দিকে চাহিয়া, কালীপদ তিন আনা।

পথের উপর বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদমন একটা বানরকে কিল দেখাইতেছিল। সৌদামিনীকে দেখিয়া সে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল, হামার টাকা ছাউদি।

সৌদামিনী বলিল, পরে নিও ঠাকুর।

সব ত' বিক্রি ভৈলো। পরে আইবে কাঁহাসে?

টাকা মোটে এই কয়টি।

দেখি কেত্তো আছে।

সৌদামিনী দেখাইবে না। চোবেও ছাড়িবে না। সে এবার সৌদামিনীর হাত ধরিল।

পাস্ ত মোটে চার টাকা। নে, মুখপোড়া এই নে—বলিয়া সৌদামিনী চোবের পাওনা চুকাইয়া দিল। অবশিষ্ট রহিল মাত্র গোটা পনর টাকা।

সকাল হইতে তিনজনের পেটে কিছু পড়ে নাই। সৌদামিনী আগের দিনও উপবাসী ছিল। রাণীডাঙ্গার হাট খুব কাছে। কিন্তু সেই পর্যন্ত আসিতেই তার মাথা ঝিম ঝিম করিতে থাকে। মনে হয় চোখের সামনে যেন কতগুলি জোনাকি জ্বলিতেছে।

নাতি দু'টিও আর হাঁটিতে পারে না। ক্ষুধায় পেট জ্বালা করে। হাটে ঢুকিয়াই ছোটটি বলিল, দু' পয়সার মুড়ি কিনিয়া দে ঠা' মা।

বড়টি দোকানের সাজানো খাবারের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় কিন্তু কিছু বলে না।

হাটে ঢুকিতেই দীন ময়রার মিঠাইর দোকান। সেখানে একটা কড়াইয়ে কতগুলি রসগোল্লা ভাসিতেছে, টলটলে জলে শ্বেত পদ্মের মতন শুভ্র সুন্দর। ছোট নাতিটি বলিল, আমি দুইটা রসগোল্লা খাব।

রসগোল্লার কড়াইয়ের দিকে চাহিয়া সৌদামিনী একটুক্ষণ কি যেন ভাবিল। তারপর দীন ময়রাকে বলিল, দেও ত' দুই সের রসগোল্লা, একটাকায় হবে?

দীন বলিল, হবে।

দেও, আমরা আজ পেট ভরিয়া রসগোল্লাই খাই।

ভাঁড়টি হাতে করিয়া সৌদামিনী নাতিদের বলিল, আয়, খাল ধারে বসিয়া তিনজনে সুখ করিয়া খাব।

দীন ময়রা ছেলে দুটিকে ডাকিয়া বলিল, ফাউ নিয়া যাও তোমরা।

ঘরে চাল, ডাল, তেল নুন, সবই বাড়ন্ত। কোন সামগ্রীই নাই। সৌদামিনী হাটখোলায় চাল, করকচ ও দেশলাই কিনিল।

মাথা ধুইয়া খাল ধারে বসিয়া শ্রীমন্ত ও ধীমন্ত রসগোল্লা খাইতে আরম্ভ করে। সৌদামিনীও একটা তুলিয়া মুখে দিবে এই সময় বিশ্বনাথ আসিয়া উপস্থিত।

ভিটা বেচার টাকা দিয়া সে রসগোল্লা খাইতে বসিয়াছে, ইহাতে বিশ্বনাথ কি মনে করিবেন ভাবিয়া প্রৌঢ়া লজ্জায় এতটুকু হইয়া যায়। কি যেন ভাবিয়া শেষটায় বলে, এ আমার ভিটা বেচার টাকা ছোট রাজা। আমরা এবার ভাসিয়া চললাম।

বিশ্বনাথ ব্যাপারটা পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, হুঁ।

সৌদামিনী বলিল, ভগবান কোথায় যে আমারগো জন্য ডেরা বাঁধছে জানি না তবে কুণ্ডুর বৌ কিছুদিন থাকতে সময় দিছে।

ছেলে দু'টি তখনও এক মনে খাইতেছিল। খায় আর বিশ্বনাথের দিকে তাকায়। তিনিও কি যেন ভাবেন, হয়ত ভাবেন, এই ছেলে দু'টি, তাদের পিতামহী, এমন কি ঐ রসগোল্লার ভাঁড়টাও তাঁকে ও তাঁদের সমাজ-ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

সৌদামিনী নাতিদের বলিল, ছোটবাবুরে আমারগো ছোট রাজারে পেন্নাম কর।

ছেলে দুটি রস মাখানো এঁটো হাতেই বিশ্বনাথের সামনে যাইয়া ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করে। তারা মাথা তুলিলে বিশ্বনাথ লক্ষ্য করেন, কনিষ্ঠটি দেখিতে বাপের মতন। হেমন্তই যেন আবার ছোটটি হইয়া আসিয়াছে।

হেমন্তকালে জন্ম বলিয়া বিশ্বনাথ সৌদামিনীর ছেলের নাম রাখেন হেমন্ত। দুজনে আদর করিয়া ডাকিতেন, হিমু। সেই হিমুর ছেলেরা খাল ধারে বসিয়া পিতামহের প্রায়শ্চিত্ত করে।

বিশ্বনাথের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে। তিনি হনহন করিয়া চলিয়া যান।

একুশ

পদ্ম রূপমতীর পারে নামিল। রোগক্লিষ্ট অন্ধ অজুকে ধরিয়া নামাইল। অজুর শরীর শীর্ণ, দেখিলে মনে হয় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। রক্তের তেজ কমায় যৌবনের সমস্ত দূষিত ব্যাধি শরীরটাকে যেন অক্টোপাশের মতন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। মুখে তারই ছাপ।

পদ্ম তাদের আখড়া খুঁজিয়া পায় না, শুধু সেই ছোট ভিটাটুকুই নয় পাশের বড় বটগাছটা, উদয় গয়লার বাথান, কেষ্ট বেনের বাড়ী, বেত-বাঁশের ঝোপ সবই হারাইয়া গিয়াছে। চারদিকে নূতন নূতন ইমারত, পাকা রাস্তা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোহার থাম, কুলী ব্যারাক—এ যেন এক গোলকধাঁধা।

অজু কোন দিনই ধৈর্যশীল নয়। অন্ধ হইবার পর তার চিত্তের অস্থিরতা আরও বাড়িয়াছে। সে বলিল, মাগী যারে কয় অকর্মার ধাড়ী। বটগাছটা একবার দেখ না আর আমারগো উঠানের কেষ্টচুড়ো ব্রেক্ষ। বিশ্বাসের বাড়ীর থা বীজ আনিয়া পোঁতলাম। দেখতে দেখতে মৈরুহ হইয়া দাঁড়াইল।

সেই মহীরুহ বা আশেপাশের গাছপালা কিছুরই চিহ্ন নাই। পাঠানপাড়া হইতে নদীর পার দিয়া ছল্লির খাল পর্যন্ত নতুন নতুন অনেক বাড়ী উঠিয়াছে। আরও কতগুলি উঠিতেছে। শুনিয়া অজু বলিল, ভিক্ষার আর ভাবনা থাকবে না। বাঁচিয়া থাক হারাণের পো বঙ্কিম। জঙ্গলের বুকে শহর বসাইছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়ীর খোঁজ না পাইয়া অজু আবার গালি দিতে

শুরু করে, মুদী হইয়া হারামজাদার শখ হইছে জমিদার হবেন। কারখানা করবেন। মারে মুখে এক—

শেষটায় তারা হাস্তের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। পদ্ম বলিল, আগে ছিলাম তোমার বাপের ভিটায়। এবার শরণ লইলাম তোমার।

হাস্ত আত্মীয়ের মতন তাদের সমাদর করে। পদ্মকে পাইয়া তার আনন্দ আর ধরে না। সে বলে, শুনছিলাম তুমি আর আসবা না। তবু ভাগ্যিস আইলা। তোমার বোষ্টম আছে কেমন?

চেহারা দেইখ্যাই ত' বুঝিস। ভিতরে পদার্থ নাই। মনে করছিলাম সদরেই থাকব, কুরপালায় আর মুখ দেখাব না। কিন্তু সেখানে ওনার শরীর টেকে না তাই আইলাম।

অজু বলিয়া উঠিল, মর্ মাগী। কুরপালায় মুখ দেখাব না কেন? হইছে কি? দোষী যদি হইতাম তা হইলে কি মাজেষ্টর ছাড়ত? ও বেটাগো কাজই ত' লোকরে ফাটক দেওয়া। যে যত দিতে পারে উপরে তার তত জলুস।

পদ্ম কোন কথা বলিল না। একটুপরে জিজ্ঞাসা করিল, আমার শ্যামলী কোথায় রে?

শ্যামলী পাশের একটা এঁদো পুকুরের বকচরে দাঁড়াইয়া কচুরি পানার কচি কচি পাতা খাইতেছিল। জুড়ানি পদ্মকে সেইখানে লইয়া আসিল। পদ্ম ডাকিল, শ্যামলী, শ্যামী।

তার গলা শুনিয়া গরুটি হাম্বা হাম্বা করিয়া ছুটিয়া আসে। তার হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, চোখে দীপ্তি নাই, দেখিলে মনে হয় আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। পদ্ম তার গলার নীচে হাত বুলায় আর বলে, তোর এমন দশা হইছে!

শ্যামলী ও শিং নাড়িয়া ভালবাসা জানায়। তাকে ছোঁকে

ধরিয়াছিল। সামনের ডান পায়ের কাদার মধ্যে হইতে জোঁক তুলিতে তুলিতে পদ্ম বলে, ভাগ্যিস তুই মানুষ না। পুরুষ মানুষ না। তা হইলে এতদিনে আমারে ভুলিয়া যাইতি।

শ্যামলী ডাকে, হাম্‌মা হাম্‌মা।

বৈকালে হাস্তু ও পদ্ম প্রতিবেশী বোনার পুকুরে গা ধুইতে গেল। খাল ও নদী দু'টিই দূরে। এ পাড়ার মেয়েরা বোনার পুকুরেই স্নান করে। অন্য পুকুর সব মজিয়া গিয়াছে। বোনার পুকুরে বাঁশ দিয়া কচুরিপানার ধাপ দলকে ঘাটের কিছু দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘাটের কাছে কিছুটা জল আছে, জলে ধাপের গন্ধ আসে।

সে দিন ঘাটে কেহ ছিল না। এই কোণে তারা দু'জন, বিপরীত কোণে সারদার ঘাটের ধারে একজোড়া হাঁস, একটা সাদা-কালোয় মিশানো। অপরটা ধবধবে সাদা। ওপারেও ঘাটের ধারটা পরিষ্কার, হাঁস দুইটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাঁতার কাটে, জলের বুকে বৃত্ত ও অর্ধবৃত্ত রেখা পড়ে, সে গুলি আবার মিলাইয়া যায়।

হাস্তু বলিল, শহরে ত' ছিলি, দাদাবাবুর খবর কইতে পার?

গহনার নৌকায় একসঙ্গেই ত আইছিলাম। গাং পারে নামিয়া আসিয়া আখড়ার খোঁজ করতেছিলাম, আর তিনি এই পথ দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

এই পথে?—হাস্তু প্রশ্ন করে।

তার মুখের দিকে চাহিয়া পদ্ম হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোর কপাল যে এতটা পোড়ছে তা ত' জানতাম না।—বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া গান ধরিল—

কোন পরানে গেলে বঁধু ঘরের সামনে দিয়া
মোরে না ডাকিয়া—

হাস্থ বলে, মরণ আর কি!

পদ্ম জিজ্ঞাসা করে, কার?

হাস্থ পদ্মের নাকে মুখে খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়।

জানিস্—একটু পরে পদ্ম বলে, জানিস্ দাদাবাবুর মান্য মান কত? ভদ্দর লোকেরা গলায় মালা পরাইয়া, বন্দেমাতরং দিয়া নৌকায় তুলিয়া দিল। কত লোকে কইল, এট্টা বাণী দেন শঙ্করবাবু; কেউ বা খাতা পেন্সিল লইয়া মুখের দিকে চাইয়া রইল। দাদাবাবু কিন্তু অনড়। সেই বাণী দেবে না যে কইল আর দিলই না।

হাস্থ জিজ্ঞাসা করিল, বাণীটা কি?

আমিও জানি না। শোনলাম বড় লোকেরা জেলে গেলে তানার গো বাণী দেওয়াই দস্তুর। হাস্থ বলিল, উনি বড় তাতে আমার গো কি?

তোর কিছু না তা জানি। আমি কিন্তু বড় খুশি হইছি। হ্যাশের মানুষ তিনি, আপনার জন।

পদ্ম বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গান গায়, ভিক্ষা করে। আর অজু বসিয়া বসিয়া ইয়ার বন্ধুদের কাছে জেলের গল্প ফাঁদিয়া লয়। বলে, ডুলি চড়ার কাহিনী।

সে বলে, খুনে বলিয়া আমারে খাতির করত সগলটি। খুনেরা হইল ফাটকের গোঁসাই, বাওন যা কও। জেল বাবুরা প্রায়ই আমার গান শোনত। তারা বলত, ঠাকুরের নাম যে এমন করিয়া লইতে পারে সে আর যাই হোক খুনী আসামী না।

অজু এই গল্প করে আর হাসে। পদ্ম নিষেধ করে, লোকের কাছে ফাটকের গল্প আর করিও না।

অজু বলে, কেন? করব না কেন শুনি? চাঁদরে রাহু গ্রাস করছিল, তারপর চন্দর কলঙ্ক মুক্ত হইলেন। আমার অবস্থা সেই রকম।

গান গাহিয়া মধ্যে মধ্যে সে আসরটা বেশ জমাইয়া তোলে। তার ইয়ার বন্ধুরা গাঁজা কিনিয়া আনে। হাস্ত ও পদ্মের অনুপস্থিতে সবাই মিলিয়া গাঁজা টানে। অজুই টানে বেশী, চোখ লাল না হইলে কলিকা ছাড়ে না। বলে, এখন আমার বন্ধন শুধু এই।

যাতে সে খুশি হয়, যাতে একটু আরামে থাকিতে পারে তার জন্য ভিখারিণী পদ্মের ক্লেশের সীমা নাই। বাগানের ভিতরে পায়খানা বা ঘাটের পথে পিছল হইলে সে অজুর হাত ধরিয়া লইয়া যায়। অমাবস্যা একাদশীতে গরম জলে ভিন্ন স্নান করিতে দেয় না। অজু লুচি খাইতে ভালবাসে বলিয়া হাতে দু'চার আনা পয়সা হইলেই দীন ময়রার দোকান হইতে লুচি ভাজার জন্য ঘি কিনিয়া আনে।

অজুর কাছে তার শুধু একটি প্রার্থনা—গাঁজা যেন আর সে না ছোঁয়।

হাস্ত পদ্মকে বলে, ভালবাসা বটে তোর।

পদ্ম উত্তর দেয়, তোর চাইয়া আর বেশী না।

সে একদিন রাণীডাঙ্গায় যাইয়া বঙ্কিমকে ধরিল, আমায় গো একটু জায়গা দেন।

বঙ্কিম বলিল, আমি পাব কোথায়?

আপনার আবার জায়গার ভাবনা? কত ভিটা ঘাটা আছে শিয়াল শকুনে বাস্তব্য করে।

বঙ্কিম বলিল, শেয়াল শকুনে খাজনা সেলামি দেয় না। কিন্তু মানুষের যে লাগে।

পদ্ম উত্তর করে, গরিব মানুষ সেলামি আমরা পাব কোথায়? কিন্তু খাজনা ঠিক ঠিক দেব।

কত লোকের জন্য আর করি বল দেখি?

পদ্ম বলিল, আমাদেরও ত একটা দাবি আছে। আমাদের আখড়া আপনার কারখানার মধ্যে পড়েছে।

ওখানে তোমাদের ত' কোন স্বত্ব ছিল না, ওটা রায়েদের গঙ্গা প্রসাদ এষ্টেটের জমি।

পদ্ম উত্তর করিল, গদাধর মালো ঐ ভিটা আমারগো দিয়া গেছিল।

দানের কোন দলিল নেই, মনিবের সেরেস্তায় নাম পত্তন পর্যন্ত নেই।

আমরা গরিব মানুষ, এতদিন ঐখানে ছিলাম—ইহা অপেক্ষা জোরালো কোন যুক্তি তার ছিল না। ধনী বঙ্কিম এই যুক্তি শুনিয়া হাসিল।

পদ্ম বিফল হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। একটি দাসী আসিয়া বলিল, গিন্নীমা তোমায় ডাকছেন।

সে পিছনের দরজা দিয়া পদ্মকে বঙ্কিমের অন্দর মহলে লইয়া গেল।

পরনে লালপেড়ে শাড়ি হাতে সোনায় বাঁধানো শাঁখা আর দু'গাছা করিয়া চুড়ি, সুশ্রী মুখ, চঞ্চল দু'টি চোখ, ছোটখাটো মানুষটি। বঙ্কিমের স্ত্রীকে দেখিলে মনে হয় বয়স মোটে বছর কুড়ি বাইশ হইবে। চোখ দু'টি দিয়া সে খালি এদিক ওদিক চায়—এইটা তার বাহিরের রূপ অথচ ভিতরটা যেন শান্ত তৃপ্ত। হাতে একখানা হালকা ধরণের উপন্যাস। মাঝখানে আঙুল রাখিয়া বইখানা বুজাইয়া বধূটী একতলার বারান্দায় পদ্মের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পদ্ম বলিল, জয় রাধে।

বঙ্কিমের স্ত্রী বলিল, তুমি একটা গান শোনাও।

পদ্ম গায়,—

বল্‌রে মন রাধা কৃষ্ণ বোল
হৃদয় পাথোয়াজের উপর
প্রেমের বাদ্য তোল
দু'টো ঘা মেরে নিজের তরে
বাজা নিমাইর বোল।

বঙ্কিমের স্ত্রী শৈবলিনী বলিল, বেশ গাও তুমি। গলা আগের চেয়েও মিষ্টি হয়েছে।

ভাল লাগছে তোমার?—বলিয়া পদ্ম প্রসন্ন অথচ জিজ্ঞাসুনেত্রে শৈবলিনীর দিকে চাহিল।

লাগে নি? খুব লেগেছে।

তুমি আমারে ডাকছ কেন?

তোমার আথড়ার কথা সবই নিজ কানে শুনলাম। দেখি যদি তোমাদের ভিটে ঘাটার কিছু করতে পারি।

তুমি মনে করলে পারবে বৈকি মা।

শৈবলিনী একটু হাসে। সে জানে স্বামীর নিকট তার অনুরোধের মূল্য কতটুকু। যারা বড় তাদের রীতিই হয়ত এই। ইচ্ছামত তাদের রথ তারা চালাইয়া যায়। সেই যাত্রামুখে বাধা বিঘ্ন, অনুরোধ উপরোধ এমনকি চোখের জলও নিষ্ফল হয়। তার স্বামী বড়, বড় খুবই। দেশের সকলকে সে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এমন মানুষ, স্ত্রীর কথা রক্ষা করিয়া চলিলে তার পোষাইবে কেন?

স্বামীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে শৈবলিনী এইরূপ সহজ ভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বঙ্কিম তার কথা রাখে না বলিয়া তার কোন ক্ষোভ নাই। নিজে সে উপন্যাস ও গল্পের বই লইয়াই থাকে। যখন

সময় আর কাটে না তখন পাশের বাড়ীর যদু সাহার বৌকে ডাকিয়া বলে, এস ভাই একটু তাস খেলি।

তাস খেলে আর পান খায়। পানের সঙ্গে প্রচুর দোক্তা।

সাদাসিধে এই বধূটীর মনের কোণে একটা আশঙ্কা আছে। তার স্বামী বড়লোক—এই বড় বলিয়াই যত ভয়। শৈবলিনী জানে ধনীর শত্রুর অভাব নাই, বিশেষ করিয়া সে যদি নুতন ধনী হয়। তার স্বামী নূতন ধনী, বহু লোকের পরিশ্রমের বিনিময়ে অনেকের সম্পদে সে আজ বিত্তশালী। এই বিত্তের পিছনে আছে অগণন বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস। শৈবলিনী সেই দীর্ঘশ্বাসকে ভয় করে।

এই তপ্তশ্বাসের শান্তির জন্য সে খালি মানুষের আশীর্বাদ কুড়ায়। ভিক্ষুককে সন্ত সাধুকে দান করে। ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। শিন্নি দেওয়ার জন্য কুরপালার পীরের দরগায় মাসে দু' তিনবার টাকা পাঠাইয়া দেয়।

সেদিন সে ভাল একটা সিধা দিয়া পদ্মকে বিদায় করিল। বলিল, এবার মালপোয়া ভোগ হলে দু'খানা দিয়ে যেও ত'। ও বাড়ীর যদুর বৌ চেয়েছে। একটু থামিয়া স্মিতমুখে কহিল, আমিও ভালবাসি কিন্তু।

দু'দিন পরে সেই আবার পদ্মকে খবর দিয়া আনাইল। তাকে বলিল, বিনি গয়লানীর বাড়ীর উত্তরে একটা ভিটা আছে। পোড়ো ভিটা। সেখানে তোমরা আখড়া কর গিয়ে। কিছু লাগবে না। তবে একটা দলিল করে দিও। উনি দলিল বড় ভালবাসেন। মাঝে মাঝে দলিল বার করে দেখেন—কত দলিল। ছেলেপুলে নেই ত।

পদ্মের বুক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে। সে গায়,

রাধারাণী রাজার রাণী সাধে কি আর বলে,
মোতির মালা পরাই তোমার গলে।

গান শেষ হইলে শৈবলিনী বলিল, আমি আর কে ? যিনি দিলেন সেই ঠাকুরকে ব'ল ওঁর যেন ভাল হয়।

পদ্ম বলিল, ঠাকুর ত' তোমারগো ভাল করতেইছেন। করবেনও।

তা তিনি খুবই দিয়েছেন—বলিয়া শৈবলিনী ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

পদ্ম হাস্তকে ভিটার কথা বলিলে সে কহিল, ভিটাটা ঠাকুর ঠিক সময়েই জুটাইয়া দিছে। আমারে কিন্তু একটু জায়গা দিস্।

পদ্ম হাস্তের মুখের দিকে চায়।

হাস্ত বলে, এ বাড়ী ছোট রায় রাজার কাছে বন্ধক ছিল। জেলের থা ফিরিয়া, ছাওয়ালের উপর রাগ করিয়া তিনি আমার নামে নালিশ করছে। শোনতেছি, বাড়ী এবার নিলামে চড়বে।

পদ্ম বলে, দাদাবাবুরে একবার কইয়া দেখ না ?

হাস্ত উত্তর করে, সেও কি সম্ভব ? আচ্ছা, তুই-ই ক দেখি।

বাইশ

জেল হইতে ফিরিয়া শঙ্কর দেখে বিষ্ণু চাটুয্যে কংগ্রেস আপিসে পড়িয়া আছে। সে শুইয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিল। শঙ্করকে দেখিয়া বইখানা বুজাইয়া শুধু একটু হাসিল। চোখ দুটা তার জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের সঙ্গে বিষ্ণুর চোখের দীপ্তির গরমিলে শঙ্করের কেমন যেন ভয় হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ কতদিন ?

প্রায় তিনমাস। তুমি প্রেসিডেন্সী জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর

শুরু হয়। তার সঙ্গে এখন জুটেছে কাসি, বুকে বেদনা—সে এক লম্বা ফিরিস্তি।

শঙ্কর বলিল, এখানে সেবা শুশ্রূষার কি অসুবিধে হচ্ছে না?

নিশ্চয় না। দাদামশাই, রাসেদুল, হাস্ত এঁরা আমায় না দেখলে অনেক আগেই মার্টার হয়ে যেতাম।

মাত্র আধ মাইল দূরে খালের ওপারে রাণীডাঙ্গায় তার বাড়ী। সেখানে বিষ্ণুর বাপ-মা, ভাইবোন আছেন অথচ বারোয়ারি শুশ্রূষার উপর নির্ভর করিয়া সে এইখানে পড়িয়া আছে। শঙ্করের কাছে ইহা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়।

বিষ্ণু বলে, দেখছ কি? বাবা আমাকে আরও তাড়াতাড়ি মার্টার করে ফেলছিলেন, তাই এখানে চলে এসেছি।

তার মানে?

জেল থেকে ত' অসুখ নিয়ে ফিরলাম। বাবা আমার সিগ্রিগেশনের ব্যবস্থা করে দিলেন। একেবারে আলাদা ঘর, গোয়াল ঘরের পাশে। থালা, ঘটি, বাটি সব পৃথক্। বোন পারুল এসে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থালা বাটিতে আমার খাবার ঢেলে দিত। তার ইচ্ছে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট কথা বলে। কিন্তু উপায় ছিল না। উপরন্তু বাবা রোজ একবার করে শুনিয়ে যেতেন, তোমায় বাড়ীতে রেখে আমি আর পাঁচটা সন্তানের বিপদ ডেকে আনতে পারি না। যখন রোজগার করবার কথা তখন যাদের সঙ্গে ধেই ধেই করে নৃত্য করলে এবার সেই কংগ্রেসীরাই তোমায় দেখুন।

আমিও তাঁর মুখের ওপর বললাম, আপনার কর্তব্য ছিল আমাদের দুনিয়ায় নিয়ে আসা। আর কিছু করবার আছে বলে কখনও মনে করেননি তাই এরকম করতে পারছেন।

এই সময় ইন্দুপ্রকাশ ঘরে ঢুকিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, এত জানতাম না, ছিঃ এটা তুমি ভাল করনি, বিষ্ণু!

ওই ত' আপনাদের দোষ, দাদু। আপনারা সত্যের সম্মুখীন হতে চান না। বাপকে শ্রদ্ধা করতে হয় যেহেতু তিনি বাপ, এই আপনাদের নির্দেশ। বাপ যে কর্তব্য পালন করলেন না সে সম্বন্ধে আপনারা নীরব। অথচ ছেলে যদি সত্য কথা বলে তখন তার হয় সেটা অপরাধ। আপনি ত' কিছু কিছু জানেন দাদামশাই, যা জানেন সত্যটা তার চেয়ে অনেক কুৎসিত—বলিতে বলিতে বিষ্ণু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তার কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল।

ইন্দুপ্রকাশ চুপ করিয়া গেলেন। বিষ্ণু বলিল, আমি জানি আপনি এসবের অনেক উপরে। আপনাকে আমি কিছু বলিনি। বলছিলাম তথাকথিত সমাজপতিদের কথা, যারা এক এক বিষয়ে ভারী সজাগ আবার অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ।

ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, তুমি একটু স্থির হও। তুমি যে আমাকে আক্রমণ করনি সে আমি বুঝেছি বৈকি।

শঙ্কর বিষ্ণুর শিয়রের পাশে বইগুলি নাড়াচাড়া করিতেছিল। সবগুলিই কম্যুনিষ্ট সাহিত্য। বিষ্ণুর হাতের কাছের বইখানি তুলিয়া দেখিল রুশ বিপ্লবের ইতিহাস। শঙ্কর বলিল, তুমি দেখছি পুরাদস্তুর কম্যুনিষ্ট বনে গেছ।

তা আর পারলাম কই? আর পারাও খুব শক্ত। তবে আমার ধারণা ঐ মতবাদ গ্রহণ করতে পারলে এদেশ অন্ততঃ ধর্মান্ধতার হাত থেকে, অসংখ্য নরহত্যা থেকে রেহাই পেত।

শঙ্কর বলিল, হয়ত আরও বেশী নরহত্যা হত অন্য নামে। যাক সে কথা। জেলে ত' তোমার ওদিকে কোন ঝোঁক দেখিনি।

তুমি চলে আসার পরই সুধীর দাশ বলে একজন বন্দী এলেন, ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য বার হওয়া একটি তরুণ। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, কালচার ও তেজস্বিতার সংমিশ্রণে ছেলেটি ছিল যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতন। তার কাছেই আমার হাতে খড়ি। সে বেচারীও এই জ্বর আর কাসিতে ভুগছে। হয়ত একদিন চলে যাবে, uncared for, unhonoured and unsung—বলিতে বলিতে বিষ্ণুর চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল।

শঙ্কর আজ দেখিল বিষ্ণুর এক নূতন রূপ। দু'একদিনের মধ্যে কুরপালারও অনেক পরিবর্তন দেখিল। শুধু জমির রূপই বদলায় নাই, মানুষেরও বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেহ জমিহীন, কেহ গৃহহারা, হাহাকার সর্বত্র।

এতদিন ছিল মাটির বন্ধন। তারা আলো বাতাস ও জল একত্রে ভোগ করিত, দশজনে মিলিয়া জমি চষিত, শস্য পাহারা দিত, ফসল কাটিত। লোকে পরস্পরকে 'দাদা' 'ভাই' 'চাচা' বলিয়া ডাকিত, মাটি হাত ছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধন সেই সৌভাত্রও লোপ পাইল।

কুরপালায় চুরি ডাকাতি একরূপ অজানা ছিল, এখন তার জন্য গ্রামে থাকাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে পুরুষ না থাকিলে দুর্বৃত্তেরা রাত্রে দরজায় ঘা মারে, বেড়া কাটিবার চেষ্টা করে। লোকের ধারণা এসব বঙ্কিমের কুলী মজুরের কাজ। কিন্তু তার কাছে অভিযোগ করিলেই সে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বলে, কুরপালার কার কি আছে যে আমার কুলীরা চুরি করতে যাবে? এসব শুধু গোলমাল বাঁধাবার ফন্দি।

বিষ্ণুর এই অবস্থা। এদিকে নারায়ণ ও আদম কংগ্রেস ছাড়িয়া দিয়াছে। নারায়ণই কুরপালার প্রথম স্বেচ্ছাসেবী। কংগ্রেসের জন্য সে পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া দেয়।

হিন্দুর মধ্যে যেমন নারায়ণ মুসলমানের মধ্যে তেমন আদম। এই দুইজনে কত লোককে কংগ্রেসে টানিয়া আনিল, কুরপালার যুবা বৃদ্ধ তরুণকে পিতা পুত্রকে শঙ্করের জাতীয় পাঠশালায় ভরতি করাইয়া দিল, বুড়া বুড়ীদের তকলি চরকা ধরাইল।

এদিকে গ্রামের যত অভাব অভিযোগ সবই যেন শঙ্করের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রামের ছাগল রহিমের লঙ্কা খাইয়াছে। রহিম হায় হায় করিয়া শঙ্করের কাছে ছুটিয়া আসে। বলে, ছাগলডা আমার মরিচের চারার মাথা মুড়াইয়া খাইছে, দাদাবাবু। ছাগল না যেন শয়তান। রামেরে আর ছাগলরে তুমি সাজা দেও। যদি না দেও ত' তারগো একদিন আর আমারও একদিন।

এইসব ব্যাপারে শঙ্কর অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে।

আজ বঙ্কিম কুণ্ডু কুরপালার জমিদার। বহু জমির প্রজাস্বত্বও তার। গ্রামখানার সঙ্গে সঙ্গে কুরপালার কংগ্রেসকেও সে গ্রাস করিয়াছে। শুধু কুরপালা নয় সারা মহকুমার খদ্দরের মুনাফার শতকরা আশি ভাগ তার সিন্দুকে ওঠে। কাটুনীদের তুলা দিয়া নামমাত্র মূল্যে সে সুতা কিনিয়া নেয়। ঐ সুতা জোলাদের ঘরে দাদন দেয়, সস্তায় খদ্দর তৈয়ারী করায়। কলিকাতার বাজারে চড়া দামে বেচে।

শঙ্কর একদিন ইন্দুপ্রকাশকে বলিল, কংগ্রেস করে এত লোককে জেলে পাঠিয়ে আমরা শেষটায় পুঁজিপতিদের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছি ?

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, এছাড়া উপায় ছিল না ভাই। জেল থেকে বেরিয়ে দেখি কংগ্রেসের ঘরে তালা লাগানো। আমার হাতে একটি কপর্দক নেই। লোকে ভয়ে এদিকে ঘেঁষে না। তখন বঙ্কিমই এসে টাকা দিলে। তার দেখাদেখি আর পাঁচজন এলো। কিছুদিন পরে দারোগা

এসে বললে, চরকা আপনারা চালান। ওতে সরকারের আপত্তি নেই। ওটা হোম ইণ্ডাস্ট্রি।

মাকে প্রণাম করিয়া দু'একদিন পরেই নারায়ণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শঙ্কর বঙ্কিমের কারখানায় গেল। নারায়ণ তখন একমনে কাজ করিতেছিল। কাঠের প্রকাণ্ড একটা দরজার উপর সূর্যের রথ খোদাই করিয়া তুলিতেছে। রথের সাত সাতটা ঘোড়াই বল্গার বন্ধন মানিতে চায় না—এত তেজস্বী, এত সজীব।

শঙ্কর পিছনে দাঁড়াইয়া নীরবে এই কারুকাজ দেখিতেছিল। নারায়ণ তাকে লক্ষ্য করিল না। সে একমনে কাজ করিয়া যায়, ঘাড় বাঁকাইয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে নিজের কাজ দেখে। বাটালি দিয়া কোন জায়গায় দু'একটা ঠোকর মারে। পাছে তার ঘোড়ার গায়ে আঘাত লাগে সেই ভয়েই যেন অতি সন্তর্পণে বাটালি চালায়।

নারায়ণের এই চাকরির একটা ইতিহাস আছে। জেল হইতে ফেরার কয়েকদিন পরে ছল্লির খালপারে বঙ্কিমের সঙ্গে তার দেখা। বঙ্কিম বলিল, আমার কতগুলি কাঠের কাজ ছিল। আমার ইচ্ছে তোমাকে দিয়ে করাই।

নারায়ণকে ইতস্তত: করিতে দেখিয়া সে আবার বলিল, এ তল্লাটে তোমার মতন মিস্ত্রী আর নেই। তুমি যদি রাজী না হও তাহলে কলকাতা থেকে চীনে মিস্ত্রী আনাতে হবে।

নারায়ণের এ সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। এ অঞ্চলে তার মতন কারিগর আর নাই। কলিকাতায় আছে, তাও শুধু চীনারা। কথাটায় খুশি হইয়া সে বলিল, কি কাজ কর্তা?

কাঠের কাজ। ছবি দেখে কাঠের উপর খোদাই ক'রতে হবে—বলিয়া বঙ্কিম তাকে কারখানায় লইয়া আসে। সে ডেস্কের ভিতর হইতে

কতগুলি ছবি বাহির করিয়া নারায়ণের হাতে দিলে সে বহুক্ষণ ধরিয়া ঐগুলি দেখিল। তারপর বলিল, খাসা কাজ, কোথায় ছবি?

বঙ্কিম উত্তর করিল, পুরনো সব মন্দির মসজিদের।

বড় সুরক্ষু কাজ ত'। আমারে একটু কাগজ পেন্সিল দেও বাবু।

নারায়ণ কাগজ পেন্সিল লইয়া ছবি আঁকিতে আরম্ভ করে।

বঙ্কিমের আরও পাঁচটা কাজ আছে। এক একবার সে বাহিরে যায়, ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, হ'ল?

ঘন্টাখানেক পরে নারায়ণ বলিল, খালি নকল করা ত'? তা পারব কর্তা। কারচুপির কাজ আমিই করব। তবে আমারে আর এক জন লোক দিতে হবে। আর থাকার একটু জায়গা।

কেন? তোমার নিজের ভিটে রয়েছে।

করব আপনার কাজ আর থাকব যাইয়া স্বদেশী-বাবুদের সঙ্গে আমার কেমন যেন লজ্জা করে।

লজ্জা, কেন কি হয়েছে?

নারায়ণ কোন উত্তর করে না।

বঙ্কিম বলিল, কংগ্রেসকেও ত' আমি যথেষ্ট সাহায্য করি।

আবার বিলাতী বস্তরের কারবারও ত' কর। থানা পুলিসে—কথাটা নারায়ণ শেষ করিল না।

বঙ্কিম বলিল, হুঁ—

কোনদিনই সে যে লোকপ্রিয় নয় বঙ্কিম তাহা জানিত। তবে তার ধারণা ছিল কংগ্রেসের কাজে ইন্দুপ্রকাশকে সাহায্য করায় সম্প্রতি পাঁচজনের বিরুদ্ধ ভাবটা হয়ত কমিয়া গিয়াছে।

নারায়ণের কথায় সে একটু ক্ষুব্ধ হইল বটে, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে সেই ক্ষোভটুকু ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, থাকবে আমার কারখানায়।

নারায়ণ বলিল, নিজের খুশি মাফিক দু'একটা কাজ করতে পারবত' ?

কি রকম ?

যেমন ধরেন দরজার উপরে একটা পদ্ম তোললাম। আলমারির গায়ে হরিণ। ·

বঙ্কিম বলিল, তা পারবে বৈকি।

নারায়ণ জেল হইতে ফিরিয়া অবধি হাস্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবিতেছিল। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া মানে কংগ্রেস ত্যাগ করা। নিজের ভিটা ত্যাগ করা। মন যখন এইরূপ দোদুল্যমান ঠিক সেই সময় আসিল বঙ্কিমের প্রস্তাব। সে আর দ্বিধা করিল না।

কাজ করিতে করিতে মুখ তুলিয়া সামনে শঙ্করকে দেখিয়া নারায়ণ বলিয়া উঠিল, দণ্ডবৎ হই দাদাবাবু, কবে আইলা ?

এসেছি আজ তিন দিন। কেমন আছ তুমি ?

আমার শরীল গতিক ত' কুশল। তুমি দেখি চিমসা মারিয়া গেছ।

শঙ্কর কহিল, যতটা বলছ অত রোগা হইনি ভাই। তবে মাঝে আমি একটু বেশী খারাপ হয়েছিল। যাক আমি তোমায় নিতে এসেছি।

নারায়ণ কোন উত্তর করিল না। দাদাবাবুর কথায় কোনদিনও সে 'না' বলে নাই। আজও 'না' বলিতে বাধ বাধ ঠেকে।

একটুক্ষণ পরে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, চুপ ক'রে রইলে যে ?

এবার এক নিঃশ্বাসে নারায়ণ বলিয়া ফেলিল, যাব না। যাওয়ার আমার উপায় নাই। থাকলে তুমি আইছ শুনিয়াও কি চুপ করিয়া থাকি ?—বলিতে বলিতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শঙ্কর তাঁর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, কি হয়েছে বল দেখি। রাগ করেছ কেন, কার উপর ?

সে তোমারে কওয়া যায় না। তার থা চল আবার কাজ দেখবা।

নারায়ণ শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার কাজ দেখায়। সুন্দর বুদ্ধমূর্তি, সূর্যের সপ্তাশ্ব, পাণ্ডবদের পাশা খেলা, কাঠের উপর খোদাই করা নানা চারু শিল্প।

শঙ্কর যন্ত্রচালিতের মতন সব দেখিতে থাকে। কেনই যেন তার মনে হয় নিজেকে সে এতদিন যতটা বড় মনে করিয়াছে ততটা বড় সে নয়। সরল সাদাসিধা এই মানুষটি, তার ছোট ভাইটি যেন কোন কোন বিষয়ে তার চেয়ে বড়। এমন আর কোনদিনও মনে হয় নাই। একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা আদম কংগ্রেস ছাড়ল কেন বলতে পার?

নারায়ণ উত্তর করিল, তারে কে যেন বুঝাইছে যে মুসলমানগো শত্তুর হিন্দুরা, সাইবরা নয়। হিন্দু জমিদার আর মহাজনে তারগো শুষিয়া খায়। তাগো সঙ্গে স্বদেশী করলে মোছলমানগো ক্ষেতি।

এই কারণে বহু মুসলমানই কংগ্রেস ছাড়িয়া গিয়াছেন। ঐক্যবদ্ধ হইয়া জাতির দাবি জানাইবার শক্তি দিনের পর দিনই লোপ পাইতেছে। শঙ্কর ইহা জানিত। সে জানিত মোসলেম সমাজের এই অবিশ্বাস দেশকে যুগ যুগ পিছাইয়া দিবে। হলাহলের সৃষ্টি করিবে। সেই হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে পারে জাতির এমন শক্তি কোথায়?

অনেক বেদনা লইয়াই শঙ্কর সেদিন কংগ্রেস আশ্রমে ফিরিল।

কয়েকদিন পরের কথা। শঙ্কর আলিমেহেরের কাছে গিয়া এক প্রস্তাব করিল, কুরপালায় একটা রাস্তা করতে চাই, এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

মজিদের মিলের দৌলতে নদীর কাছ দিয়া দুইটি পাকা রাস্তা তৈয়ারী

হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের লোকের কোন সুবিধা হয় নাই। বরং অনেককে জমি ও ঘর-বাড়ী ছাড়িতে হইয়াছে। যে দিকটায় লোকের বসতি সেখানে আগেরই মতন জলকাদা ভাজিয়া যাতায়াত করিতে হয়।

আলিমেহের বলিল, এটা একটা কাজের মতন কাজ, কর্ত্তা। কিন্তু জমি পাবা কোথায়? আর খাটবেই বা কেডা?

শঙ্কর একটু ভাবিয়া বলিল, জমি দেবেন আপনারা। আর খাটব আমরা, আমি, আপনি।

আলিমেহের বলিল, আপনি নিজে পথ বাঁধবা? বেশ, তা হৈলে আমরাও আছি তোমার পিছনে। এতে গ্রামের দশজনের ভালই হবে।

শঙ্কর মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের হাতে ম্যাপ আঁকে। যাতে বেশীর ভাগ লোকের সুবিধা হয় তার লক্ষ্য সেইদিকে। তার পরিকল্পনায় গ্রামবাসীরা খুশি হয়। বলে, ধানকাটা হইয়া যাউক। তারপর আমরাই মাটি কাটব।

রাস্তার জন্য জমি ছাড়িয়া দিতেও রাজী হয় প্রায় প্রত্যেকে। প্রথমে আপত্তি করে শুধু পাঠানপাড়ার ইয়াকুব। সে বলে বাড়ীর পাশে রাস্তা হইলে জানানার আবরু থাকবে না।

আর একদিন যদু নাপিত আসিয়া শঙ্করের কাছে ভূমিকা ফাঁদে, বাড়ীর পাশে রাস্তা হবে, পাঁচজনের পায়ের ধুলা পড়বে, এ ত' ভারী পুণ্যের কথা।

বিজু পাশেই একটা চেয়ারে বসিয়াছিল। সে বলিল, সোজাসুজি মনের কথাটা বলে ফেল দেখি, যদু।

যদু মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলে, আমার নাপিনের গর্ভধারিণী একটু বক্র হৈয়েছেন।

হাসি চাপিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, বক্র হবার কারণ ?

লোকে নিজের জমির উপর দিয়া বাদ্যি-বাজনা করিয়া যাবে এটা তানার পছন্দ না। নাগিনের মা কয়, জমিতে দাঁড়াইয়া ঢাক ঢোল বাজানো আর বুকের উপর হাল চষা ত' একই কথা।

যদুর জমি বাদ দিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিমে রাস্তা যাওয়া অসম্ভব। অথচ অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীই ঐদিকে। পাঠানপাড়া, জোলা ও কুমার পাড়ায় যাওয়ার ঐছাড়া আর পথ নাই।

শঙ্কর ইন্দুপ্রকাশকে বলে, এদের ভাল করারও উপায় নেই, দাদু। সর্বত্রই অবিশ্বাস ও কুসংস্কার। যদু বোকা মানুষ, তার কথা নয় ছেড়েই দিলুম। কিন্তু ইয়াকুবের মতন লোকেও যে বাধা দেবে এ কথা ভাবতে পারি নি।

ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, পাঠানপাড়ায় আলিমেহেরের পর ইয়াকুবরাই বনেদী। ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি আবরুর প্রতি ওদের বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাসেরই মতন গভীর।

শঙ্কর বলিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি রাস্তা করতে চাইত তা হ'লে বাধা দিত কি করে ?

ইয়াকুব আবরু রক্ষা করেই তার ব্যবস্থা করত আর যদু ও তার বৌ ঘটনাটাকে মেনে নিত অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য বলে। কিন্তু সেই দুর্ভাগ্য থেকেও আমরাই ত' ওদের বঞ্চিত করেছি, ভাই। রাণীডাঙ্গা, হরিচট্টের বাবুরা, ন'পাড়া দক্ষিণদির বড় বড় মিয়ারা জেলাবোর্ড, লোকাল বোর্ডের সভ্য হয়ে নিজ নিজ গাঁয়ে, শ্বশুর বাড়ী মামা বাড়ীর গাঁয়ে সরকারী পথঘাট, টিউবওয়েল করিয়ে নিয়েছেন। বাদ পড়েছে পুনতি, কুমপালা, গোপালপুর।

শঙ্কর কহিল, ভাল লোকের হাতে পড়লে এরকম হত না।

তার কথা শুনিয়া বিষ্ণু একটু হাসিল। ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, ভালমন্দের মাপকাঠি কি ভাই? দেবেন রায় ভাল মানুষ ছিলেন, ছিলেন দাতা, গরিবের বন্ধু, একথা তার শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারত না। অথচ একবার কুরপালায় রাস্তা হওয়ার কথা উঠলে সেই দেবেন রায় বললেন, ওদের ত' রোজ রোজ স্কুল ডাকঘরে যেতে হবে না। হপ্তায় দু'দিন হাট, তা নয় একটু কাদা ভেঙেই করবে। রাস্তা বেঁধে শুধু শুধু জমি নষ্ট করা কেন? তার চেয়ে বরং সেই জমিতে দুটো লাউ কুমড়ো করুক গিয়ে। খেয়ে বাঁচবে।

বিষ্ণু বলিল, দোষ দেবেন রায়ের নয়, সমাজ ব্যবস্থার। It is your system Dadu, capitalist system.

ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, তুমি ত' সব ব্যাপারেই ধনতান্ত্রিক সমাজের দোষ দেখতে পাও। সেদিন যদু এসেছিল স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে নালিশ করতে। তুমি সামনে থাকলে বলতে এও ধনতন্ত্রবাদের দোষ।

বিষ্ণু কহিল, নিশ্চয় বলতাম। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, ওখানেও টাকা পয়সার ব্যাপার আছে।

লোকের ভাবগতিক দেখিয়া শঙ্কর প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। বিষ্ণু তাকে উৎসাহিত করিল। সে বলিল, হাল ছেড় না ভাই। ওদের ভিতর, এদেশের চাষী মজুরদের ভিতর এখনও কিছু সার বস্তু আছে। তারা সোনা, খাদ কিছু থাকলেও খাঁটী সোনা।

ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, কাজে হাত দিয়ে কখনও নিরুৎসাহ হতে নেই, সুদিন আসবেই, আসবে ভগবানের পুরস্কার।

অনেক লেখালেখি করিয়া তারা যদু নাপিতের ছেলে নাসিরকে দেশে আনাইলেন। সে তার মায়ের মত করাইল। সম্মতি দেওয়ার আগে তিনকড়ি অবশ্য গালাগালি করিতে ছাড়িল না। বলিল, তোরা হইলি

বোকার ঝাড়। হইত আমার বাপের বাড়ী, দেখাইয়া দিত রাস্তা করা কারে কয়।

আলিমেহেরের অনুরোধে ইয়াকুব বাড়ীর কিছু দূরে খানিকটা জমি ছাড়িয়া দিল।

ধান কাটার পর চাষীদের অবসর প্রচুর। জমিও তখন শুকনা খট্‌খটে। একটা শুভদিন দেখিয়া কাজ শুরু হইল। সকালে নাস্তা করিয়া অর্থাৎ পান্তা ভাত, বা গুড় মুড়ি চিঁড়া খাইয়া দলে দলে লোক আসিয়া এরফানের বাড়ীর নীচে জড় হইল। আবার হিন্দুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল মুসলমান। ব্রাহ্মণের পাশে নমঃশূদ্র, কায়েতের পাশে কাহার। যুবকের সংখ্যাই বেশী, বয়স্কদের মধ্যেও আছেন আলিমেহের, ভজহরি প্রভৃতি।

প্রথমে ইন্দুপ্রকাশ ছোট্ট খন্তা দিয়া এক চাক মাটি তোলেন। স্বেচ্ছাসেবীরা চীৎকার করিয়া ওঠে, গান্ধী মহাত্মা কি জয়, হিন্দুস্থান কি জয়। মুসলমানেরা বলেন, আল্লাহো আকবর। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ যেন খন্তায় খন্তায় ছাইয়া যায়।

মাটিকাটা দেখিতে এরফানের বাড়ীর নীচে কতগুলি স্ত্রীলোক জড় হইয়াছিল। কানাই বেনের বউ বলিল, বাবুরা কাটবে মাটি, তা হলেই হইছে।

এরফানের মা খাদিজা বলিলেন, তাজ্জব কারখানা যারে কয় রাঘবের মা। ছোট রাজার ছাওয়াল, বুড়া গাঙ্গুলী মশায়, এরা খন্তা ধরছে আমার কোরফার লগে। একটু থামিয়া বৃদ্ধা আবার কহিলেন, ছাখো আমার কোরফা কেমন খন্তা চালায়, মাটির কত বড় বড় চাক তোলে, আর দেখতা নাড়্‌ থাকলে—

পরের দিন কর্মীরা শঙ্করকে কহিল, আপনার মাটি কাটিয়া কাজ নাই। শরীরে পোষাবে না?

শঙ্কর হাতের গুলি ফুলাইয়া বলে, দেখত পোষাবে কি না।

কর্মীদের প্রচুর উৎসাহের ফলে এক মাসের মধ্যে যদু নাপিতের বাড়ী পর্যন্ত পথ বাঁধা হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষাশেষি রাস্তাটা পাঠানপাড়ায় আসে। বাকী তখন অতি সামান্য। এই সময় একদিন বঙ্কিম আসিয়া নারায়ণের ভিটায় উপস্থিত। সে ইন্দুপ্রকাশকে বলে, আপনারা অসাধ্য সাধন করেছেন, আপনি ও শঙ্কর।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, করেছে চাষী মজুরের দল। আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তারা।

বঙ্কিম বলিল, আর কেউ কিন্তু তাদের দিয়ে করাতে পারত না।

শঙ্কর বলিল, এটা যুগের ধর্ম।

কর্মীদের খাওয়ার জন্য আমি যৎসামান্য কিছু দিতে চাই—বলিয়া বঙ্কিম ইন্দুপ্রকাশের হাতে একশত টাকা দিলে তিনি তার মাথার উপর ডান হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

একটু পরে বঙ্কিম কহিল, আমার একটা প্রার্থনা ছিল।

ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, কি বল ত'?

রাস্তাটা আমার বাবার নামে—

বঙ্কিমের কথা শেষ হওয়ার আগেই ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, সে ত' সুখের কথা। শঙ্কর, রাসেদুল রাস্তাটা হারানের নামেই হোক। কি বল তোমরা?

উপস্থিত সকলেই ক্ষুণ্ণ হইল। বঙ্কিম চলিয়া গেলে শঙ্কর কহিল, আমাদের উপর আপনি অবিচার করলেন দাদু। আমরা ঠিক করেছিলাম রাস্তা হবে আপনার নামে।

ইন্দুপ্রকাশ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন, হারানের নামেই হোক ভায়া। সে ছিল পুণ্যাত্মা মানুষ। জীবনে কাউকে কখনও ঠকায়নি। বঙ্কিম তার পুণ্যের ফল ভোগ করছে। কথায় বলে, পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং।

বিষ্ণু বলিল, এর কার্যকারণ সম্পর্ক ঠিক বুঝলাম না দাদু, একজন পুণ্য করেও আমরণ দুঃখে কষ্টে থাকবে, আর একজন করবে তার ফল ভোগ—এ যেন বিধাতার কেমন অবিচার।

ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, ও কথা বল না ভায়া। তাঁর ব্যবস্থার কতটাই বা আমরা বুঝি?

তেইশ

একদিন গভীর রাত্রে হাস্তের ডাকে শঙ্করের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে এসেছ যে? ব্যাপার কি?

হাস্ত বলিল, আমার বাড়ীতে একবার চল দাদাবাবু। এখনই চল।

কেন হয়েছে কি?

নাড়ু ঠাকুরপোর ঘাড়ের উপর কে যেন কোপ মারছে। সে আমার পাছ দুয়ারে নোনাতলায় পড়িয়া আছে।

খড়মের শব্দে পাছে বিষ্ণুর ঘুম ভাঙিয়া যায় এইজন্ত ইন্দুপ্রকাশ পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ঘাড়ে কোপ! রক্ত বন্ধ হয়েছে ত?

হাস্ত বলিল, বন্ধ হয় নাই। একটু কমছে। মহারাণীর মা দূর্বা চাপিয়া ধরায় রক্ত আর ফিনিক দিয়া বাইর হয় না।

ইন্দুপ্রকাশের মুখ দিয়া বাহির হইল একটা 'ইস্'। তার পরই তিনি নিধিরাজকে ডাকিয়া রঞ্জিত ডাক্তারের বাড়ী যাইতে বলিলেন।

নিধিরাজ মাথায় পাগড়ি চড়াইল। হাতে নিল তেল কুচকুচে লাঠি। এটা তার বহুদিনের অভ্যাস, যুবা বয়সের। তখন তার শত্রু ছিল অনেক, সর্বদাই মাথায় লাঠি পড়ার আশঙ্কা থাকিত। শঙ্করের প্রভাবে এখন সে হিংসা ছাড়িয়াছে বটে কিন্তু অভ্যাসটা ছাড়িতে পারে নাই। সে বলিল, আপনারা একজনে বরং ডুইটা ছত্তর লেইথ্যা দাও।

শঙ্কর একটা চিরকুট লিখিয়া দিলে নিধিরাজ বন্দেমাতরং বলিয়া ছুটিয়া চলিল।

ইন্দুপ্রকাশেরও ·ারায়ণকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শঙ্কর বারণ করিল, বিষ্ণু উঠে যদি আমাদের দু'জনকেই দেখতে না পায় তাহলে তার অসুখ হয়ত বেড়ে যাবে।

ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, বেশ তুমিই যাও।

নতুন রাস্তা হওয়ার পর কুরপালার প্রায় সব বাড়ীতেই হাঁটিয়া যাতায়াত করা চলে। রাণীডাঙ্গায়ও যাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষায় [illegible]র বাড়ীর অবস্থা হয় দ্বীপের মতন। যাতায়াত করিতে নৌকা লাগে।

হাস্য তালের ডোঙায় আসিয়াছিল। সে ও শঙ্কর সেই ডোঙায়ই রওনা হইল। শালতির চেয়েও ছোট ডোঙা, এমনিই টাল খায়। একটু কাত হইলে জল উঠিয়া পড়ে। শঙ্কর লগি বাহিতে আরম্ভ করিলে হাস্য বলিল, ওটা আমারে দাও। তুমি পারবা না।

কেন? আমিত লগি দিয়া নৌকা বাই।

হাস্য বলিল, কিন্তু ডোঙা বাওয়া তারথা শক্ত।

তা হক গে, মেয়েছেলে হয়ে তুমি নৌকা বাইবে আর আমি বসে বসে যাব তা হয় না।

হাস্থ বলিল, বেশ।

ভরা ভাদ্র। কচুরিপানার ধাপে খাল বিল সব ঠাসা। লগি ঠেলিয়া মাঝিরা তার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়াছে। সরু পথ।

চাঁদিনী রাত। জলের বুকে, কচুরিপানার ডগায় ডগায় জ্যোছনার ছড়াছড়ি। শঙ্করের লগি বাহিয়া তরল জ্যোছনা গড়াইয়া পড়ে। জলের উপরে একটু ফাঁকা পাইলেই চাঁদ সেখানে লুটাপুটি খায়। একটা নয় চাঁদ অগণন, দেখিলে মনে হয় সুন্দরী তরুণীর দল অবগাহনে নামিয়াছে।

শঙ্করের ডোঙা খালি টাল খায়, একবার ডাইনে, আবার বাঁয়ে। হাস্তের ভয় হয় এখনই বুঝি ডুবিয়া যাইবে। সে দুইটা ধার চাপিয়া বসিয়া থাকে।

নতুন পথের উপর সাঁকোর তলায় জলের তোড় বেশী। হাস্থ আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিল। শঙ্কর কহিল, ভয় নেই। চুপ করে ব'স দেখি।

সাঁকোর বাঁশে লাগিয়া ডোঙা ডুবিয়া যাইতেছিল। অতি কষ্টে রক্ষা পাইল বটে কিন্তু লগির জলে হাস্যের সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। হাস্য বলিল, আগেই ত' কইছিলাম।

শঙ্কর কহিল, দুদিন ডোঙা বাইলে সবাইকে আমি হারিয়ে দেব। তোমাদের ঐ কবি মাঝিকে পর্যন্ত।

হাস্য বলিল, তা তুমি পারবা জানি। তার গলা একটু কাঁপিয়া গেল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে বল দেখি?

হাস্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দেয়। বেড়ার উপর শব্দ শুনিয়া তার ঘুম ভাঙিয়া যায়। মনে হয় কে যেন বেড়ার বাঁধ কাটিতেছে। একটু পরে শুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। নারায়ণ চীৎকার করিয়া ওঠে, ওরে বাপু, গেলাম রে। তার পরই সব চুপ।

হাস্য আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে নারায়ণ তার ঘরের পিছনে, একটু দূরে নোনাগাছতলায় পড়িয়া আছে। সে তখন গোঙাইতেছিল। হাস্যের পায়ের শব্দে একবার চোখ মেলিয়া বলিল, একটু জল।

পাশের বাড়ী হইতে মহারাণীর মাকে ডাকিয়া তাকে ও জুড়ানিকে নারায়ণের কাছে রাখিয়া হাস্য কংগ্রেস আপিসে খবর দিতে ছুটিয়া আসিয়াছে।

নোনাতলায় ছোট একটা লণ্ঠন জ্বলে, তার আলোয় জুড়ানির ভয় চকিত মুখ দেখা যায়। একেবারে পাংশুবর্ণ। সে মহারাণীর মায়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে। আর মহারাণীর মা নারায়ণের মাথার উপর হাত রাখিয়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন আওড়াইতেছে। বোধ হয় মন্ত্র। পিছনে বরুণ গাছের উপর তার ছায়া। গাছটার পাশ দিয়া জুড়ানির ছায়া মণিরামের এঁদো পুকুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ছায়া দুটিই বড়—তবে জুড়ানিরটা সুবৃহৎ।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আলো আঁধারের ছক তারই মধ্যে নারায়ণের শায়িত দেহ, জুড়ানির ছায়া বুড়ার মন্ত্র আবৃত্তি; সব মিলিয়া স্থানটাকে রহস্যপূর্ণ করিয়া তোলে।

হাস্ত যখন শঙ্করকে খবর দিতে যায় তখনও নারায়ণের জ্ঞান ছিল। সে হাস্তকে নিষেধ করে, তুমি যাইও না, বোঠান। অরা ভাববে কি?

হাস্ত বলে, আমার গো দাদাবাবু আর দা'ঠাকুর ত'? তানারা তেমন মানুষ নয়।

আর পাঁচজন ত' আছে।

হাস্ত বলে, তাদের কথা বড় না তোমার জীবনটা বড়?

শঙ্কর আসিয়া দেখিল নারায়ণের জ্ঞান নাই, তার ক্ষত হইতে একটু একটু রক্ত বাহির হইতেছে। নাড়ী মাকড়সার সুতার মতন ক্ষীণ, পাওয়া যায় কি যায় না।

মহারাণীর মা বলিল, বিশল্যকরণী পাইলে রক্তটা বন্ধ করতে পারতাম।

লক্ষণের শক্তিশেলের সময় বিশল্যকরণী খুঁজিতে যাইয়া হনুমান গোটা একটা পাহাড় তুলিয়া আনে, শঙ্কর বিশল্যকরণী সম্বন্ধে এইটুকুই জানিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, জিনিসটা কি?

মহারাণীর মা বলিল, একটি গাছড়া। দিলেই রক্ত বন্ধ হয়। খুব উপকারী।

কোথায় পাওয়া যায়?

মোল্লার ভিটায়।

একটু পরে রঞ্জিত ডাক্তারকে লইয়া নিধিরাজ আসিল। তার এক হাতে হারিকেন, আর এক হাতে লাঠির ডগায় ডাক্তারের ব্যাগ।

ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ইন্‌জেকসন্ দিয়া ডাক্তার অপেক্ষা করিতে থাকে। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, দেখলেন কেমন?

ভেরি সিরিয়স। অস্ত্রটা ছিল খুব ধারাল। ভাগ্যিস মাঝ পথে আটকে গিছল, নইলে দুখণ্ড হয়ে যেত।

শুনিয়া হান্ত চোখ বোজে। ডাক্তারের সম্মতি লইয়া শঙ্কর বিশল্য করণীর জন্ম নিধিরাজকে মোল্লার ভিটায় পাঠাইয়া দেয়।

শেষ রাত্রের দিকে নারায়ণের অবস্থার কিছু উন্নতি হইলে ডাক্তার চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় বলিল, একটা Anti tetanus Injection আনিয়ে নিও। আর রোগীকে মোটে উঠতে দেবে না। হার্ট খুব দুর্বল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, ইনজেকসনটা রাণীডাঙ্গার কোন ডাক্তারের কাছে আছে ?

না, কাল পর্যন্ত বরং আমার কাছেই ছিল।

সাগর দীঘিতে পাওয়া যাবে ?

সম্ভব না। ওর জন্য মহকুমায় যেতে হবে।

বেশ, আপনাকে খবর দেব কখন ?

খবর দেওয়ার দরকার নেই। বেলা দশটার সময় আমিই আসব।

ভোরে ইন্দুপ্রকাশ আসেন। নারায়ণের মাথায় পূজার ফুল দিয়া তার শিয়রে বসিয়া মহিম্ন স্তোত্র পাঠ করেন। কী গভীর একাগ্রতা, কী গম্ভীর উদাত্ত স্বর। তাঁর দিকে চাহিয়া চাহিয়া নারায়ণ মনে বল পায়। স্তোত্র পাঠ শেষ হইলে বলে, ওষুধের কিছু দরকার নাই। আমি সারিয়া উঠব আপনার আশীর্বাদে। একটু পায়ের ধুলা দেন।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, না, না ওষুধ খাবে বৈকি।

নারায়ণ বলিয়া ওঠে, তা হইলে আর পূজা করা কেন ? আপনার মাহাত্ম্যটাই বা কি ? কই একটু পায়ের ধুলা দিলেন না ?

কয়েকটা দিন কাটে আশঙ্কায়। শঙ্কর, নিধিরাজ, কোরফান পালা করিয়া শুশ্রূষা করে। ঘা ধোয়ায়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়। পথ্য দেয় হাসয। রোগীকে সামান্য একটু আরাম দিবার জন্য তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না।

নারায়ণ ঔষধ খায় না, ইন্‌জেকসন্ নেয় না। সেই যে জিদ্ ধরিয়াছে, ওষুধই যদি খাব তা হইলে আর দাদামশাইর পূজার ফুল মাথায় দি কেন, সে সঙ্কল্প হইতে কেহই তাকে টলাইতে পারে নাই।

মধ্যে একদিন অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। শঙ্কর বলে, ভয় নেই। দাদামশাই পূজোর ফুল পাঠিয়েছেন।

ভয় কিসের? দেও, ফুলটা দেও—বলিয়া নারায়ণ হাত বাড়াইয়া দেয়।

একদিন বঙ্কিম আসিল। নারায়ণের উপর তার অনেক কাজের ভার। অশিক্ষিত এই যুবক বুদ্ধের নাম শোনে নাই, কিন্তু ছবি দেখিয়া সুন্দর বুদ্ধ-মূর্তি খোদাই করিয়াছে। কারখানার ফটকের উপর সূর্যের রথ আঁকিয়াছে। কাঠ কুঁদিয়া তুলিয়াছে জাতকের কাহিনী ও নিমাই সন্ন্যাস। অনেক কাজ সে করিয়াছে কিন্তু বাকী আরও অনেক।

বঙ্কিম তার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা দিয়া গেল। শঙ্করকে বলিল, ওষুধ পথ্যির জন্য যখন যা দরকার আমাকে বলে পাঠিও। এর জীবন ভারী মূল্যবান। এমন একটা গুণী লোক এ তল্লাটে নাই।

কথাটা শুনিয়া নারায়ণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে হাস্তু কাছে আছে কিনা। শঙ্কর বলে, কি চাই নারাণ?

নারায়ণ মাথা নাড়াইয়া জানায়, না, সে কিছুই চাহে না।

বিপদের আশঙ্কা কমার সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষাকারীর সংখ্যাও কমে। রাত জাগার দরকার নাই তাই রাত্রে আর কেহ থাকে না।

হাস্তুর কাজ বাড়িয়াছে। যে সময়টা আর পাঁচজন রোগীর কাছে থাকিত তার খানিকটা সময় হাস্তুকে থাকিতে হয়। সে উঠিতে চাহিলেই নারায়ণ তার হাত ধরিয়া বলে, তুমি একটু বইস। এইত আইলা।

এই আইলাম! রদ্দুর যখন ঢেঁকিঘরের বারান্দায়, আইছি তখন। আর এখন সাঁঝবাতি জ্বালার সময় হইল।

তা হউক। তুমি বইস—বলিয়া নারায়ণ তার হাত ধরিয়া বসায়। আবার গল্প জুড়িয়া দেয়, দুই দুইবারের জেলের গল্প, ফেরার থাকার সময়ের সব অভিজ্ঞতা। কিন্তু সবচেয়ে ফলাও করিয়া বলে, সর্বদমনকে জব্দ করার ইতিহাস:—

আমার মায়রে চৌদ্দ আনা দিয়া চোবে দুই টাকা চাইল। রোজই তাগিদ দিত। আমি যাইয়া চৌদ্দ আনা দিতে চাইলে আমারে গাইল মন্দ করল। আমি তখন তার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়লাম।

ও যত কয়, চৌদ্দ আনা হাম নেহি লেগা, হাম দো রূপয়া মাংতা, আমি ততই ঘুষা মারি। চোবে শেষটায় সেই চৌদ্দ আনায়ই রাজী। কিন্তু পয়সা হাতে লইয়া বেটা কয় কি, ঘুষিকা আস্তে দো আনা দে নাড়ু। একঠো রূপিয়া পুরা করকে দে। অনেক ঘুষা মারছিলাম তাই পুরা একটা টাকাই দিলাম।

হাসু বলিল, তারপরও সে আমারে চৌদ্দ আনা দিয়া দুই টাকা নিছে।

নারায়ণ গর্জিয়া উঠিল, তাই নাকি? বেটারে তা হইলে—

হাসু দেখিল কথাটা বলা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। সে বলিল, ভাল মনে পড়ছে, তোমার দুইটা শশা ছিল।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, পাইলা কোথায়?

তুমি ঘুমাইয়া ছিলা, খাদিজা বিবি তখন দিয়া গেছেন।

শশা খাইতে খাইতে নারায়ণ বলিল, তুমি একটু খাও।

না থাউক।

কেন? তুমিও ত' শশা ভালবাস। মনে আছে মাচার তলায় সেই শশা চুরি?—বলিয়া নারায়ণ হাসিয়া ফেলে।

হাসু ফিক করিয়া হাসিয়াছিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া গেল। হাসি-কান্নায় জড়ানো জীবনস্মৃতি এমন করিয়াই তাকে হাসায় আবার পরক্ষণে গম্ভীর করিয়া তোলে।

নারায়ণ মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি ভাবতেছ বোঠান?

হাসু জবাব দেয়, ও কিছু না।

শরীর একটু সারিলেই নারায়ণ একদিন বলিল, এবার আমি বঙ্কিম কুণ্ডুর কারখানায় চলিয়া যাব।

সেখানে দেখবে কেডা?

তা উপায় একটা হবেই। এখানে থাকা আর ভাল দেখায় না।

যেদিন যাওয়ার কথা তার আগের দিন রাত্রে নারায়ণ বিছানায় ছটফট করিতেছিল। যাওয়ার প্রস্তাব সে নিজেই করিয়াছে। কিন্তু কেহ হাতের খেলনা কাড়িয়া লইবে বলিলে শিশুর মনের অবস্থা যেরূপ হয় আজ তার অবস্থা হইল সেইরূপ।

গভীর রাত্রেও সে ছটফট করিতেছে টের পাইয়া হাস্থ তার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখনও ঘুমাও নাই যে? দুপুর রাতের বাজকুড়াল পাখী কত আগে ডাকিয়া গেছে।

নারায়ণ বলিল, গেছে নাকি? আমি ত' টের পাই নাই।

হাস্থ জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীর খারাপ লাগে বুঝি?

ঘুম আসে না, কেমন যেন অস্থির করে।

হাস্থ তার মাথার কাছে বসিয়া পাখা করিতে থাকে। এক হাত দিয়া পাখা করে আর এক হাতের আঙুল দিয়া মাথার চুলের মধ্যে সুড়সুড়ি দেয়। নারায়ণের ঘুম না হইলে এমনি করিয়াই ঘুম পাড়ায়। অন্যদিন সে অল্পেই ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু আজ কিছুতেই তার ঘুম আসে না। খালি মনে হয়, কাল এই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

হাস্থ বলে, লক্ষীটির মতন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাক দেখি। ঘুম এখনই আসবে।

প্রদীপের আলোয় দরজার বেড়ার উপর পূর্ণযৌবনা হাস্থের ছায়া দেখা যায়। এক পাশের মাথার কাপড় গলার দিকে সরিয়া গিয়াছে, বেড়ার উপরে তার উন্নত বক্ষ সুন্দর কটিদেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

নারায়ণ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া থাকে, চোখ আর ফিরাইতে পারে না।

সে হাস্তের উরুর উপর একখানা হাত রাখিল। হাস্ত সরিয়া বসিল না, হাতখানাও সরাইয়া দিল না। নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল, সেই রাত্তিরে কি হইছিল কও দেখি।

এই প্রশ্ন আগেও সে করিয়াছে। নারায়ণ জবাব দেয় নাই। আজ একটু ভাবিয়া বলিল, রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখলাম তোমার ঘরের পিছনে তিন তিনটা মানুষ। মনে হইল তারগো মতলব ভাল না। কাছে আসিয়া দেখি, ধারাল দাও দিয়া তারা বেড়া কাটতে আরম্ভ করছে। আসিয়া ধরলাম একজনরে।

হাস্ত জিজ্ঞাসা করিল, তুমি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলা বুঝি?

হ-—তা প্রায় রোজই রাত্তিরে দু'একবার দেইখ্যা যাই। এ বাড়ীতে তোমরা দুইটিতে থাক। কত আপদ বিপদ হইতে পারে।

বঙ্কিমের কাজ নেওয়ার পর নারায়ণ কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট কোন লোকের সঙ্গে দেখা করে না। একবারও নিজের ভিটায় যায় না। হাস্ত জানে তার জন্যই এই সকলের সঙ্গে সে সম্পর্ক ছাড়িয়াছে। সেই মানুষটা আবার তারই বিপদের আশঙ্কায় রাত্রির পর রাত্রি সকলের অগোচরে আসিয়া পাহারা দেয় শুনিয়া হাস্তের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে। তার সহানুভূতি হয়।

নারায়ণ তার সুডৌল বাহু ধরিয়া ধীরে ধীরে চাপ দেয়। লক্ষ্য করে, হাস্ত একটু একটু কাঁপিতেছে। তারও সর্বাঙ্গ ঘামিয়া যায়। সে হঠাৎ ঝড়ের বেগে হাস্তকে বুকে চাপিয়া তার মুখে চুমা খায়, চুমা খায় চোখের পাতার উপর।

মুহূর্তের জন্য হাস্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। স্বপ্নাবিষ্টের মতন তার

সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে। পর মুহূর্তে নিজেকে নারায়ণের বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া বলে, ছিঃ লজ্জা করে না তোমার ?

লজ্জা! হাঃ হাঃ লজ্জাটা কিসের শুনি?—নারায়ণের ভিতরের আদিম মানুষটা একেবারে হিংস্র হইয়া ওঠে। সে বলে, লজ্জা করব কারে? তুমিও কিছু সতী বেহুলা নও। যা ভাবছ কোন কালেও তা হবে না। দাদাবাবু লাথি মারিয়া—

উঃ—বলিয়া হাস্ত আর্তনাদ করিয়া ওঠে। কানের ভিতর দিয়া তার সারা শরীরে যেন বিষ ছড়াইয়া যায়। আর নারায়ণের অবস্থা হয় বিকারের রোগীর মত। কোন কিছু বুঝিবার সামর্থ্য থাকে না। বিরক্তি ও বিফলতায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পরে জ্বালা অনুভব হইলে চাহিয়া দেখে নিজের হাত কামড়াইয়া সে দুই জায়গায় রক্ত বাহির করিয়াছে।

আর দেখে হাস্ত ঘরে নাই। এবার তার রাগ হয় হাস্তের উপর, শঙ্করের উপর। শঙ্কর হাস্তকে চায় না বটে কিন্তু সে তার পথ আগলাইয়া রহিয়াছে। আর থাকিবেও চিরকাল।

পরদিন ভোর হইতেই নারায়ণকে দেখা যায় না। হাস্তও তার কোন খোঁজ করে না।

বেলা দশটা আন্দাজ শঙ্কর আসে, নারায়ণকে না দেখিয়া হাস্তকে জিজ্ঞাসা করে, নাড়ু কোথায়?

হাস্ত বলে, আমি জানি না।

তার উত্তরের ভঙ্গী শঙ্করের নিকট অস্বাভাবিক মনে হয়। সে ভাবে এর মধ্যে এমন কি ঘটিয়া গেল। এই সময় জুড়ানি আসিয়া আকার ইঙ্গিতে জানায়, হাস্ত ও নারায়ণের মধ্যে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের কি হয়েছে হাস্ত?

হাস্ত উত্তর করে, ও তুমি বোঝবা না। দরকারও নাই বোঝার।

শঙ্কর বিস্মিত দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। সে চলিয়া গেলে হাস্ত জুড়ানির গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া বলে, বজ্জাতি তোমার হাড়ে হাড়ে।

মার খাইয়া জুড়ানি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে।

কুরপালার লোকের এবার সময় কাটাইবার খোরাক জোটে। অসীম দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবনে যখন অরুচি ধরার কথা, পরচর্চা বিশেষতঃ নারীর কুৎসা তখন চাটনির কাজ করে। বিজ্ঞেরা বলে, অরগো নটঘট অনেকদিনের। আমাগো আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

আর একদল বলে, হাস্তের পেয়ারের কি শুধু একজন? নাড়ু ছাড়া আরও আছে। তারগো কেউ মার ছে।

তার অন্য কোনও প্রেমাস্পদের সন্ধান পাওয়া যায় না। নারায়ণ একা মানুষ। ধনীর আশ্রয়ে থাকে। তাকে ঘাঁটানো সুবিধাজনক নয়, তাই সমাজশাসনের পূর্ণদণ্ড যাইয়া পড়ে অনাথা এই বিধবার উপর।

সর্দাররা হাস্তকে একঘরে করে। কানাই সর্দারের মায়ের শ্রাদ্ধে মুসলমানদেরও নিমন্ত্রণ হয়। বাদ পড়ে শুধু জ্ঞাতির বৌ হাস্য।

পুকুর ঘাটে মেয়েরা তার সঙ্গে কথা বলে না। জলভরা কলসী লইয়া যাইবার সময় তাকে এড়াইয়া চলে, পাছে ছোঁয়া লাগিয়া যায়। অজুর বাড়ী পর্যন্ত এর ঢেউ পৌছায়। অজু পদ্মকে বারণ করিয়া দেয়, সর্দারনির বাড়ী তুই আর যাইস না।

কেন সে করছে কি?

ওরে সবাই এক ঘরিয়া করছে। পাঁচ দরজায় আমাগো অন্ন। যারে সবাই ছাড়ছে তার কাছে যাইতে নাই।

পদ্ম বলে, ভিক্ষা বন্ধের ভয় আমি করিনা।

আমি তোরে নিষেধ করতেছি! যাইতে পারবি না।

পদ্ম বলিল, অরগো বাপ বেটির কাছে আমাদের দেনা যে কত তা ভুলিয়া গেলা?

অজু বলে, তা ত' বিনা পয়সায় গান শুনাইয়াই শোধ করছি। পদ্ম বলে, তোমার কি একটু চক্ষুলজ্জাও নাই?

অজু গজর গজর করিতে থাকে।

একদিন ভগবান পুরোহিত হাস্তকে আসিয়া বলে, তোমার ব্রত পার্বণ আর করতে পারব না। পরশু জগুর শ্রাদ্ধের তিথি। তুমি পুরানো যজমান। তাই কইয়া গেলাম।

হাস্ত বৎসরে পাঁচটা ব্রত পার্বণ করে। স্বামীর মৃত্যু তিথিতে ভগবানকে দিয়া মন্ত্র পড়ায়।

> তিলং দদ্যাৎ জলং দদ্যাৎ জগুং মঙ্গলমেব চ,
>
> দক্ষিণাং রৌপ্য সিকিং চ কদলী তণ্ডুলং তথা।

ভগবান কয়েকবার এই মন্ত্র আওড়াইয়া কুশির জল কোশাতে ঢালিয়া জগুর আত্মার তৃপ্তি সাধন করে। দক্ষিণা পায় রুপার একখানা সিকি।

হাস্য বলিল, মন্ত্র আর পড়ব না। ওতে আমার বিশ্বাস নাই। আপনি এখন যান দেখি।

তা থাকবে কেন? তোমার মতন মাইয়ার তা থাকে না—বলিয়া ভগবান রাগ করিয়া চলিয়া যায়।

হাস্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। খানিকক্ষণ পরে জুড়ানি আসিলে তাকে বলে, ক' দেখি আমার আর আগের মতন বিশ্বাস নাই কেন? না মানুষে, না ধর্মেকর্মে?

জুড়ানি হাস্তের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়।

চব্বিশ

শঙ্কর মধ্যে মধ্যে মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যায়। সাধারণতঃ যায় বিশ্বনাথের অনুপস্থিতির সময়।

সেদিন সরোজ রান্না করিতেছিলেন। গরম তেলে কালোজিরার ফোড়ন দিয়া কড়াইয়ের মধ্যে পালং শাক ছাড়িয়া দিয়াছেন। সঙ্গে একটু নুন। ঠিক এই সময় শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত। সরোজ বাঁ হাত দিয়া দরজার দিকে পিঁড়ে আগাইয়া দিলেন। শঙ্কর বাহিরে পা ঝুলাইয়া পিঁড়েয় বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

সরোজ নানা প্রশ্ন করেন, বিষ্ণুর খবর, ইন্দুপ্রকাশের খবর। বিষ্ণুর পথ্য জুরিয়া দেয় কে? আচ্ছা, বিষ্ণুর সঙ্গে থাকাটা কি ভাল? যে অসুখ ওর করেছে!

শঙ্কর উত্তর করিল, আমি খুব সাবধানেই থাকি। বিষ্ণুকে ত' আর ফেলে দিতে পারব না। আমাদের জন্য ওর বাবা ওকে তাড়িয়ে দিলেন।

আর পাঁচটা কথাবার্ত্তার মধ্যে সরোজ কহিলেন, ন'পাড়ার ঘোষেদের বাড়ী থেকে এসেছিল তোর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। ওঁরা মস্ত জমিদার, ওঁকে ধরেছে।

জমিদার? তা আমার সঙ্গে তাঁরা মেয়ে দিতে আসবেন কেন?

সরোজ বলিলেন, ইস্। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁদের কি বলব বল্ দেখি। শঙ্কর বলিল, সময় হোক তখন বলব।

তার মানে? বয়স ত' পঁচিশ পেরিয়ে চলল। সময় আর কবে হবে?

শঙ্কর বলিল, আমি আইবুড়ো থাকায় লোকের কাছে তুমি আর মুখ দেখাতে পারছ না বুঝি ?

সরোজ বলিল, তুই হাসতে পারিস, কিন্তু আমার ত' আর কেউ নেইরে !

শাক দিয়া একটু একটু জল বাহির হইতেছিল। সেই জলেই সিদ্ধ হইবে। কথাটা বলার সময় সরোজের বুকের ভিতরও তেমনি বাষ্প জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

শঙ্কর উহা লক্ষ্য করে। তার বুকেও বাজে। সে ভাবে মাকে খুশি করিতে পারিলে কী আনন্দই না হইত।

সরোজ ছেলেকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, সর্দারনিকে তুই ভালবাসিস, তাই না ?

প্রশ্নটা অভাবিতপূর্ব। শুনিয়া শঙ্কর মায়ের মুখের দিকে চায়। সরল সহজ স্বচ্ছ তার দৃষ্টি। হাজারো কথায় যাহা বুঝানো যায়না শঙ্করের চাহনি তাহা বলিয়া দেয়।

পুত্রের মুখের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সরোজ বলেন, জানি আমি। কোন অন্যায় তোকে দিয়ে হবে না। যে রক্তে তোর—কথাটা আর শেষ করিতে পারেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। শেষটায় বলেন, তুই খেয়ে যাস্ কিন্তু। আর ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে যাবি।

বাবা যে রাগ করেছেন। শুনলাম তিনি আমার মুখ-দর্শন করবেন না।

সরোজ কহিলেন, ওকে রাগ বলে নারে। উনি দুঃখিত হয়েছেন হাস্তের ভিটের জন্য।

শঙ্কর বলিল, এই ব্যাপারে আমার কিন্তু কোনও দোষই ছিল না।

দাদামশাই হাস্তের ভিটের কংগ্রেসের মহিলা শাখা খোলার কথা যখন ঠিক করেন তখন আমি জেলে। অথচ বাবার ধারণা তাঁকে অপমান করার জন্য আমিই ওটা করিয়েছি।—কথাগুলি বলিতেও তার কষ্ট হয়। সরোজ উহা লক্ষ্য করেন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শঙ্কর বিদায় লইল। ছেলের কাপড়ের খুঁটে স্বামীর পূজার ফুল বাঁধিয়া দিয়া সরোজ কহিলেন, তুই রাজা হ'।

তার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে সদর ছাড়াইয়া সরকারী রাস্তা পর্যন্ত আসিলেন। এই সময় তাঁর মনে পড়িল রায় বাড়ীর বধূরা ত' এ পর্যন্ত আসে না। আসা নিষেধ; রায়েদের সম্ভ্রমের হানিকর।

তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি শঙ্করের মাথায় শুধু একবার হাত রাখিলেন। মুখে কোন আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন না। হয়ত ভাষা ফুরাইয়া গিয়াছিল।

পথে যাইতে যাইতে শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, মা হাস্ত সম্পর্কে এই প্রশ্ন করিলেন কেন? তিনি কি তবে সন্দেহ করেন? কিন্তু সন্দেহ করার মতন কিছুই ত' সে করে নাই, না হাবভাবে, না আচার ব্যবহারে। কথাটা তার মনকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। কংগ্রেস আশ্রমে ফিরিয়া প্রথমেই সে বিষ্ণুকে বলিল, জান মা আমায় কি বলেছেন?

বিষ্ণু কহিল, কি?

তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন আমি হাস্তকে ভালবাসি কি না?

বিষ্ণু উল্লসিত ভাবে বলিয়া উঠিল, চিয়ারিও।

চিয়ার! এতে আনন্দ করার কি হ'ল?

মা তোমার সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছেন।

একি বলছ? আমি ত' জিনিসটাকে ওভাবে কখনও দেখিনি।

যে হেতু তুমি এখনও উনবিংশ শতাব্দীতেই আছ। ভিক্টোরিয়ার যুগে। সে যুগের নীতিবাগীশতা আজকাল যে অচল, ভাই।

তার মানে?

আমি বলছি ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংলণ্ডে লিবারেলদের যে নৈতিক এবং রাজনৈতিক কতকগুলি আদর্শ ছিল, আমাদের দেশের নেতারা, চিন্তাশীলেরা এতদিন সেই কোড্ আঁকড়ে ধরেছিলেন। তোমরা আদর্শও সেই যুগের।

শঙ্কর কহিল, তোমরা ওসব হেঁয়ালি ছেড়ে দাও। সত্যিই, মা আমাকে কি ভাবছেন বল দেখি?

ভাবছেন ছেলে আমার খাঁটী পুরুষ মানুষ। যাক, তুমি কি জবাব দিলে তাঁকে?

আমি শুধু তাঁর দিকে চেয়েছিলাম।

Like an innocent goose (সরল একটি রাজহাঁসের মতন)—বলিয়া বিষ্ণু হাসিতে লাগিল।

বিশ্বনাথ বাটী ফিরিলে সরোজ কহিলেন, দুপুরে শম্ভু এসেছিল।

হুঁ—বলিয়া বিশ্বনাথ টিকা ধরাইতে বলিলেন।

স্বামী পথশ্রান্ত হইয়া ফিরিলে এবং চাকর সামনে না থাকিলে অন্য দিন সরোজ টিকা ধরাইয়া দেন। আজ ভুল হওয়ায় তাঁর নিজের লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

তিনি রাত্রে আবার কথাটা পাড়িলেন, তুমি হাল্যের ভিটে কংগ্রেসকে ছেড়ে দাও গিয়ে।

বিশ্বনাথ কোন উত্তর করিলেন না।

বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে সরোজ কখনও কিছু বলেন না। বলা নিষেধ। কিন্তু আজ স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন, ছেলে ঐ জন্য প্রাণ দিচ্ছে আর তুমি জিদ—

স্ত্রীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বিশ্বনাথ কহিলেন, হ্যাঁ জিদই বটে। বিশ্বনাথ রায় বেঁচে থাকতে কংগ্রেস ও ভিটে পাবে না।

স্বামীর রূঢ়তা সরোজের বুকে বড় বাজিল। তাঁর ভয়ও হইল, আজকাল মনে সামান্য ক্ষোভ হইলেই শুধু চোখ নয়, বিশ্বনাথের নাক, কান লাল হইয়া ওঠে। বোঝা যায় যে ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাইতেছেন। অথচ চিকিৎসার কথা বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

সরোজ আর কথা বলিলেন না। স্বামীকে খাওয়াইয়া খানিক পরে ছাদে যাইয়া বসিলেন। উদার উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসিয়া একে একে অনেক কথাই তাঁর মনে পড়িতে লাগিল।

এই বাড়ীতে যখন আসেন তখন বাপের বাড়ীর সবাই বলিয়াছিল, বরাত করে এসেছিলি বটে। রাণীডাঙ্গার রায় বাড়ীর বউ হয়ে চললি।

বয়স তখন তাঁর চৌদ্দ, সবে চৌদ্দয় পা দিয়াছেন কিন্তু তাঁকে দেখিতে বড় দেখাইত। রায় বাড়ীতে বধূ পরিচয়ের সময় এক মাসী শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, একী ঢেঙা বউ! বাপ মা বয়স ভাঁড়িয়েছে দেখছি।

শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হয় আর শাশুড়ী স্থানীয়ারা বলেন, বউর একী বরাত! দেখতেই শুধু ফরসা রং।

ঋণ শুরু হইয়াছিল বহুপূর্বে, বিশ্বনাথের জ্যাঠার আমলে। সেই ঋণের দায়ে রায়না ও সিহিপাশা বিক্রয় হইয়া গেল। দোষ হইল সরোজের দুর্ভাগ্যের।

এই সব টিপ্পনীত' ছিলই। এর উপর ছিল বিধিনিষেধের ঘেরা টোপ। ঘাটে যাইতে নাই, ডুলি কিংবা নৌকায় চড়িবার সময় চারদিক পর্দা দিয়া ঘিরিয়া লইতে হইবে। বধূরা ছাদে উঠিতে পারিবে না। ঘোটের উপর আলো বাতাস এড়াইয়া চলাই ছিল যেন আভিজাত্যের লক্ষণ।

রাত্রিতে ভিন্ন স্বামীর সঙ্গে তিনি কথা বলিতে পারিতেন না। কুটুম্বিনীরা আড়ি পাতে বলিয়া কথাও আলো নিবাইয়া বলিতে হইত। না হইলেই পাঁচজনে বলিত, কী বেহায়া বৌ!

সরোজের মনে হইত তিনি বন্দিনী। রায়বাড়ীর লুপ্ত ঐশ্বর্য ও ক্ষীয়মান গৌরব যেন তার সর্বাঙ্গে শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে।

এই সময় আসিল শঙ্কর। তার জন্ম সরোজের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। স্মরণীয় তার মুখের প্রথম 'মা' ডাক।

সেই শঙ্কর বড় হইল, পড়াশুনায় সবার সেরা। সরোজ এমনি মাটির মানুষ কিন্তু ছেলেকে লইয়া তাঁর মনে খানিকটা গর্ব ছিল আশা ছিল ছেলে হাকিম হইবে। জমিদারের ছেলে হাকিম। আগে যেমন সমাজের চূড়ায় ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনি চূড়ায়ই থাকিবে। হইবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

শঙ্কর স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করায় সেই কল্পনার সৌধ ভাঙিয়া পড়িল বটে. কিন্তু তার যশ ও সুখ্যাতিতে খানিকটা ক্ষতি পূরণ হইল। বড় রোজগেরে সে নয় কিন্তু লোকের মুখে মুখে তার কী প্রশংসা! ছোট বড় ইতর ভদ্র সবাই একবাক্যে বলে, সোনার টুকরা ছেলে।

ত্রিশ বৎসর একত্র ঘর করিয়াও স্বামীর মন পান নাই। এইজন্য বরাবরই সরোজের মনে দুঃখ ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ যে তাঁদের একমাত্র পুত্র অমন ছেলে শঙ্কর পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইল। শুধু তাহাই নয় আজকাল পিতাপুত্রে বেশ মন কষাকষি চলিতেছে। শঙ্করের কংগ্রেসে যোগদানের সময় হইতে ইহার সূত্রপাত।

সরোজ ভাবেন, স্বামী পুত্রের এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁর স্থান কোথায়? ভাবিয়া ভাবিয়া কোন কূল কিনারা করিতে পারেন না। মন হতাশায় ভরিয়া ওঠে।

পঁচিশ

পূজার কয়েকদিন পরের কথা। জাহাজ বোঝাই হইয়া বঙ্কিম কুণ্ডুর কল-কব্জা আসিল, নানা রকমের, বড় ছোট নানা আকারের। কোনটা দেখিতে নাড়িভুঁড়ির মতন, যেমন কুৎসিত গড়ন তেমনি ঔজ্জ্বল্যহীন, কোনটা বা সুন্দর, অর্জুন গাছের গুঁড়ির মতন সাদা, রৌদ্রে ঝলমল করে।

কলকব্জা ত' একেবারেই নূতন বস্তু, এ অঞ্চলের অনেকে স্টীমারও দেখে নাই। তাই সাঁরা সাগরদীঘি যেন নদীর দু'পারে কুরপালা কাকড়াঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বঙ্কিমও তার কারখানা কুরপালার বহু লোকের জমি গ্রাস করিল, অনেককে ভিটাছাড়া করিল, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনিল। কিন্তু কুরপালার লোকেও দল বাঁধিয়া আসিল, মেয়ে, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ সবাই। বিশেষতঃ যুবার দল। তারা নৌকা করিয়া স্টীমারের আশে-পাশে ঘোরে। বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে জাহাজের দিকে চাহিয়া থাকে। দু'একজন চালাক ছেলে এরই মধ্যে খালাসীদের সঙ্গে ভাব করিয়া জাহাজে উঠিয়াছে।

সৌদামিনী আসিয়াছে, পরনে ছেঁড়া কাপড়, মুখে উপবাস-ক্লিষ্টের কাতরতা। সে করুণ নয়নে লোকের মুখের দিকে তাকায় কিন্তু মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা চায় না। যাদের কর্তাব্যক্তি বলিয়া মনে করে ভিড় ঠেলিয়া তাদের কাছে যাইয়া দাঁড়ায়। বড় নাতি শ্রীমন্তকে দেখাইয়া বলে, অরে দিয়া মাল নামাবা? দেখতে ছোট হইলে কি হয়, গায়ে কিন্তু শক্তি আছে।

কারখানার দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া ড্যাম সেন পর্যন্ত বাদ যায় না কেহুই। বৃদ্ধা কত কাতর কণ্ঠেই না বলে, এট্টু মাল নামাইতে দেও। আমরা তা হইলে খাইয়া বাঁচি।

তাকে সর্বত্রই বিফল হইতে হয়। কেহ হাসে, কেহ ধমক দেয়, কেহ বা বড়জোর নিরুত্তর থাকে। দুঃখিনীর প্রার্থনার জবাবে ড্যামসেন তার মুখে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছড়াইয়া দেয়। সৌদামিনী কাসিতে আরম্ভ করে।

পাশেই ছিল ছোট নাতি ধীমন্ত, একেবারে তার কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পিতামহীর এই দুর্দশায় বালক কাঁদিয়া ফেলিল।

তার সেই চেহারা আর নাই; ভুগিয়া ভুগিয়া অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। আগের চেয়ে অনেক ছোট দেখায়। জাহাজ কিংবা কলকব্জার দিকে সে চায় না। সৌদামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া তার কাপড়ের খুঁট চোষে। চেষ্টা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার।

এক এক করিয়া মাল নামানো হয়। মাল নামাইতে দেখিয়া মধু বলে, আমরা ত' জানতাম হাতীতে মাল নামায়। এ আবার কী তাজ্জব?

যদু নাপিত বলিল, আংরেজের সুরুক্ষ্ম মাথার কারিকরি রে ভাই। কলকাতায় কত দেখলাম।

চিমনি দেখিয়া গোপালপুরের লেহাজুদ্দি বলিল, ওটা দিয়া কি করবে?

ধোঁয়া ছাড়বে হুস হুস কইরা—বলিয়া একজন খালাসী হুস হুস শব্দ আরম্ভ করে। তার থুতুর ভয়ে লেহাজুদ্দি সরিয়া যায়।

আকালী জিজ্ঞাসা করে, শোনলাম কুণ্ডুর পো বিজলি আনাবে। হাচা নাকি?

যদু নাপিত বলিল, বিজলি দিয়াই ত' কল চালাবে।

মধু বলে, সেদিন মীরাজ কইল রাস্তায় রাস্তায় বিজলিবাত্তি জলবে। আর কুণ্ডুর নতুন বাড়ীতে হবে বিজলির রোশনাই।

যদু কহিল, সে এক এলাহী কাণ্ড। বোতাম টেপো আর ধবধব।

তাতে আমাগো লাভ? ব্যাল পাকলে কাকের কি?—আক্ষেপ করে যোগেন কাহার।

যদু বলিল, কুণ্ডুর পো দিলে আমি একটা বালভো নেব। নাগিন নিতে কইছে। তার সিলিন খুব জোর চলছে কিনা, জোর চুল ছাঁটতেছে, আর দাড়ির ত' কথাই নাই। রোজ শ'য়ে শ'য়ে সাফ।

ইউসুফ মেহের বলিল, তোমার আর কথা কি? একবার সাক্ষী দিলেই বালভো মুফৎ মেলবে।

যদু নাপিত বলিল, পরিহাস্য কর কেন চাচা? কাছারিতে সগল কথাই মিছা কই নাই। হাচা ও কিঞ্চিৎ ছিল।

এতক্ষণ নসীরামকে কেহই লক্ষ্য করে নাই। সে একটা ডাইনামোর উপর বসিয়া গান জুড়িয়া দিল, বঙ্কিমের কেচ্ছা। আজকাল নসীরামের প্রধান কাজ বঙ্কিমের নামে ছড়া কাটা। সে যে ওজনে কম দিয়া খরিদদার ঠকাইত, কলিকাতার মারোয়াড়ী ফারম হইতে বাকীতে মাল কিনিয়া কয়েকবার নিজের কারবারের নাম পাল্টাইল, বঙ্কিমের বড় হওয়ার এইসব কাহিনীর ছড়া।

লোকে ডাকিয়া ডাকিয়া তার ছড়া শোনে, কেহ তামাক খাওয়ায়, কেহ দু'খানা বাতাসা দিয়া বলে, খাসা গান বাঁধছ। একটু নাচিয়া গাও দেখি।

নসীরাম নাচিয়া নাচিয়া গায়,—

ও ভাই বঙ্কুমুদীর গুণের সীমা নাই।

হাস্য আসে নাই। জুড়ানিকে পদ্মের সঙ্গে পাঠাইয়াছে। অজুও জুড়ানিকে লইয়া পদ্ম আসিয়াছে। জুড়ানি ইশারায় প্রশ্ন করে। আকার ইঙ্গিতে জবাব দিতে দিতে পদ্ম ক্লান্ত হইয়া ওঠে।

অজু প্রথম দু'একটা জিনিস ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, এটা দিয়া করবে কিরে?

পদ্ম বলে, আমি জানব কি করিয়া?

হায়রে চক্ষু রত্ন হারাইয়া সবই হারাইছি। আয়, তার থা দুইজনে মিলিয়া গান গাই। তবু দুইটা পয়সা রোজগার হবে।

পদ্ম আজ ভিক্ষা করিতে রাজী নয়। সে বলে, থাউক না একটা দিন।

অজু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলে, হাঁড়িতে একদিনের চাউল থাকলে আর ভিক্ষা করতে চাস না। অলক্ষ্মী তোর মনে বাসা বাঁধছে।

বঙ্কিমের কারখানার হিন্দুস্থানী দারোয়ান খইনি টিপিতেছিল। মেয়েদের দেখিয়া তার দেশের কথা মনে পড়িল। সে গান ধরিল,

লছমন্ কা বহিনিয়া
মহাদেওকা লেড়কি
মেরা কেলিজা উ লে লিয়া
দেখাতা ভেলকি
জান মেরা লে লিয়া
বহুৎ খুব প্রেম সে এ—এ
মহাদেওকা লেড়কি।

আনন্দে লোকটা মাথা ঘুরায় আর গায়, জান মেরা লে লিয়া—

গ্রামে বিশালকায় এই সকল যন্ত্রপাতির আবির্ভাবে এক এক জনের মনে এক এক রূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সৌদামিনী কিশোর পৌত্রকে দিয়া

মাল নামাইয়া কোন রকমে নাতি দুইটির একবেলার অন্ন সংস্থান করিতে চায়। যদু নাপিত ঘরে বিজলি বাতি জ্বালিবার স্বপ্ন দেখে, দারোয়ান হীরালাল তেওয়ারী স্মরণ করে তার বিরহিণী প্রিয়াকে।

আর বৃদ্ধ ইন্দুপ্রকাশ ভাবেন, কুরপালার চাষী মজুরের কথা। এতদিন তবু চাষীদের দু'এক বিঘা করিয়া জমি ছিল। মজুরের ছিল নিজ নিজ যন্ত্র ও হাতিয়ার কিন্তু এবার তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব বনিয়া গেল, বড় বড় শহরের কুলী মজুরের মতন গৃহহারা, সর্বহারা।

বিষ্ণু বলিল, এই থেকে দেশে আরম্ভ হবে সত্যকার শ্রেণী সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসবে মুক্তি। আমার বিশ্বাস ভারতের মুক্তি এই পথে—বলিয়া সে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া দিল। মনে হইল এই তরুণ যেন চোখের সামনে সেই পথকে দিনের আলোর মতন পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছে।

ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, হয়ত তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে। কিন্তু একথা ত' ভুলতে পারিনে ভাই যে সেদিনও কুরপালায় চাষীর উপর হাল ছিল, পঞ্চাশখানা তাঁত, ঘরে ঘরে গাই বলদ। চাষীদের কারও ধান কিনতে হত না। আর আজ—বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া পেসেন্স খেলিতে-ছিলেন। আজ কয়েকদিন তাঁর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই মাথা ধরে, ঘুম হয় না; এতদিন বুক ধড়ফড়ানি ছিল না, এখন তাহাও শুরু হইয়াছে।

এই সময় বামাচরণ আসিয়া উপস্থিত। সে কুরপালার চাষী, কিছুদিন হইতে বিশ্বনাথের গোমস্তাগিরি করে। সে বলিল, আজ কিছুই আদায়

তাসের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই বিশ্বনাথ কহিলেন, কেন গোপালপুরের লেহাজুদ্দি, দেরাজতুল্লা আজই দেবে বলেছিল। ওদের কথার ত' নড়চড় হয় না।

বামাচরণ বলিল, বঙ্কিমবাবুর কল আইছে কিনা তাই কোন বাড়ীতেই আর পুরুষ মানুষ নাই। পুরুষরা তামাম কল দেখতে গাংপারে গেছে।

কল এসেছে জানি, বঙ্কিম বলে গেছে। তার জন্য নদীর ধারে খুব ভিড় হয়েছে বুঝি?

ভিড়! সে আর কইতে? বুড়াগুড়া কেউ আর বাকী নাই। বুড়া মেনাজুদ্দি সাইব পর্যন্ত গেছে। একটা বিপদও ঘটিয়া গেছে।

বিপদ! বিশ্বনাথ তাস সাজাইতে সাজাইতেই বলিলেন।

আজ্ঞা, শুদ্দুরপাড়ার সৌদামিনী নাতি দুইটিরে লইয়া নদীর পার গেছিল।

সৌদামিনীর নাম শুনিয়া বিশ্বনাথ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বামাচরণ বলিল, সৌদি কারখানার যারে দেখে তারেই কয়, আমার নাতিরে দিয়া মাল নামাবা? তা হইলে আমরা দুইটা খাইয়া বাঁচি।

বিশ্বনাথ বলিলেন, তারপর?

একে ত' কয়দিন খায় নাই, তার উপর চড়া রদ্দুর। ছোট নাতিটা দুপারবেলা একেবারে ভিরমি দিয়া পড়ল, আপনারা যারে কও মুরুচ্ছা।

কার কথা বলছ? সৌদির নাতি, হিমুর ছেলে?

হ, হুজুর। পোনণাম বাঁচা কষ্ট।

এ্যা—বার দুই গোঁ গোঁ করিয়াই বিশ্বনাথ এলাইয়া পড়িলেন।

সরোজিনী লক্ষ্মীর আসন সাজাইয়া ধুনা দিতেছিলেন। শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। মুহূর্তের জন্য তাঁর মাথা ঘুরিয়া গেল কিন্তু

পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বামাচরণকে কহিলেন, ছুটে রঞ্জিত ডাক্তারের কাছে যাও, আসার সময় শঙ্কুকে নিয়ে আসবে।

রঞ্জিত ডাক্তার ও শঙ্কর প্রায় এক সঙ্গেই আসে। তারা আসিয়া দেখে সরোজ স্বামীর মাথায় ধীরে ধীরে জলের ধারা দিতেছেন। বসন্ত বাতাস করিতেছে। ঘরে প্রতিবেশিনীদের খুব ভিড়।

রঞ্জিত প্রথমেই বলে, ঘরে ভিড় করবেন না। রোগীর সবচেয়ে বেশী দরকার খোলা হাওয়ার। তারপর যন্ত্র দিয়া বিশ্বনাথের রক্তের চাপ পরীক্ষা করিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ওঠে, মাই গড্।

রোগীর শিরা কাটিয়া প্রায় পঁচিশ সি, সি রক্ত ফেলিয়া দেওয়া হয়। কাচের নলে একসঙ্গে অতখানি রক্ত দেখিয়া সরোজ ভয় পাইয়া যান। ডাক্তারকে প্রশ্ন করেন, কেমন দেখলে বাবা? ভাল হবে ত'?

রঞ্জিত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করে, হুঁ।

সমস্ত রাত একইভাবে কাটে, আশঙ্কা ও উত্তেজনার মধ্যে। সরোজ রোগীর মাথার কাছে বসিয়া পাখা করিতে থাকেন। এক একবার তাঁর চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া ওঠে, অমনি নিজেকে সংযত করেন। শিরার মধ্য দিয়া চোখের বাষ্প যেন ফিরাইয়া নেন। এখন এই অবস্থায় তাঁকে যে কাঁদিতে নাই। কাঁদিলে স্বামীর অমঙ্গল।

পরের দিনও বিশ্বনাথের অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। রঞ্জিত আবার রক্ত মোক্ষণ করে। সরোজ বলেন, আর কেন বাবা? না, না আর রক্ত নিও না।

রঞ্জিত বলে, এই-ই এক চিকিৎসা রাণীমা।

রামেন্দ্রের অসুস্থতার সময় এই অঞ্চলের লোকের মনে রায়েদের অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার দেখা গেল বিশ্বনাথের এই অসুখের সময়। এবার জিনিসটা আরও বেশী আন্তরিক।

সকলেরই মুখে একটা উদ্বেগের ভাব। বিশেষতঃ চাষীদের। তারা বিশ্বনাথকে নিজেদের হিতৈষী বলিয়া জানে। আপদে বিপদে তাঁর কাছেই ছুটিয়া যায়।

ভজহরি বলিল, মানুষত' স্থাশে ঐ একটা। মরলে সব আঁধার হইয়া যাবে।

আলিমেহের বলিল, ঠিকই কইছ। আগে দেখছি দেবেন রাজারে। এখন দেখি ওনারে। কী তেজ যেন মানের ফানুস।

ধীরেন ইহা সহ্য করিতে পারে না। বড় তরফ থাকিতে ছোট তরফের এত প্রশংসা, এ যেন বড় বাড়াবাড়ি।

পরের দিন রোগীর অবস্থা একটু ভাল দেখা যায়। বাহিরেও সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার, নির্মল, নীল। কিছু আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দীঘির ওপারে তালগাছের ভিজা পাতার উপর রৌদ্র ঝলমল করে; পাতাগুলিকে টিনের পাতের মতন দেখায়। নবরত্নের নয়টি চূড়াই যেন সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

রোগীর মুখও একটু উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ। তাঁর ঠোঁট নড়িতে দেখিয়া সরোজ ভাবিলেন, তিনি কিছু বলিতে চান। স্বামী সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইবেন এই আশায় মহিলার বুক আনন্দে ধুকধুক করিতে থাকে।

সরোজ শিয়রে বসিয়া, একটু দূরে জাহ্নবী পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ফলের রস ছাঁকিতেছেন।

বিশ্বনাথের চোখ বোজা, ভিতরে জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। বিড়বিড় করিয়া তিনি কি যেন বলেন। তার মধ্যে দু'তিনটি কথা শুধু শোনা যায়। কথাগুলি সুস্পষ্ট নয়, জড়ানো। কিন্তু শঙ্করের বুঝিতে কষ্ট হয় না—

সৌদামিনীকে—নাতিকে, জমি টাকা। বড় দেনা আমার—

সরোজ পুত্রকে প্রশ্ন করেন, কি বললেন উনি?

শঙ্কর কোন জবাব দেয় না। তার মনে পড়ে যদু নাপিতের স্ত্রী তিনকড়ির মন্তব্য—ছোট রাজার ছাওয়াল এই গাঁয়ে এত ঘন ঘন আইসে কেন? বাপের মতন কোন মতলব আছে বুঝি?

পরের দিন অবস্থা আবার খারাপ হইয়া পড়িলে রোগীকে বাহিরে আনা হয়।

শিয়রে তুলসীমঞ্চ, মাটির বেদীতে বেল তুলসী অশ্বত্থ আমলকী ও বটের শাখা—পঞ্চবটি, নূতন শয্যা। রোগীকে সেই শয্যায় শোয়ানো হয়। হিরণ সেন মৃত্তিকা দিয়া বিশ্বনাথের বাহুতে বক্ষে ও ললাটে রামনাম অঙ্কিত করেন। নামাবলী দিয়া তাঁর গা ঢাকিয়া দেন। নিশি ঠাকুর হরিনাম শোনান।

বিশ্বনাথের অবস্থা শুনিয়া আশেপাশের সব গ্রামের লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদু নাপিত আদম আলিমেহের প্রভৃতি একধারে প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর বসিয়া।

বহুদিন পরে, মোল্লার ভিটার দুর্ঘটনার পরে রামেন্দ্র আজ প্রথম বাটীর বাহির হইয়াছেন। তিনি এক ধারে বসিয়া, পাশে ইন্দুপ্রকাশ। আর একদিকে শীতল। তিনি রামনাথকে কহিলেন, আমার প্রলেপটা দিলে হয়ত ভাল হত। বড় রাজার বেলায় হয়েছিল।

রামনাথ বলিলেন, শঙ্করটা ম্লেচ্ছ বনে গেছে। শাস্ত্রীয় ওষুধে ওর বিশ্বাস আসবে কোত্থেকে?

রামনাথের এই টিপ্পনী শীতলের কানে কেমন যেন বাজিল। তিনি ঘুরিয়া বসিলেন :

সরোজ পলিতা ভিজাইয়া স্বামীর মুখে গঙ্গাজল দেন। শঙ্কর গীতা পাঠ করে, একাদশ অধ্যায়। গম্ভীর উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করে,

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্যং

অনন্ত বাহুং শশী সূর্য নেত্রং……

উঠানের প্রান্তে জরির পাড়ের মতন সূর্য রশ্মির সরু রেখা। সরোজের মনে হয় এই আলোর ফালির সঙ্গে তাঁর স্বামীর আয়ুর কি যেন এক সম্পর্ক আছে। তিনি এক একবার আলোর দিকে চান, আবার তাকান স্বামীর মুখের দিকে। দেখেন তাঁর ললাটে ছোট ছোট কয়েকটি ঘর্মবিন্দু, হেমন্ত সন্ধ্যায় কাশগুচ্ছের উপর শিশিরবিন্দুর মতন।

হেমন্ত গোধূলি। একটু ঠাণ্ডা পড়িতেছিল। সরোজ একখানি শাল আনিয়া স্বামীর বুক হইতে পা পর্যন্ত সযত্নে ঢাকিয়া দিলেন। শালখানি দামী, পুরাতন। নবাব আসানউল্লার নিমন্ত্রণে ঢাকায় যাইবার সময় বিশ্বনাথের পিতা ঐখানি শখ করিয়া কিনিয়াছিলেন।

ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের জীবন-দীপ নিবিয়া যায়। লেহাজুদ্দি চীৎকার করিয়া ওঠে, রাণীডাঙ্গার সূর্য আজ ডোবল রে।

হাজারো কণ্ঠে হরিধ্বনি আরম্ভ হয়। মুসলমানরা বলেন, আল্লাহো আকবর। শঙ্কর তখনও একমনে গীতা পাঠ করিতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজের রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থার সময় স্যার জন শোরের কানুনগোগিরি করিয়া রায় পরিবারের যে সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থদশকের এক অপরাহ্নে বিশ্বনাথের সঙ্গে সঙ্গে সেই রবি অস্তমিত হইল।

বৈভব পূর্বেই গিয়াছিল কিন্তু ছিল একটা মানুষ আর তাকে কেন্দ্র করিয়া ছিল মর্যাদা, বিপুলকায়া স্রোতস্বতীর ক্ষীণ রেখার মতন অতীত গৌরবের স্মৃতি। আজ সেই স্রোতোধারা বালুর মধ্যে মিশিয়া গেল।

দেশ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শঙ্কর পিতার মৃত্যুর দশাহে শ্মশান-বন্ধুদের দইচিঁড়া খাওয়াইল। খাইল আট দশটা গ্রামের লোক, ইতর ভদ্র সবাই। লোকে ভাবিল শ্রাদ্ধেও অনুরূপ ঘটা হইবে। কিন্তু শঙ্কর শুধু তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ করিল। মাকে দিয়া করাইল একটা ষোড়শ। বারটি ব্রাহ্মণ খাইলেন। কয়েকটি মাত্র জ্ঞাতি।

ছেলের হিসাবী বুদ্ধি দেখিয়া সরোজ বড় খুশি হইলেন। ভাবিলেন, বিষয়সম্পত্তি এখন শেষ সীমায় পৌছিয়াছে বটে তবে যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাঁর শঙ্কর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে।

ছাব্বিশ

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পূর্বদিন সৌদামিনীর কনিষ্ঠ পৌত্র ধীমন্তের মৃত্যু হয়, অনাহারে মৃত্যু। পটল ও রহম চৌকিদার সেইরূপই রিপোর্ট করে। থানা অফিসার তাদের ধমক দেন, জানিস ইংরেজ রাজত্বে কেউ না খেয়ে মরে না। মরার হুকুম নেই।

তিনি রিপোর্ট সংশোধন করিয়া লেখেন সর্দিগরমি।

পিতার মৃত্যুর পর শঙ্কর সৌদামিনীদের ভার গ্রহণ করে। শ্রাদ্ধের পর মায়ের অংশ বাদ দিয়া নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি শ্রীমন্ত ও সৌদামিনীকে লিখিয়া দেয়।

সারা গ্রামের লোকে প্রশ্ন করে, একি করলে শঙ্কর? কেহ বলে, ছেলেটা পাগল। একমাত্র বিষ্ণু বলে, চিয়ারিও শঙ্কর।

শঙ্কর এবার ইন্দুপ্রকাশের কাছে ছুটি চায়, কিছুদিনের জন্য আমায় বিদেয় দিন দাদু, আমি একটু ঘুরে আসি।

ইন্দুপ্রকাশ জানিতেন শঙ্করের বিশ্রামের কতখানি প্রয়োজন। তিনি বলিলেন, তা বেশ। তোমার মাও সঙ্গে যাবেন বুঝি ?

শঙ্কর বলিল, না, তাঁকে বলেছিলাম কাশীতে আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে থাকতে। তিনি রাজী হলেন না।

স্বামীর ভিটে ছাড়তে চাননা বুঝি ?

হ্যাঁ, তাই। মা বলেন, এই ভিটেই আমার কাশী। একটা বছর আমি কোথাও যাব না ; অন্ততঃ সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত। তারপর যা হয় কর।

শঙ্কর যেদিন রওনা হয় সেদিন থালধারে ইন্দুপ্রকাশ নিধিরাজ রাসেত্তুল প্রভৃতি কংগ্রেস কর্মীরা উপস্থিত। নারায়ণও আসিয়াছে। আসে নাই শুধু বিষ্ণু। এতটা আসিতে তার কষ্ট হয়। বিদায়ের মুহূর্তে শঙ্কর ইন্দুপ্রকাশকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বিষ্ণুর কথা ভুলো না। যাদবপুরে চেষ্টা করে দেখো। শুনেছি ওখানকার কর্তৃপক্ষ স্বদেশীওয়ালাদের একটু অনুগ্রহ করেন।

শঙ্কর কহিল, দেখব নিশ্চয়। তবে আমি বড় ভেঙ্গে পড়েছি। হয়ত দু'একদিন দেরি হবে।

জীবনের শেষ মুহূর্তে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিশ্বনাথ নিজের জীবনের যে রহস্য প্রকাশ করেন শঙ্কর তাহাতে খুবই আঘাত পাইয়াছিল। এই সম্পর্কে ইন্দুপ্রকাশের সঙ্গে তাঁর কোন কথা হয় নাই বটে কিন্তু তিনি সবই বুঝিতেন। তাঁর হৃদয় শঙ্করের, প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। আনন্দ ও হইল—তার শঙ্কর কত বড়, কত মহান্ ইহা দেখিয়া।

কৰি মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিলে শঙ্করের চোখ দু'টা যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তার দেখা মিলিল না।

এরই আধঘণ্টা আগে হাস্যের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া শঙ্কর বলে, আমি চললাম। বুড়ো দাদুকে তুমি দেখো। কংগ্রেসের কাজ, দেশের কাজ ভাল করে ক'র।

হাস্থ সংক্ষেপে জবাব দিল, হ, করব।

শঙ্কর লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত হাস্তের শরীর একটু একটু কাঁপিতেছে। শঙ্কর চলিয়া গেলে সে একটা চরকা লইয়া বসিল। চরকা ঘুরায় আর আপন মনে বলে, এ ছাড়া কি তোমার আর কোন কথা নাই—খালি স্থাশ আর স্থাশের কাজ।

দক্ষিণের বাতাসে রূপমতীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ ওঠে। শঙ্করের নৌকার নীচে ছলছল শব্দ হয়। ছইয়ের নীচে, পিছনের গলুইয়ের ধারে বসিয়া শঙ্কর বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে। কপালে আসিয়া লাগে জোলো হাওয়া, শরীর ও মন ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

দুধারে মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, নদীর বাঁকটা বহুদূর পর্যন্ত সোজা যাইয়া বাঁয়ে বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁকের মাথায় ডানদিকে ছোট্ট একটি মসজিদ, ভারী সুন্দর। নূতন খড় দিয়া চালা ছাওয়া হইয়াছে, সামনে একটুখানি বাগিচা, পাতাবাহার, জুঁই টগর বেল মালতীর গাছ।

তিনটি ভক্ত বাগিচার সামনে মাদুর পাতিয়া একাগ্রমনে নমাজ পড়িতেছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে দাঁড়ান, উবু হাঁটু হন, ছয়খানি হাত একত্র বাড়াইয়া দেন। দেখিতে লাগে বেশ। বিপরীত দিক হইতে লাল, নীল, সবুজ নানা রংয়ের পালের নৌকা আসে। নৌকাগুলি কুরপালা, কাকডাঙ্গার দিকে যায়; যায় রাণীডাঙার দিকে।

জেলেরা নৌকা করিয়া মাছ ধরে, গরুর পাল সাঁতার কাটিয়া নদী পার হয়। শুশুক জল হইতে একবার ভাসিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হুসহুস শব্দে আবার গড়াইয়া পড়ে।

এ যেন সিনেমার ছবি, পটের পর পটপরিবর্তন। রিলের পর রিল আসে, রিল চালায় এক অদৃশ্য হস্ত। অদূরে নমাজরত ইসলামের ভক্তেরা সেই অদৃশ্য শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শঙ্কর ইন্দুপ্রকাশের কাছে ছুটি চাহিয়াছিল, ছুটি মানে মুক্তি, পারিপার্শ্বিক হইতে কিছুদিনের জন্য দূরে সরিয়া থাকা। রাণীডাঙ্গা, কুরপালা হইতে সামান্য দূরে আসিয়াই আকাশে বাতাসে আজ সেই মুক্তির আস্বাদ পাইল।

নৌকাখানা গ্রাম হইতে যতদূরে যায় ততই তার ভাল লাগে। এই আনন্দের মধ্যে এক একবার জননীকে মনে পড়ে, চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে তাঁর শান্ত মূর্তি, স্নিগ্ধ চাহনি, যে চাহনি দূরে থাকিয়াও শুধু আশীর্বাদ বিলায়, মঙ্গলই বিকিরণ করে।

শিশুমনের গঠনের জন্য জননীর নিকট হইতে শিক্ষার যে প্রয়োজন শঙ্করের ভাগ্যে তাহা জোটে নাই। সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সরোজ দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। শঙ্কর শৈশবে মাতামহীর নিকট মানুষ হয়। তাই তার মনের উপর মায়ের প্রভাব ছিল কিছুটা ম্লান, আয়নার উপর নিঃশ্বাসের বাষ্প পড়িলে প্রতিকৃতির ছাপ যেরূপ অস্পষ্ট হয় খানিকটা সেইরূপ।

তার মনে হয় জননীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকার এই যে দুর্ভাগ্য এর জন্য শুধু ঘটনাপরম্পরাই দায়ী নয়, তার পিতার ব্যক্তিত্বও দায়ী, আর খানিকটা দায়ী সে নিজে।

সৌদামিনীর ব্যাপারটা সে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু মায়ের প্রতি তাদের এই অবিচারকে ভুলিতে পারে নাই।

ষ্টীমার স্টেশনে শঙ্করকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। মাঠিভাঙ্গার বাঁকে জাহাজের ধোঁয়া দেখিয়া স্টেশন মাষ্টার টিকিট দিতে আরম্ভ করিলেন। শঙ্কর টিকিট কিনিবার জন্য মনিব্যাগ খুলিলে প্রথমেই বাহির হইল শুকনা একটি জবার কুঁড়ি, তার পিতার স্মৃতি। বিশ্বনাথ বাঁচিয়া থাকিতে সরোজ এই ফুলটি কাগজে মুড়িয়া শঙ্করের হাতে দিয়া বলেন, উনি তোকে দিতে বলেছেন।

শঙ্কর বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে, বাবা বলেছেন? তাহ'লে ক্ষমা করেছেন তিনি আমায়?

সরোজ উত্তর করেন, আমি ত' আগেই বলেছি। ও রাগ কি থাকতে পারে?

তখন বিশ্বনাথ বাড়ী ছিলেন না। দুঃখের বিষয় তাঁর সজ্ঞান অবস্থায় শঙ্করের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

আজ রওনা হইবার কিছু আগে সরোজ দুইটি তুলসীপাতা দেন, এই তুলসী জবা একত্র করিয়া মাথায় ছোঁয়াইয়া সে আবার ব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দেয়।

স্টীমার ছাড়িয়া দেওয়ার পর বহুক্ষণ সে পিছনের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রথমে অদৃশ্য হয় রূপমতীর মোহানা। তারপর সাগরদীঘি থানার শেষ সীমা ডুমুরিয়ার গাছের সারি, মণ্ডলবাড়ীর চিলাকোঠা ও স্টীমার স্টেশন একে একে চোখের উপর হইতে সরিয়া যায়, মিশিয়া যায় আকাশের অনন্ত নীলিমার মধ্যে।

খানিকটা পরে খদ্দরের চাদরখানিকে ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া

শঙ্কর ডেকের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। জলের বুক চিরিয়া স্টীমার ছুটিতে থাকে, দুধারের জল ফেনায়িত হইয়া ওঠে।

নদীর উপর রৌদ্রের ঝিলিমিলি বড়ই ভাল লাগে আর লাগে গ্রাম্য-পথের উপর আলোছায়ার আলপনা। গোধূলির ম্লান আলো প্রতিটি পল্লী, তার প্রত্যেকটি কুটীরকে রহস্যময় করিয়া তোলে। ঐ পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে শঙ্করের নিজের অনুভূতিকে মিলাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়।

পশ্চিম গগনের দিকে চাহিয়া মনে পড়ে দেবাদিদেব মহাদেবের কথা। চারিদিকে উজ্জ্বল মেঘের জটাজুট, বিচিত্র তার বর্ণচ্ছটা, মাঝখানে অগ্নিবর্ণ গোলক মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের মতন জলজ্বল করে।

ঘোর সন্ধ্যা। দু'একখানা নৌকায় সবেমাত্র কুপি ধরানো হইয়াছে। আর জ্বলিয়াছে স্টীমারের বালব। হেড্‌লাইট তখনও জ্বলে নাই।

. নদী সেখানে ছোট, এত ছোট যেন দুই পার হাত দিয়া ধরা যায়। একটা বাঁকের মুখে জাহাজখানা আসিয়া একটা হাটের নীচে পড়িল। উপরে পড়িল বলিলেও বোধহয় ভুল হয় না, কেননা, খানিকটা বেচাকেনা নদীর মধ্যেই চলিতেছিল। তখন ভাঙ্গা হাট। কেহ বেসাতি নৌকায় তুলিয়া নদীতে পাড়ি ধরিয়াছে। কেহ বা মাল তুলিতেছে।

হঠাৎ জাহাজ দেখিয়া সবাই সামাল সামাল করিয়া ওঠে। কেহ জোরে বৈঠা বা দাঁড় টানে, কেহ বা জলে নামিয়া নৌকা সামলায়।

আর একদল বেসাতি মাথায় করিয়া নদী পার দিয়া হাঁটিয়া যায়। লুঙ্গি ও কাপড় পরা কালো কালো মানুষের সারি। তাদের দু'একজনের হাতে লণ্ঠন। সেই লণ্ঠনের ম্লান আলো মানুষের সারিগুলিকে যেন টানিয়া লম্বা করিয়া দিয়াছে।

জাহাজ হইতেই হাটুরেদের ডাক শোনা যায়, ও রহম-চাচা, ও নবী মেয়া, ও ভাই পরান—

শঙ্করের মনে পড়ে আজ রাণীডাঙ্গার হাটবার। আর একটু পরে নিধিরাজ কিংবা নরহরি হাট হইতে ফিরিবে। হয়ত এতক্ষণে ফিরিয়াছে।

হাস্তকে তারা বেসাতি বুঝাইয়া দেয়। সে সব মিলাইয়া তুলিয়া রাখে। কোনদিন হয়ত বলে, দাদামশাইর বিলাতী বেগুন আইসে নাই কেন? বিষ্টুদার ডিমই বা কোথায়?

নরহরি উত্তর করে, ডিম লইয়া রাসেদুল আসতেছে। বিলাতী-বেগুন হাটে আজ ওঠে নাই।

তা' হইলে দাদুর জন্য ফাপুয়া আনলেই পারতা।

ফাপুয়ার দাম বড় চড়া।

দাদু আলু খায় না, কপি খায় না। নিরামিষ খাইয়া থাকে। ওনার জন্য নয় একটু চড়া দামেই কেনতা।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, পটল ত' এনেছে। ওতেই আমার হবে'খন।

হাস্ত বলে, শুধু পটল খাইয়া থাকবা কেমনে দাদু?

সে আজকাল একটা পাকা গিন্নী। যাতে কোন ত্রুটি না হয় বিশেষ করিয়া রোগীদের ও ইন্দুপ্রকাশের অসুবিধা না হয় সেইদিকে তার দৃষ্টি খুব সজাগ।

বেসাতি তুলিয়া, হিসাব লিখিয়া হাটবাজারের ফিরতি টাকাপয়সা সেই ইন্দুপ্রকাশকে বুঝাইয়া দেয়। হিসাব এক একদিন মেলে না, দুষ্টু ঘোড়ার মতন বিগড়াইয়া বসে। হাস্ত তখন বিষ্ণুর কাছে যায়, রাসেদুলকে যাইয়া ধরে, অঙ্কডা মেলতেছে না। দেখবা একবার?

কিন্তু ভুলেও শঙ্করের কাছে যায় না।

কংগ্রেসের এই প্রতিষ্ঠান একটি সংসার, তার কর্ত্রী হাস্তু। কর্ত্রীরই যোগ্য বটে, লক্ষ্য সব দিকে সকলের উপর। হাটে ডিম না উঠিলে কুরপালার গৃহস্থ বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া বিষ্ণুর জন্ম সে ডিম আনায়।

রঞ্জিত ডাক্তার বলিয়াছে, ইন্দুপ্রকাশের টম্যাটো খাওয়া দরকার। সেই হইতে আশেপাশের পাঁচটা গ্রামের মধ্যে কার বাড়ীতে ভাল টম্যাটো পাওয়া যায় হাস্তু সে খবর রাখে। নিজেও টম্যাটোর গাছ পুঁতিয়াছে।

কিন্তু শত হইলেও সে জেলের মেয়ে। গুণের চেয়ে জন্মের মর্যাদা যাদের চোখে বড় সেই সমাজপতির দল দু'একবার ইন্দুপ্রকাশকে বলিয়াছেন, একি করছেন আপনি? জেলের মেয়ের হাতে জল খাচ্ছেন?

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, হাস্তুর রূপের কথা নয় ছেড়েই দিলুম। স্বভাব এবং পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়েও দিদি আমার অনেক বামুন কায়েতের মেয়ের চেয়ে শুচি, শুভ্র।

সমাজপতিরা বলেন, কিন্তু পরকালও ত' আছে।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, মানুষের ছোঁয়া জলে যে পরকাল আটকায় সে পরকাল দিয়ে আমার অন্ততঃ দরকার নেই।

নারায়ণ হাস্তুর ভিটায় অথম হওয়ার পরে মথুরবাবু ও উপীনকালী আবার গোলমাল তোলেন। কিন্তু মথুরের পুত্র যতীন এবং উপীনের রোজগেরে ভ্রাতুষ্পুত্র রঞ্জিত ডাক্তার হাস্তুর ছোঁয়া খাইত বলিয়া আন্দোলনটা আর বেশী দূর গড়ায় নাই।

মথুর বলেন, ছেলেমানুষদের আর বলব কি? এর জন্ম দায়ী ত' বুড়ো গাঙ্গুলী।

ট্রেণ শেষ রাত্রে শিয়ালদহে প্লাটফরমে ঢুকিবামাত্রই কালো কোর্তা পরা কুলীর দল গাড়ীর সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করে। কেহ বা গাড়ীতে ঢুকিয়াই যাত্রীর মাল ধরে। সেই মালে অপর কোন কুলী হাত দিতে পারে না।

স্টেশনে সাড়া পড়িয়া যায়। ট্যাক্সির হর্ণ, রিক্সার ঠুন্‌ঠুন, অশ্বের হ্রেষা, জীবনের স্পন্দন সর্বত্র। এই সব ছাপাইয়া ওঠে—মানুষের কলরব।

পৌষের কনকনে শীতে গায়ে কম্বল বা লেপ জড়াইয়া যারা গাড়ীর মধ্যে কাঁপিতেছিল প্লাটফরমে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও জড়তা কাটিয়া গেল।

একটি কুলী শঙ্করের স্যুটকেশ ও বিছানা ধরিলে সে বলিল, দরকার নেই।

কুলীটি হিন্দীতে প্রশ্ন করিল, আপনি নিজে মাল নেবেন?

শঙ্করের মতন সুশ্রী ও সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক নিজ হাতে মাল নামায় না। তাই কুলীটির প্রশ্নে ছিল প্রচুর বিস্ময়।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ আমি গরিব আদমি।

একহাতে স্যুটকেশ অপর হাতে বিছানা লইয়া শঙ্কর প্লাটফরমে নামিল। বাহিরে আসিলে তাকে ঘিরিয়া ধরিল দালালের দল।

কোথায় যাবেন বাবু? ফিটিন না টেক্সি?

রিক্সায় যাবেন? ঘোড়া সে ভি জোর চলে।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

মালপত্র হাতে করিয়া শঙ্কর যখন স্টেশনের বাহিরে আসিল তখনও রাজপথের আলো নিভে নাই, তবে আলোগুলি কিছু ম্লান। কাচের গা দিয়া শিশির গড়াইয়া পড়ে, সোডা মিশানো মদের

গেলাস নিঃশেষিত হওয়ার পরে তার গায়ে যেমন বুদ্‌বুদ্‌ লাগিয়া থাকে দেখিতে ঠিক সেইরূপ।

রাস্তা ভিজা, একটু আগেই জল দেওয়া হইয়াছে। শহরের ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই। কিন্তু এরই মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে। বড় বড় শহরে পুর্ণ বিশ্রাম বলিয়া কিছু নাই, থাকা হয়ত সম্ভবও নয়।

দেশ হইতে রওনা হওয়ার সময় শঙ্কর কিছুই স্থির করিয়া বাহির হয় নাই। একটুক্ষণ শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া ভাবে, কোথায় যাইয়া উঠিবে। কার বাড়ীতে? তারপর একটি কুলীর মাথায় মাল চাপাইয়া সারকুলার রোড দিয়া উত্তর দিকে হাঁটিতে থাকে। ওঠে আসিয়া বাদুড়বাগানে এক বন্ধুর বাড়ীতে।

দুইজনে তারা একসঙ্গে পড়িত। বন্ধুটি তারপর বিলাত হইতে ইংরেজী সাহিত্যে ডক্টর উপাধি লইয়া ফিরিয়াছে। নাম সুধীন।

সে মুখ ধুইতেছিল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া দরজা খুলিয়াই দেখিল সামনে শঙ্কর। তাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এস, ভাই এস এ কী! মাথা কামানো যে!

বাবা মারা গেছেন।

কি হয়েছিল?

রক্তের চাপ বেড়েছিল।

তুমি ত' একা?—বলিয়া সুধীন একটুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, প্রতিমা দেখে যাও, কে এসেছেন।

নিকট কোন আত্মীয়, সম্ভবতঃ জলপাইগুড়ি হইতে বাপের বাড়ীর কেহ আসিয়াছেন মনে করিয়া প্রতিমা সাগ্রহে ছুটিয়া আসিয়াই এই অপরিচিত যুবাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

সুধীন বলে, এ হল শঙ্কর। আমাদের শঙ্কর।

ওঃ আপনি—প্রতিমার কণ্ঠে গভীর আন্তরিকতার সুর। শুধু নিবিড় পরিচয়েই এই আন্তরিকতা সম্ভব। সে শঙ্করকে নমস্কার করিতেও ভুলিয়া যায়।

শঙ্কর বলে, আপনি আমার নাম জানতেন দেখছি।

প্রতিমা বলে, শুধু নাম? ওঁর মুখে আপনার কথা লেগেই আছে। পরীক্ষায় আপনার রেকর্ড নম্বর থেকে শুরু করে চাকরি ছাড়া, সরকার সেলাম না করার লাঞ্ছনা, জানি সবই।

বন্ধুপত্নীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া শঙ্কর কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

পিতার অসুখের সময় হইতে সে রীতিমতভাবে দেশের খবর রাখিতে পারে নাই। কাগজ পড়ার সময় ছিল না, আগ্রহও ছিল না। তবে বিষ্ণু ও ইন্দুপ্রকাশের মারফৎ মোটামোটা খবরগুলি কানে আসিত।

পরাধীন জাতির প্রতি শাসকের সদিচ্ছার উপর কোনদিনই তার আস্থা ছিল না। আই, সি, এস তন্ত্র ও পুলিস গান্ধী-আরউইন চুক্তির মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করিয়াছে সে তাহা ভালই জানিত। সামান্য কুরপালা কংগ্রেসের বস্ত্র কর্মীর গায়ে আজও তার ছাপ আছে।

কলিকাতায় আসিয়া শঙ্কর দেখিল দেশের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ। ইংরেজ পরম সমাদর করিয়া গান্ধীজীকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে লইয়া গেল বটে কিন্তু ভারতবর্ষে তার শাসন ব্যবস্থা আগেরই মতন চলিতে লাগিল। অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি করিল, হিন্দু-মুসলমানের এবং বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্যের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিল।

শঙ্কর ছিল পরম উৎসাহী পুরুষ, ভয় ভাবনার ধার ধারিত না।

পিতৃশোক ও নানাবিধ অশান্তির উপর দেশের এই দুরবস্থায় মানুষটা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সুধীন প্রথম হইতেই উহা লক্ষ্য করে। সে একদিন শঙ্করকে বলে, তোমার কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকা দরকার, অন্ততঃ কিছুদিন।

শঙ্কর উত্তর করিল, টাকা আসবে কোত্থেকে ভাই?

সুধীন বলিল, কেন? সে জানিত শঙ্করের অবস্থা ভাল, তারা জমিদার। সে কুলীর মাথায় মাল চাপাইয়া স্টেশন হইতে হাঁটিয়া আসায় সুধীন কিছুটা বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করে নাই। আজ বলিল, এর মধ্যে এমন কি হল?

শঙ্কর বলিল, তোমরা জানতে আমি জমিদার। কথাটা কিছু পরিমাণে সত্য বটে কিন্তু আমাদের অবস্থা ছিল শুকনা তালপুকুরের মতন, নামসর্বস্ব। অথচ অভিমান ছিল প্রচুর, তাই তোমাদের ভুল কখনও ভাঙ্গিনি।

সুধীন বলিল, তোমার মামা ত' কখনও মিথ্যে বলেন না। তাঁর কাছে শুনেছি।

শঙ্কর বলিল, তখনও কিছু ছিল। আস্তে আস্তে সেটা কমে এসেছে। অবশিষ্ট টুকু আমি এবার নিঃশেষ করে দিয়ে এলাম।

কি রকম?

সে সম্বন্ধে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না। তবে জেনে রাখো আমি গরিব। গরিব খুবই, শরীরে, অর্থে, মনে।

সুধীন দেখিল কথাটা তুলিয়া সে ভুল করিয়াছে। তার বন্ধুর কোথায় যেন বেঁদনা আছে। সে বেদনা শুধু অভাবের নয়, তার চেয়েও অনেক গভীর।

সাতাশ

শঙ্কর হিসাব রাখিত, চিঠি পত্র লিখিত, বাহির হইতে চাঁদা আদায় করিত। সে ছিল কুরপালা কংগ্রেসের প্রাণ, তরুণের আদর্শ। যুবকদের সে প্রেরণা যোগাইত।

ইন্দুপ্রকাশ পদে পদে তার অভাব অনুভব করেন। তাঁর কাজ বাড়িয়া যায়। শঙ্করের কোন কোন কাজ রাসেদুল করিয়া দেয় বটে কিন্তু সে নতুন লোক। তাকে বলিয়া দিতে হয়। অনেক কাজ ইন্দুপ্রকাশকে নিজ হাতে করিতে হয়।

এর উপর আছে পূজা-পার্বন, সময় তা'তেও কম লাগে না। প্রাতঃকৃত্যের পর তিনি পূজায় বসেন, তারপর সুতা কাটেন, ছেলেদের পড়ান। ঠিক বেলা বারটায় রাণীর খালে স্নান করিতে যান। স্নান করেন বহুক্ষণ ধরিয়া। কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সূর্যস্তব ও গঙ্গাস্তব পড়েন। পূর্বপুরুষদের তর্পণ করেন, তাঁদের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে জল দেন, জল দেন মৃত পশুপক্ষীর উদ্দেশে।

এক একদিন তাঁর মনে হয় সেইসব ঋষিদের কথা, যাঁরা আর্য্য সভ্যতার ভিত্তি গড়িয়াছিলেন। কী উদার ছিল তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী! আর আজ—?

সেদিন স্নান সারিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন বিষ্ণু রাসেদুল প্রভৃতি একখানা খবরের কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বিষ্ণু জোরে জোরে পড়িতেছে। ডাক্তার তাকে চেঁচাইয়া পড়িতে এমন কি জোরে কথা বলিতেও নিষেধ করে কিন্তু সে শোনে না। এরূপ রোগীকে লইয়া সত্যই বড় মুশকিল।

আর একটা বারান্দায় হাস্ত উনানে ফুঁ দিতেছিল। তার পাশে রকাবিতে চারটি আতপ, দু'খানি কুমড়া ও দু'টি আলু। সে ইন্দুপ্রকাশকে একখানা শুকনা কাপড় দিল। শঙ্করের নাম শুনিয়া ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, জায়গাটা আবার পড় ত' বিষ্ণু।

বিষ্ণু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবার আরম্ভ করিল রাসেদুল—

কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর

গত ১লা ডিসেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আপত্তিজনক বক্তৃতা করার অপরাধে অতিরিক্ত চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এ, আই, সি, সির সদস্য শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ রায়কে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তিনি কারামুক্ত হইয়াছেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, রাণীডাঙ্গার রায় রায়ান আমীরচাঁদের বংশধর। সরকারী চাকরি ছাড়িয়া ইনি নিজ পল্লীভূমি কুরপালায় কংগ্রেস কমিটি গঠন করিয়াছেন। কুরপালার কংগ্রেস বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সসম্মানে কারাবরণের জন্য আমরা দেশমাতৃকার এই সুসন্তানকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

পড়া শেষ হইলে রাসেদুল বলিল, পাশেই শঙ্করদার ছবিও দিয়েছে।

দেখি, দেখি—বলিয়া ভিজা কাপড়েই ইন্দুপ্রকাশ কাগজখানি চাহিয়া লইলেন। ছবির দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাঃ খাসা ছবি উঠেছে, নীচে লিখছে দেশমাতৃকার সুসন্তান। জান, রাসু ভাই, এইখানাই আজকাল কলকাতার সেরা কাগজ?

নিধিরাজ বলিল, লেখবে না, শঙ্করদারে লেখবে না ত' লেখবে কারে?

ইন্দুপ্রকাশ ভাতে ভাত সিদ্ধ করিয়া নামাইলেন। খাওয়ার পর রুটিন মাফিক সমস্ত কাজই করিলেন। অবশ্য অন্যদিনের চেয়ে ধীরে ধীরে। বাহির হইতে কোন চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল না কিন্তু হাস্ত

অনুভব করিল যে দাদুর অন্তরে ঝড় বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার সময় সে বলিল, আজ রাত্তিরে আর কোন কাজ না করলেন দাদু।

ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, ঠিক ধরেছ ভাই, আমি আর পারছি না।

আপনাকে কিন্তু আর কোনদিনই চঞ্চল হইতে দেখি নাই।

একে ত' শঙ্করের শরীর খারাপ, তার উপর জেল ওর এমনিতেই সহ্য হয় না। তাই ভাবছিলাম—একটু থামিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, অনেক নেতারও সহ্য হয় না। জেলে গিয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন।

কলিকাতায় যাইয়া শঙ্কর মায়ের নিকট একখানি মাত্র পত্র লেখে। সরোজ তারপর আর ছেলের কোন খবর পান নাই। তাই মধ্যে মধ্যে তিনি বসন্ত বা বামাচরণকে কংগ্রেস আপিসে খবর নিতে পাঠান।

পরদিন ইন্দুপ্রকাশ হাস্তকে কহিলেন, চল দিদি। একবার ছোট রায় বাড়ী বেড়িয়ে আসি।

সরোজ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন না বলিয়া তিনি হাস্তকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁকে দেখিয়া, গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া সরোজ কহিলেন, শঙ্করের খবর দিতে এসেছেন বুঝি?

হ্যাঁ মা, তুমি শুনেছ নাকি?

সরোজ কহিলেন, বসন্ত কালই হাটে শুনে এসেছিল।

তাঁর শান্ত সংযত মূর্তি দেখিয়া ইন্দুপ্রকাশ আনন্দ লাভ করিলেন।

সরোজ তাকে ডাব কাটাইয়া দিলেন, রেকাবিতে করিয়া হাস্তকে দিলেন দুইটি মিষ্টি।

ইন্দুপ্রকাশ কোথায়ও কিছু খান না কিন্তু সরোজের অনুরোধে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেন।

ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কে সরোজ বেশ সাবধানী, খুব বাছবিচার করিয়া

চলেন কিন্তু আজ হাস্যকে ভিতরে লইয়া গিয়া বলিলেন, লজ্জা কি মা, মিষ্টিটুকু খাও।

হাস্য একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া মিষ্টিটুকু খাইতে লাগিল। সরোজ তার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, তুমিও বড় কষ্ট পেয়েছ মা, আমি সবই বুঝি। ভগবানকে ডাক, শঙ্কর ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

কাল বিষ্ণু ও রাসেদুল যখন সংবাদপত্র পড়িতেছিল হাস্য তখন স্থির ভাবেই সব শুনিয়াছে, একটুও বিচলিত হয় নাই কিন্তু আজ শঙ্করের জননীর নিবিড় স্নেহের পরিচয় পাইয়া তার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তাঁর কথার উত্তরে সে কহিল, হ মা ডাকব।

পরনে নরুন পেড়ে ধুতি, গায়ে সাদা শেমিজ, হাতে একগাছি করিয়া নীল রংয়ের কাচের চুড়ি, সামান্য বেশ কিন্তু এই বেশেই তাকে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের চেহারায় যে সুষমা থাকে সেই সুষমা ভরা মুখশ্রী।

সরোজ তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন। হাস্য উহা লক্ষ্য করিল।

ঘোর সন্ধ্যায় ইন্দুপ্রকাশ কুরপালায় ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে সন্ধ্যাদীপ দিবার সময় হাস্যের মনে হইল রায় বাড়ীতে যেরূপ মিষ্টি খাইয়া আসিয়াছে ঠাকুরের সামনে সেইরূপ দু'টি মিষ্টি দিলে বড় ভাল হয়। পরের দিন মধুকে দিয়া সে দু'টি মিষ্টি আনাইল।

দেশে রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়, চলচ্চিত্রের ছবির পর ছবির মতন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের রেশ তখনও চলিতেছে, গান্ধীজি ভারতবর্ষে ফেরেন নাই, এদিকে দেশে অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি হয়। গুলি চলে। লোকে ভাবে, এ কী?

নিধিরাজ একদিন জিজ্ঞাসা করিল, এরকম হইল কেন দাদু? বিলাতে মহাত্মার সগে ত' মিটমাটের কথা হইতেছে।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, এর নাম রাজনীতি ভাই।

যে দেশে স্বরাজ আছে সেখানেও কি এইরকম হয়?

না কোন স্বাধীন দেশে এরকম হয় না। হবার জো নেই।

রাসেদুল বলে, আমরা লড়ি ত' সেই জন্যই।

ইন্দুপ্রকাশ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন না, তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে বসেন না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কথা দিয়া জাতীয় আন্দোলনের মর্মবাণী বুঝাইয়া দেন। কুরপালার লোকে স্বদেশী বলিতে সাধারণের সুখ-সুবিধার কথাই বোঝে।

গান্ধীজি ফিরিয়া আসার আগেই আবদুল গফুর খাঁ ও জহরলাল গ্রেপতার হন। গান্ধীজি ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই সরকার তাঁকে এবং সর্দার প্যাটেলকেও কারারুদ্ধ করেন।

ইন্দুপ্রকাশ আগেই বলিয়াছিলেন, আমাদের প্রস্তুত হওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু সেই সময় আর পাওয়া গেল না। একদিন পুলিস আসিয়া খানাতল্লাশী আরম্ভ করিল। তাদের রকম দেখিয়া বিষ্ণু কহিল, বৃটিশ ব্যুরোক্রেশী এই দেশে কী অপূর্ব জিনিসই না সৃষ্টি করেছেন—এই পুলিসের দল।

মহকুমার ইনস্পেক্টর আসিয়াছিলেন। তিনি মোটা গলায় বলিলেন, ইয়েস, ইয়েস, ইউ স্যাল সি।

সরকারের নিমকহালাল এই ব্যক্তিটি বৃদ্ধ ইন্দুপ্রকাশ ও রুগ্ন বিষ্ণু সমেত সকলকেই গ্রেপতার করিলেন। ইন্দুপ্রকাশ বাদে সকলের হাতে হাতকড়া পরাইলেন।

ইন্দুপ্রকাশ কহিলেন, বিষ্ণুকেও নিয়ে যাবেন ? ওর যে অসুখ।

ইনস্পেক্টর কহিলেন, নেব বই কি ? সিভিল সার্জনকে দিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করান হবে।—তাঁর কণ্ঠে ছিল কৌতুক মিশ্রিত অবজ্ঞা।

পুলিস সাড়ম্বরে চলিয়া গেল। তাদের পিছনে পড়িয়া রহিল কয়েকখানা ভাঙ্গা খড়ের চালা, আর উঠানে হাঁড়ি কলসী তাঁত চরকা লেপ তোশকের ছিন্ন ভগ্ন স্তূপ।

হাস্তু সেই স্তূপের দিকে হতচকিতের মতন চাহিয়া রহিল।

পুলিস আসিলে জুড়ানি একটা একচালার নীচে একরাশ ঘুঁটের পিছনে যাইয়া লুকায়। সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়ে।

হাস্তু উঠানের ভগ্নস্তূপের মধ্যে হইতে বাছিয়া বাছিয়া তুইটা চরকা বাহির করে, একটা তার নিজের, অপরটি শঙ্করের। জুড়ানির ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাকে ও চরকা তুইটিকে লইয়া সন্ধ্যার একটু আগে সে নিজের ভিটার দিকে রওনা হয়। কয়েক পা আগাইয়া যায় আর পিছন ফিরিয়া এক একবার কংগ্রেস আশ্রমের দিকে তাকায়।

বেশী রাত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ হইলে একটি মানুষ নারায়ণের ভিটায় আসে। অন্ধকারের মধ্যে জিনিসগুলি সব বাছিতে থাকে। তার বাছিবার ভঙ্গীতে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই তার পরিচিত। যাহা সারানো সম্ভব সেগুলিকে একটা ঘরের মধ্যে তুলিয়া রাখে।

তারপর কংগ্রেস আশ্রমের চালার উপর উঠিয়া বলে, বন্দেমাতরং, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। যাওয়ার সময় ডোবার কাঠকুটায় আগুন ধরাইয়া দেয়।

আগুনের শিখা আকাশে লকলক করিয়া উঠিলে গ্রামবাসীরা ছুটিয়া আসে। তারা দেখে কতকগুলি ভাঙ্গা কাঠ পুড়িতেছে। সেই কাঠের

উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায়, কংগ্রেস আশ্রমের উপরে নতুন একটা জাতীয় পতাকা।

পরদিন রহম চৌকিদার নারায়ণকে বলে, চুপি চুপি কইতেছি কিন্তু। বেশ করছ, আশের নিশান, উঁচা ত' রাখবাই।

আটাশ

কুরপালার একধারে চলে যন্ত্ররাজের বিজয় অভিযান আর একধারে চাষীরা পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত ধারায় গরু চরায়, ঘাস কাটে, জমি চষে। কিন্তু তাদের সম্বল শুধু ছল্লির খালপারে শ'দুই বিঘা জমি। মাঠটা কুরপালার উত্তর পুব কোণে। এখানে এবারও বেশ ধান হইয়াছিল। সবুজে সবুজে মাঠ ছাইয়া গেল। কিন্তু জলের অভাবে শস্য দানা বাঁধিল না, পরিপুষ্ট হইল না।

বৃষ্টি নাই বহুদিন। জমি শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে; মাঠের ঘাস পুড়িয়াছে। ছোট ছোট ডোবা নালায় একফোঁটাও জল নাই। বৃদ্ধেরা বলে, এরকম হইছিল শুধু আর একবার। সে বছর রামেন্দির রাজার মুখে ভাত। আশে হাহাকার ওঠল। লোকে কইত, একী অলক্ষুনীয়া কাণ্ড! তুই রাজার পূত, তোর মুখে ভাত, আর আশে কিনা অন্ন নাই।

রূপমতী কিংবা রাণীর খাল হইতে এই মাঠে জল আসে না। আসে ছল্লির খাল দিয়া। চাষীরা খালধারে ছোট ছোট নালা কাটিয়া মাঠটাকে বড় একখানা দাবার ছকে পরিণত করিয়া তোলে।

একদিন সকালে শোনা যায় বঙ্কিম খালের মুখে রূপমতীর মোহানায় বাঁধ দিয়াছে।

হাতের কাছে লাঠি লোটা যে যাহা পায় তাহা লইয়াই বাঁধের দিকে ছুটিতে থাকে।

তিনকড়ি স্বামীকে বলে, ও মাঠে তোমার ত' জমি নাই, তুমি ছাতির বাঁট লইয়া ছোটলা কোথায় ?

মুখে একটু হাসি টানিয়া যদু স্ত্রীকে বলে, এখনই ফেরব, তিনু।

মরণ আর কি ! বুড়া বয়সে তিনু, কড়্—তিনকড়ি ঝঙ্কার দিয়া ওঠে।

পথেই চাষীরা আর একটা খবর পায়। সকাল হইতে বঙ্কিমের পাইক পেয়াদারা পুলিসের সাহায্যে গাং ও নদীতে মাছধরা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছোটাখাটো মারপিটও হইয়াছে দু'একটা।

বাঁধের ধারে সশস্ত্র পুলিস আর বঙ্কিমের কয়েকজন দারোয়ান। কিছু দূরে বিক্ষুব্ধ জনতা, তার মধ্যে চাষী ও জেলের সংখ্যাই বেশী। এই মাঠে যাদের জমি নাই তারাও অনেকে আসিয়াছে। প্রায় তিনশ' লোকের এই জনতা চীৎকার করে, করে নানা কলরব। বঙ্কিমকে গালি পাড়ে, নিজ নিজ অদৃষ্টকেও ধিক্কার দেয়।

কদম বলে, পুলিস ত' সবে এই কয়টা। আয় ঢিল ছুড়িয়া অগো তাড়াইয়া দি।

মধু বলে, ঠিক কইছ। কও বন্দেমাতরং, আল্লাহো আকবর।

ভজহরি সাবধান করিয়া দেয়, পাঁচ পাঁচটা বন্দুকের সামনে গরম হইতে নাই রে।

তার ছেলে রাখহরি বলে, তুমি ক্ষ্যামা দাও বাবা, অর চারটাতেই গুলি নাই।

নাই বা থাকল। কিন্তু শেষটায় যে পুলিস আসিয়া গাঁকে গাঁ উজাড় করিয়া দেবে।

বামাচরণ খানিকটা আগাইয়া গিয়া দারোগার উদ্দেশে বলিল, আমার একটা আরজি আছে হুজুর। বাঁধটা কাটিয়া দেও।

ভরসা পাইয়া পিছন হইতে মধু আসিয়া পিঠ দেখাইয়া বলে, গেছিলাম মাছ ধরতে। দেখেন কি মাইরটা মারছে।

উত্তরে দারোগা বলেন, ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। আমার হুকুম, এখানে কেউ ভিড় করবে না।

আবার চেঁচামেচি শুরু হয়। কেহ বিশ্বনাথের জন্য আক্ষেপ করে। কেহ বলে, তানার ছাওয়াল কি বুড়া গাঙ্গুলী থাকলেও বঙ্কিম এতটা সাহস করত না।

হঠাৎ আকালীর কিশোর পুত্র ভদ্রকালী ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করে। সে বলে, আগে ছিল মাটির ঢিল, এখন হইছে ইটের। ছোড়তে জুৎসই।

দারোগা বয়স্কদের ডাকিয়া বলেন, তোমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাঠ ছেড়ে দাও। না হলে গুলি চলবে—তিনি পুলিসের দলকে হুকুম করেন, টেনসন।

জনতাও ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। তারা বলে, আজ যা' হয় হবে, আমরা এর হেস্তনেস্ত করবই।

এই সময় হিরণ সেন আসিয়া উপস্থিত। কুরপালা রাণীডাঙ্গার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট। লোকটি ভাল, পাঁচজনে মানে। তিনি অতিকষ্টে চাষীদের নিবৃত্ত করেন। বুঝাইয়া বলেন, দারোগা কি করবেন? তোমরা উপরে দরখাস্ত কর। কোর্টে যাও।

তাঁর কথায় সবাই সেদিন ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যার পর আলিমেহেরের বাড়ীতে বৈঠক বসে। এই মাঠে তার জমি নাই। কিন্তু সে বুদ্ধিমান মানুষ, একটা সম্প্রদায়ের নেতা। হিন্দুরাও তাকে শ্রদ্ধা করে, আপদে বিপদে তার পরামর্শ নেয়।

স্থির হয় আলিমেহের ভজহরি ও বামাচরণ মহকুমায় যাইবে। দশ এগার মাইল পথ, ভোরে রওনা হইলে কাছারির আগে যাইয়া পৌছিতে পারিবে। কোর্টে দরখাস্ত করিবে সবচেয়ে বড় উকিল বীরেশ্বরবাবুকে দিয়া।

আলিমেহের দু'দিন পরে ফিরিল। সে আসিয়া খবর দিল, মহকুমা হাকিমের কাছে বাঁধ কাটার হুকুম পাওয়া যায় নাই। মাছ ধরারও নয়। ভজহরিরা আপিলের ব্যবস্থা করিতেছে।

এদিকে ধানের শিষ কালো হইয়া গেল। গাছগুলি মাঠের উপর হেলিয়া পড়িল। লোকে বলিল, বিচার বটে। আংরেজের তারিফ করতে হয়।

আরও কয়দিন পরে ভজহরি ও বামাচরণ আসিয়া সংবাদ দেয়, অতিরিক্ত জেলা জজ বঙ্কিমের উপর নোটিশ জারি করিয়াছেন। বাঁধ কেন কাটা হইবে না এবং সাধারণের মাছ ধরার অধিকারে কেন সে বাধা দিতেছে এই সম্পর্কে কারণ দেখাইবার নোটিশ। মামলার শুনানি আরও দশদিন পরে।

চাষীরা দেখিল, এই জমি রক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। একদিন না একদিন বঙ্কিম উহা গ্রাস করিবেই। তারা দল বাঁধিয়া বঙ্কিমের কাছে গেল। বলিল, আমারগো এই জমি আপনে কিনিয়া নেও।

বঙ্কিমেরও ইচ্ছা ঐ দু'শ বিঘা খাস করিয়া নেয়। কিন্তু আরও জব্দ না হইলে মালিকরা উহা জলের দরে ছাড়িবে না। তাই সে বলিল, ও জমি দিয়ে আমার ত' কোন দরকার নেই। আমি খালে বাঁধ দিয়েছিলাম শুধু মিল ও বাড়ী বাঁচাবার জন্য।

বামারচণ বলিল, তা ঠিক। তবে হুজুর ত' ওখানে বাগান করতে পার। ফুলবাগিচা।

বঙ্কিম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, বেশ, তোমরা আগে মামলা তুলে নেও। তখন ভেবে দেখব।

মধু ও ইয়াকুব বলিল, আমারগো কিন্তু মাছ ধরার হুকুম দেবা কর্তা। ডাইল কেনার পয়সা নাই, মাছ না হইলে ভাত গিলি কি দিয়া ?

বঙ্কিম কহিল, যার যার খাবার মতন মাছ তোমরা ধরতে পার। তবে মাছের কারবার করতে হলে আমার কাছে পাশ নিতে হবে।

যদু নাপিত বলিল, বিলে মাছ ধরব, তারও পাশ ? কতই দেখব ঠাকুর।

বামাচরণ বঙ্কিমকে বলিল, তা হৈলে জমির কি ঠিক করলেন কর্তা ?

বঙ্কিম কহিল, আগে মামলা তুলে নেও। তার পর এস।

শৈবলিনী স্বামীকে বলিল, এ কী করছ তুমি ? লোকের শাপ লাগবে যে।

শাপ !—বঙ্কিম একটু হাসিয়া বলে, বড়লোককে ত' লোকে শাপ দেবেই। তা'তে ভয় পেলে চলবে কেন ?

বড়মানুষ স্বামীর এই স্বরূপ দেখিয়া শৈবলিনী শিহরিয়া ওঠে।

উনত্রিশ

গ্রামের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। নদীর উপর সিমেন্টের বাঁধ, তারপর পাকা রাস্তা। রাস্তার পুবে বঙ্কিমের কাপড়ের কল, রূপমতী কটন মিলস। মাঝখানে প্রকাণ্ড ফটক, দু'পাশে আর দু'টা, দক্ষিণে নদীর পারে ম্যানেজার ও বাবুদের কোয়ার্টার। উত্তরে আপিসের খানিকটা দূরে ছল্লির খালধারে বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস।

নদী পারের রাস্তাটা ঐ খালের পুলের উপর দিয়া সাগরদীঘির দিকে চলিয়া গিয়াছে। খাল পার হইলেই বঙ্কিমের নূতন বাড়ী, তারও নাম রূপমতী। বাড়ীতে ঢুকিতেই প্রকাণ্ড ল্যন। মাঝখানে পথের ডাইনে ও বাঁয়ে আলোক স্তম্ভ।

রূপমতীর উপর হইতে জায়গাটাকে ছবির মতন দেখায়। এক রঙা সব বাড়ী, সামনে খানিকটা করিয়া তারকাঁটায় ঘেরা ছোট ছোট বাগিচা।

কারখানার পিছনে আর একটা রাস্তা। এই রাস্তার উপর মজদুরদের প্রবেশের ফটক। বিপরীত দিকে সারি সারি ব্যারাক উঠিয়াছে আরও উঠিবে।

এ একটা স্বতন্ত্র জগৎ, একটানা টালির চালার নীচে কুঠুরির পর কুঠুরি, যেন কতগুলি পায়রার খোপ। প্রতিটি ঘরের সামনে দরজার পাশে হেঁশেল।

দুই সারি কুঠুরির মাঝে পথ, সেখানে টিউবওয়েল ও আলোর ষ্ট্যাণ্ড। এক ধারে দুইটি মুদীখানা। একটি বঙ্কিমের, অপরটি ভোজেশ্বরের এক ব্যবসায়ীর। সে এই দোকানের জন্য হাজার টাকা সেলামি দিয়াছে। মাসে মাসে ভাড়া দিবে পঁচিশ।

হাসপাতাল এবং ডাক্তারখানাও হইয়াছে। শীতল চক্রবর্তীর ক্যাম্পবেল পাশ ছেলে তার ডাক্তার।

সর্ব্বদমন কালীজিউকা আপিস নামে এক কারবার খুলিয়াছে। এই আপিস লোককে যত টাকা ধার দেয়, প্রতিদিন তত পয়সা আদায় করে। বাহাত্তর দিনে সুদ-সমেত দেনা শোধ হয়। কুলোকে বলে, এই চোটার কারবারেও বঙ্কিম একজন অংশীদার।

কল বসানোর কাজ শেষ হইয়াছে। বিদেশ হইতে আসিয়াছে কতগুলি অভিজ্ঞ মজুর। তারা কোয়ার্টারে থাকে, কাজ জানা লোক বলিয়া মাহিনাও কিছু বেশী পায়।

দেশী লোক নেওয়ার ভার বীরেনের উপর। অভিজ্ঞ হিসাবে কুরপালা কাকডাঙ্গার তাঁতী জোলারা আগে কাজ পাইল। কিন্তু প্রার্থী বেশীর ভাগই চাষী। তারা কাজ পায় না; রোদে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় কেহ আক্ষেপ করে, ঐ যে বাতির থামটা ঐখানে আমার জমি ছিল। কেহ বা বলে, এ রাস্তাটা গেছে আমার গোয়ালের উপর দিয়া।

মেয়েরাও আসে তবে কম। বৃদ্ধেরা বলে, এও দেখতে হইল। গেরস্তের বউ হবে মজুরনী।

ক্রমে ক্রমে লোকে জানিল, ঘুষ ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় না। বীরেন দুই সপ্তাহের মাহিনা ঘুষ নেয়। নিজ হাতে নেয় না, নেয় ধীরাজ, হরু ও উপীনের মারফৎ। তারা বলে, এ ত' ভদ্রলোকদের ন্যায্য পাওনা। চাষীরা এতদিন খাজনা সেলামি দিয়েছে, এখন নয় এইভাবেই দিক।

আজ কয়দিন যাবৎ নসীরামের স্ত্রী কিশোর পুত্রকে লইয়া ধন্না

দেয়। আসে আর ফিরিয়া যায়। শেষটায় সে একদিন বঙ্কিমের দারোয়ান রাম সুচরিতকে বলিল, আমারগো একটা উপায় করিয়া দেও ত সুচরিত্রজী। এই ছাওয়ালটিরে ভরতি করিয়া নেও।

রাম সুচরিত বলে, হামি কি করব? দু চারঠো টাকা ছোড়ো, সব ঠিক হইয়ে যাবে।

টাকা! পাব কোথায় আমি?

কিসিকো বোলো মৎ। পান উন খাবার জন্য বীরুবাবুকে কুছু দে দেও। নকরি জরুর মিলবে।

বৈকালে বীরেন বাহির হইলে নসীরামের বৌ তাকে ধরিল, টাকা না পাইলে তুমি নাকি কেওরে চাকরি দেও না?

কে বললে?

কয় ত' পাঁচ জনে। এ কী ঘেন্না! বড় রাজার ছাওয়াল হইয়া শেষটায়—

বীরেন তাকে কষিয়া এক ধমক দিল।

ব্যাপারটা রামেন্দ্র শুনিলেন, জাহ্নবী শুনিলেন। ছেলেকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, শেষটায় তুই বংশের নাম হাসালি?

বীরেন বলিল, নাম ধুয়ে জল খেলে পেট ভরবে না। নাম আর ভাঙা ইট, এ ছাড়া তোমাদের আছে কি?

জাহ্নবী পুত্রের মুখে এই কথা শুনিবেন বলিয়া আশা করেন নাই। তিনি বলিলেন, ঐ মুদী শুধু জমিদারীই কেনে নি, তার চেয়েও সর্বনাশ করেছে দেখছি।

ওসব হেঁয়ালি ছেড়ে দাও মা। ওর কারখানায় বড় হাজিরাবাবুর কাজটা পেলে আবার দু'চার বিঘে জমি কিনতে পারব। তোমার

ঠাকুরকে সেই জন্য বরং ডাক—বলিয়া বীরেন মায়ের সামনে হইতে চলিয়া গেল।

তার এই ঘুষ নেওয়ার কথা বঙ্কিমও জানিত। কিন্তু সে কোনও প্রতিকার করিল না। রাণীডাঙ্গার বড়রাজার ছেলে তার কর্মচারী এই আত্মপ্রসাদের বিনিময়ে বীরেনের অনেক ত্রুটিই সে উপেক্ষা করিল।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। মিলের উদ্বোধন উৎসব, বঙ্কিমের নূতন গৃহ প্রবেশের তিথিও আজ। বঙ্কিম বিখ্যাত স্বরাজী নেতা সুধাঞ্জনবাবুকে মিলের উদ্বোধনের জন্য কলিকাতা হইতে আনাইয়াছে। এই বাবুটি কাউন্সিল ও শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গরম গরম বক্তৃতা দেন আবার হোম মেম্বারের কাছে পাঁচটা কাজের জন্য তদ্বির করেন।

বঙ্কিমের কুল পুরোহিত যদু ও বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী পূজা ও হোম করিলেন। গীতা ও চণ্ডীপাঠ করিলেন রায়েদের গুরু বংশীয় নিশি ও ভবতারণ ঠাকুর।

সারাদিন ব্যাপী উৎসব। সকালে যাত্রা, পুতুল নাচ ও ম্যাজিক। দুপুরে কাঙালী ভোজন, বৈকালে সভা, রাত্রে আতসবাজি। উৎসবে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান আসিয়াছে। যাত্রা শেষ হইলে দলে দলে লোক কল কারখানা দেখে, দেখে নারায়ণের কারুকাজ, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, বিজলি ঘর। কেহ বিনা প্রয়োজনে টিউবওয়েল পাম্প করিয়া জল খায়, কেহ বা জলধারার নীচে মাথা পাতিয়া দিয়া বলে, কী শেতল পানি রে। কৈলজা যেন জুড়াইয়া যায়।

কারখানার ফটকের গায়ে সূর্যের রথ দেখিয়া সবাই প্রশংসা করে। ভিতরে যন্ত্রদানবের দিকে অপলক নয়নে চাহিয়া থাকে। বলে, এ সগল গড়ল কেডা রে?

লোকের মুখে নারায়ণের কাজের প্রশংসা শুনিয়া হাস্তও দেখিতে আসে। কারখানা হওয়ার পরে এদিকে আসে এই প্রথম।

সুধাঞ্জন বলেন, পাড়াগাঁয়ে এমন একজন গুণী আছে তা'ত জানতুম না। তাকে একবার আনাতে পারেন?

বঙ্কিম নারায়ণকে ডাকিয়া পাঠায়। সে আসিলে বলে, এই আমাদের নারাণ, শুধু ভাল শিল্পীই নয়, একজন কংগ্রেসসেবীও বটে। জেল ফেরতা।

সুধাঞ্জন বলেন, বেশ ত'। তুমি এসব শিখলে কোথায়, নারাণ?

বাবু কতগুলি ছবি দিছিলেন তাই দেইখ্যা খোদাই করছি। যন্তর দানবটা করছি বিলাতী ছবি দেইখ্যা।

বঙ্কিম বলিল, বেশীর ভাগই ও নিজের মাথা থেকে করেছে যেমন সূর্যের রথ, নিমাই সন্ন্যাস।

সুধাঞ্জন কহিলেন, ওয়াণ্ডারফুল। যাবে তুমি কলকাতায় আমার সঙ্গে?

তা ত' বলতে পারি না।

কে পারে?

যারা পারেন তারা ফাটকে আছেন।

সুধাঞ্জন বঙ্কিমের দিকে চাহিলেন। সে বলিল, ও এই গ্রামের কংগ্রেস নেতাদের কথা বলছে। ইন্দুপ্রকাশবাবু, শঙ্করনাথ রায়।

সুধাঞ্জন কহিলেন, ওঃ।

তাঁর অনেক কারবার কলিকাতায় সিনেমা হাউস, আসানসোলে কয়লার খনি, সরিষাবাড়ীতে পাটের আড়ত, কেরোসিনের গুদাম। এই সমস্তের মূলে একটি ফারনিচারের দোকান।

বাজারে গুজব প্রথম যৌবনে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের তল্পিদার

ছিলেন। তাঁদের গচ্ছিত টাকায় ভদ্রলোকের এই বাড়বাড়ন্ত। তিনি নারায়ণকে বলিলেন, বেশী টাকা পেলে যেতে পার ত' ?

নারায়ণ বলিল, স্বদেশী হইয়া এটা আপনে কইলেন কি ?

কথাটা সুধাঞ্জনের কানে একেবারেই নূতন ঠেকিল। তিনি একটু হাসিলেন, বিজ্ঞতার হাসি।

ঘুরিতে ঘুরিতে হাস্তের সঙ্গে নারায়ণের দেখা হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, দেখছ আমার সব কাজ, ভাল লাগছে তোমার ?

লাগে নাই ? খুব লাগছে—বলিয়া হাস্ত নারায়ণের মুখের দিকে চায়।

নারায়ণের বুকের ভিতরটায় কেমন যেন আলোড়ন হইতে থাকে। সে বলে, তোমার ভাল লাগছে ? তা হইলেই হইল—এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া যায়। একেবারে বালকের মতন।

হাস্ত পিছন হইতে তার দিকে তাকাইয়া থাকে। বিদ্যুতের ঝলকের মতন মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, শঙ্কর দাদাবাবুকে না দেখিলে সে হয়ত এই মানুষটাকে ভালবাসিতে পারিত।

একটু দূরে থাকিয়া পদ্ম ব্যাপারটা লক্ষ্য করে। হাস্তের জন্য তার দুঃখ হয়।

বৈকালে সভা। সভায় রামেন্দ্র আসিয়াছেন। বঙ্কিম তাঁকে পালকি করিয়া আনাইয়াছে। তাঁর মাথায় পাগড়ি নাই ; কোমরে নাই তলোয়ার। আভিজাত্যের শেষ এই নিদর্শন ত্যাগ করিয়া তিনি শুভ্রবেশে আসিয়াছেন পাঞ্জাবি ও চাদর পরিয়া, ভারী সুন্দর মানাইয়াছে।

সভার প্রারম্ভে আশিষ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপক চিঠি ও টেলিগ্রাফ

পড়া হয়। তারপর বক্তৃতা, সর্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ। তিনি বঙ্কিমকে বিপন্নের বন্ধু, দেশপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেন। বঙ্কিমের লোকেরা করতালি দেয়।

আলিমেহের বলে, এত মিছা কথা কয় কি করিয়া? শুনছিলাম লোকটা স্বদেশী।

সুধাঞ্জন বঙ্কিমকে কহিলেন, বিস্তৃত রিপোর্ট লিখিয়ে আমাকে দেবেন। কলকাতার কাগজগুলো সবই আমার হাতধরা। মোটা বিজ্ঞাপন দেই কি না।

গোধূলির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমের নূতন বাড়ী, কারখানা, বাবুদের কোয়ার্টার ও ব্যারাক সব জায়গায় আলোর মালা জলিয়া ওঠে। লাল নীল বেগুনী কত তার রংয়ের বাহার। রূপমতীর জল আলোয় ঝলমল করে।

বাজি পুড়িবে তাই ভিড় অসম্ভব রকম। সারা মাঠ লোকে লোকারণ্য, নৌকায় নৌকায় রূপমতী ছাইয়া গিয়াছে।

প্রথমে রাজারাণী, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন ও মৌলানা মহম্মদ আলির ছবি দেখানো হয়। বাজি পোড়ে নানারকম তুবড়ি, চরকি, বোমপটকা, ফুলঝুরি। আকাশে হাজার হাজার সাপ ফোঁস ফোঁস করে। ছেলেরা ভয় পায়।

সাপ হাউই ছাড়ল বুঝি? দেখ্, তোরাই দেখ, আমার ত' আর চক্ষু নাই—অক্রু আক্ষেপ করে। পদ্ম হাঁ করিয়া তার মুখের দিকে তাকায়।

বাজির আগুন ও তীব্র গন্ধে, মানুষের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অতবড় ফাঁকা মাঠের বাতাসও ভারী হইয়া ওঠে।

চারিধারে উন্মাদনা আর কলরব, দেবেন রায়ের মৃত্যুর পর সারা সাগরদীঘি এইরূপ উৎসব আর দেখে নাই। উন্মাদ নন্দীরাম, বোবা

জুড়ানি, নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ মেনাজুদ্দি সবাই বাজি পোড়া দেখিতে আসিয়াছে। আসে নাই শুধু হাস্তু। কিন্তু কুরপালার বসিয়া বস্তিমের এই জলুসের দিকে চোখ ফিরাইয়া থাকা অসম্ভব। আকাশ এক একবার আলোয় আলোকময় হইয়া যায়, হাউই রং বেরংয়ের তারা কাটে। হাস্তের চোখের উপর বেড়ার বেতের বাঁধ এমন কি উঠানে গোবর লেপার দাগ পর্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

আগুন—আগুন।

চীৎকার শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখে কুরপালার নাপিত ও কাহার পাড়ার দিকটা যেন লাল মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। মেঘের নীচে আগুনের বড় বড় গোলা।

কুরপালার লোকেরা নিজ নিজ ঘর বাড়ী রক্ষার জন্য ছুটিতে থাকে। মাঠ জুড়িয়া কলরব ওঠে, হায় হায়, সর্বনাশ।

প্রথমে নাপিতপাড়ার নকুলের বাড়ী আগুন লাগে। পুবের বাতাসে কাহারপাড়া ও জোলাপাড়ায় আগুন ছড়াইয়া যায়।

শরীর খারাপ বলিয়া ভজহরি বাড়ীতেই ছিল। তার ও নকুলের বাড়ী পাশাপাশি। আগুন দেখিয়া সে নকুলের বাড়ী ছুটিয়া যায়, জ্বলন্ত চালার গোটা কয়েক বাঁধ কাটিয়া ফেলে। কিন্তু ততক্ষণে কাহারপাড়ার তুলসীর ঘর ও জ্বলিয়া ওঠে, তারপর বরদা কাহার ও আদমের ঘর।

মাঠ হইতে দলে দলে লোক আসে। শিশু ও রোগীদের টানিয়া বাহির করে। জিনিস পত্র যাহা পারে ছুড়িয়া ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। বেড়া কাটে, ঘরের চালা ছুটাইয়া ফেলে। বলে, বন্দেমাতরং, আল্লাহো আকবর।

বৃষ্টি নাই বহুদিন। ভজহরির বাড়ীর নীচে সোতা খাল ও যদুনাপিতের পুকুর ভিন্ন কোথায়ও জল নাই। কাহার ও জোলাপাড়া হইতে জায়গা দু'টাই একটু দূর। অগ্নি নির্বাপনকারীর দল হাতের কাছে যে যাহা পায় ঘড়া বালতি হাঁড়ি গামলা ভরিয়া জল আনে। নারায়ণ প্রতিবারে আনে দু'ঘড়া করিয়া। আবার বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া যায়।

পাশাপাশি যে সব বাড়ীতে আগুন লাগে নাই লোকরা সেই সব চালা ও বেড়ায় ভিজা কাঁথা, কাপড় ও চট ছুড়িয়া ফেলে।

আগুন নিবিল বটে কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে নকুল তারক আদম নাজিম প্রভৃতি বিশ বাইশ ঘর গৃহস্থের ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। মানুষ মরিল না বটে কিন্তু গরু বাছুর মরিল অনেক। শূন্য পোতার উপর কুষ্ঠীর বিকল অঙ্গের মতন পোড়া পোড়া কতকগুলি খুঁটি দাঁড়াইয়া রহিল, আর রহিল কালো কালো তোবড়ানো কতগুলি টিন।

নসীরামের জীর্ণ খড়ের চালা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। আগুন নিবিলে তার স্ত্রী শূন্য ভিটার উপর ছাই কাদার মধ্যে বসিয়া থাকে। শীর্ণ চেহারা, কোটরগত চোখ, গালে কতকগুলি মেচেতা যেন দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি।

হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া প্রৌঢ়ার সকল শোক উথলিয়া ওঠে। মনে পড়ে অনেক কথা। সে বলে, তোর মাথা ঠিক থাকলে কি এমন করিয়া কপাল পোড়ে? সব যে ভস্ম হইয়া গেল। রমা কালী দয়া আর ডিম পাড়বে না।

রমা কালী দয়া নসীরামের বোর হাঁস। আজ আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে।

নসীরাম দড়ি ঘুরায় না, ছড়া কাটে না। নিজের কুটীরের

ভগ্নাবশেষের দিকে চায় আর তার মাথার মধ্যে যেন ঝড় বহিতে থাকে। একটুপরে সে বলে, যারগো মাথার ঠিক আছে তারগো বাড়ীও ত' পোড়ল।

তার স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, যা, যা। আর পাগলামি করিস না। নকুলের হাঁসগুলি ত' বাঁচছে।

প্রৌঢ়ার দুঃখ সেইখানে যে প্রতিবেশী নকুলের হাঁসগুলি বাঁচিয়াছে।

গ্রামের একপ্রান্তে শ্মশানের এই দৃশ্য আর একদিকে আলোর মালা। বঙ্কিম আলোগুলি নিভায় নাই। চারধারের বিল ও বাঁশের ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে তার কারখানার এই দিকটা যেন ইন্দ্রপুরী।

শিয়ালগুলি খাদ্যের অন্বেষণে গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসে। অবাক্ বিস্ময়ে আলোর মালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দু'একবার হুক্কাহুয়া করিয়া আবার গর্তে ফিরিয়া যায়।

ত্রিশ

রাত্রি শেষে কলের বাঁশী বাজিয়া উঠে। সেই শব্দে কুরপালা কাকডাঙ্গা ও গোপালপুরের লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। মা ছেলেকে ডাকে, ওঠ্, বাঁশী বাজাইয়া অরা ডাকতেছে।

দূর ছাই বাঁশী—বলিয়া ছেলে আবার পাশ ফিরিয়া শোয়।

মা গালি পাড়ে, খাবি কি ছাই? ওঠ্, ওঠ্।

ছেলের মনে পড়ে চাকরির কথা। সে এবার উঠিয়া বসে, বলে, শুরু হইছে কতক্ষণ?

এই মাত্তর। আমি ঠায় বসিয়া আছি কখন বাঁশী বাজে সেই জন্য।

আকালী জাগিয়াই ছিল। বর্ষীয়সী স্ত্রীর মুখে একটু হাত বুলাইয়া সে বলিল, রাত্তিরের ঘুমটা এক্কেবারে মাটি করবে দেখছি।

সাত তাড়াতাড়িতে মুখ হাত ধুইয়া, কেহ দুই গ্রাস মুখে পুরিয়া, কেহ বা কিছু না খাইয়াই কারখানার দিকে ছোটে। অনেকেরই চাকরি জীবনে এইসবে হাতেখড়ি। ব্যস্ততা তাদের অদ্ভুত। দেরিতে গেলে যদি চাকরি চলিয়া যায়।

ব্যারাকের কুলীরা এই শব্দে অভ্যস্ত। তারা উঠিয়া শৃঙ্খলার সহিত প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, বাসী খাবার খাইয়া ধীরে ধীরে রওনা হয়।

হাস্তেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তার মনে পড়ে, এই সময় দাদামহাশয় হাত মুখ ধুইয়া স্তব আবৃত্তি করেন, রাসেদুল নমাজ পড়ে। নিধিরাজ করে ডন বৈঠক আর লাঠি খেলে। কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণু বাদে সকলেই চরকা লইয়া বসে। সে বলে, আমার ওতে বিশ্বাস নাই।

সেদিন তার মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে। শুনিয়া হাস্তের চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

শঙ্করের শরীরও ভাল নয়। জেলে তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এ অবশ্য কিছুদিন আগের খবর।

হাস্তের দুর্ভাবনা যথেষ্ট কিন্তু সে কিছুই প্রকাশ করে না। মধ্যে মধ্যে সরোজ দেবীর কাছে যায়। তিনি পুত্রের গল্প করেন, তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার গল্প। বলেন, ও একবার যা শুনত তা আর ভুলত না। যখন বয়স মাত্তর পাঁচ বছর তখন মুখে মুখে অঙ্ক কষত। লোকে বল্‌ত, তোমার এই ছেলে একদিন মস্ত বড় একটা মানুষ হবে।

একজন ভাষা দিয়া, অপরে নীরব থাকিয়া দয়িতের আলোচনায় নিবিড় আনন্দ পান। তাদের দয়িতেরও হয়ত ইহাতে মঙ্গল হয়।

আজ হাস্তের চোখের সামনে দিয়া দলে দলে লোক কারখানার

দিকে যায়। একসময় তাদের অনেকেই ছিল সচ্ছল চাষী, একনিষ্ঠ কংগ্রেসী। জমি ও ভিটা হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষুধার নেকড়ে তাদের দরজায় হানা দিল। লোকগুলি দিনমজুর বনিয়া গেল।

শ্রমিকদের ঢুকিবার দরজায় দরজায় কার্ড পাঞ্চ্ হয়, নারী পুরুষের ভিড় জমে। একটি দরজায় কিশোর পুত্রকে লইয়া একটি বিধবা দাঁড়াইয়া আছে। ছেলেটি চোখ রগড়ায়। মা তার কোমরে চারটি মুড়ি বাঁধিয়া দিয়া বলে, খিদা লাগলে এই খাইস।

ছেলে জিজ্ঞাসা করে, আবার কখন আসবি মা ?

দুপারে যেই বাঁশী বাজবে। তুই ঠেলাঠেলি করিস না যেন। আমি কচুর শাক রাঁধিয়া রাখব।

কচুর শাক খাওয়ার আশায় ছেলেটির মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে।

একটা দরজায় দাঁড়াইয়া উপীন কার্ড পাঞ্চ করে। ফটকের একটু দূরে উঁচু চেয়ারে বসিয়া ধীরাজ দাস। সামনে পিতলের বোর্ডে কালো রংয়ে খোদাই করা, Enquiry.

বীরেন বড় হাজিরাবাবুর কাজ পাইয়াছে। স্থানীয় মজুররা কেহ কেহ তাদের পুরানো জমিদারের ছেলেকে দেখিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করে।

ম্যানেজারকে লইয়া বঙ্কিম ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখে। হাজারের উপর তাঁত চলে। যন্ত্রের শব্দ তার বুকে শিহরণ জাগায়। মনের মধ্যে অতীত স্মৃতি এক একবার উঁকি মারে।

একটা দরজায় কলরব উঠিল, জনতার ক্রুদ্ধ গর্জন। বঙ্কিম ম্যানেজারকে লইয়া সেইদিকে আগাইয়া গেল।

আকাশ তখনও বেশ পরিষ্কার হয় নাই, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় শ' খানেক লোক। তাদের মধ্যে কয়েকটি নারী এবং শিশুও

ছিল। তাঁরা চেঁচায়, ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করে। বলে, আমরা কুণ্ডুবাবুর লগে দেখা করব। কারখানার পাহাড়ী দারোয়ানরা তাদের ঠেকাইয়া রাখে।

বঙ্কিম ভারিক্কী গলায় বলে, কি চাই তোমাদের ?

নকুল তুলসী আদম প্রভৃতি সমস্বরে বলিয়া ওঠে, আমারগো ঘর-বাড়ী পোড়াইছ, আমারগো চাকরি দেও, ক্ষেতিপূরণ দেও।

এই দলে নারায়ণকে দেখিয়া বঙ্কিম বলে, তুমি এই সঙ্গে নারাণ? তুমি না আমার চাকরি কর ?

নারায়ণ বলিল, চাকরি আমি ইস্তফা দিলাম। নিজের জন্য আসি নাই, আপনার আতসবাজি যাদের সর্বনাশ করছে, আইছি তাদের জন্য।

পিছন হইতে একদল বলে, ঠিক ঠিক, সাবাস সর্দারের পো।

এই সময় ছিন্নবস্ত্রে নসীরামের বৌ আসিয়া সকলের আগে দাঁড়াইল। সে বলিল, দেখ আমারগো কি দশা করছ। পরানে আর মারিও না।

বঙ্কিমের সহানুভূতি উদ্রেকের উদ্দেশে তুলসী কহিল, আমি নরুর ছাওয়াল তুলসী। আমার বাবা আর আপনে এক পাঠশালে লেখতেন।

তারক বলিল, আমি কাহার পাড়ার তারক।

আমি নাজিম বড় কর্তা। আপনে গাঙ্গে ডুবিয়া গেলা, আমার দাদা চুবান তোমারে বাঁচাইল।

বঙ্কিম ম্যানেজারকে কি যেন বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ম্যানেজার জনতার উদ্দেশে চড়া গলায় বলিলেন, চাকরি আর খালি নেই। তোমরা আগে আসনি কেন? এখন চলে যাও, গোলমাল ক'র না।

নারায়ণ বলিল, যাও কইলেই গেলাম ? আগে আমাদের দাবি মিটান।

ম্যানেজার পাহাড়ী দারোয়ানদের ইশারা করিলেন।

বাগো, বাগো, ইয়াসে—বলিয়া পাহাড়িয়ারা কুরকি লইয়া জনতাকে তাড়া করিল।

নসীরামের বৌ ধাক্কা ধাক্কির চোটে প্রথমে পড়িয়া যায়। একটা আর্তনাদ ওঠে, মারল, মাইয়া লোকরে মারল।

এবার সর্বাগ্রে নারায়ণ রুখিয়া দাঁড়ায়। পিছনে নকুল তুলসী আদম। একটা দারোয়ান নারায়ণকে কুরকি দিয়া আঘাত করে। ফিনিক দিয়া রক্ত বাহির হয়। তুলসী নাজিম পুলিন প্রভৃতি আহত হয় আরও অনেকে। বামাচরণ বলে, ভ্যালারে, বিধেতা পুরুষ।

নাজিম বলে, আল্লা, তোমার মনে এই ছিল!

ঊষার অরুণ আলোয় পুব আকাশের মতন গরিবের রক্তে কুরপালার মাটি সেদিন রাঙা হইয়া গেল।

এই রক্তরাঙা ধরণীর স্নেহ-মাখানো সবুজ রূপ কবে আবার ফিরিবে, ফিরিবে কোন্ পথে কে বলিতে পারে ?

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

পূর্ববঙ্গে চাষীদের মধ্যে প্রচলিত কতগুলি শব্দের অর্থ—

অরগো—উহাদিগকে বা উহাদের।

শব্দের পর 'গো' থাকিলে সর্বত্রই এইরূপ বুঝিতে হইবে, যথা—আমারগো—আমাদের বা আমাদিগকে। উকিলগো —উকিলদের বা উকিলদিগকে।

অরা—উহারা

আউগাইয়া—অগ্রসর হইয়া

আয়িমা—পালয়িত্রী মাতা

উরুষ্ঠু—উষ্ণ

একত্তর—একত্র

কাজিয়া—দাঙ্গা

কেচুয়া—কেঁচো

তানারে—তাঁহাকে

তারথা—তদপেক্ষা বা তার নিকট হইতে

থা—হইতে, চেয়ে—যেমন, ঘরেরথা—ঘর হইতে

নাস্তা—সকালের খাবার (Breakfast)

পেক্ষালন—প্রক্ষালন

* পরিপাক—পরিবার, স্ত্রী

পরিশুরুদ্ধ—বিশেষভাবে শুদ্ধ, পবিত্র

পিসিডেন—প্রেসিডেন্ট

ফারাক—তফাৎ

ফাপুয়া—পেঁপে

মৈরুহ—মহীরূহ

মুরুচ্ছা—মূর্ছা

রৈরব নরক—রৌরব নরক, নরক বিশেষ

লগে—সঙ্গে

ল্যাজা—ধারাল অস্ত্র বিশেষ

ষেস্মরণ—স্মরণ

* বালভো—বাল্‌ব (Bulb)

সুরাজ—স্বরাজ

সন্দ—সন্দেহ

* সিলিন—সেলুন

সানকিতেঁ—ডিসে, প্লেটে

সালুন—ঝোল

হাচা—সত্য

---

* চিহ্নিত শব্দ কয়টি প্রচলিত নয়। যদু নাপিত ঐ ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়াছে।